হিম পড়ে গেল →

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় →

তিন সঙ্গী । ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট । কলকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশিকা : প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা—৭৩

মুদ্রক : শীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

রবিবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো। জানলা দিয়ে চেনা আম গাছটাকে দেখলো দেবুবাবু। এই সময় তো ওর ডালপালা ভিজে থাকে। এখন ভাদ্রের মাঝামাঝি। বাজারে বরবটি কিনতে গিয়ে কালই সন্ধেবেলা চাষীবাড়ির মেয়ে বলেছে, নিয়ে যান। দিশী বরবটি। হিমে ভিজোনো জিনিস বাবু—

সে কি গো? হিম কোথায় পেলে?

বর্ষা এলো নি বলে হিম তো ডেইড়ে থাকবে নি। কিলো আড়াই টাকা।

শুকনো লঙ্কা ভাজা। তার সঙ্গে বরবটি। হাতে গড়া পাতলা রুটি দিয়ে এবেলা ওবেলা টিফিন করতে খুব ভাল লাগে দেবুবাবুর। বিশেষ করে নতুন ওঠা সবজির রান্না খুব স্বাদের। এর সঙ্গে এক কাপ গরম চা। গিলতে চমৎকার। দেবকুমার বসু কাল সন্ধ্যেরাতে তার প্রাণের টিফিন সারার সময় চাষীঘরের মেয়েছেলেটির কথা ভাবতে গিয়ে দাঁতের ওঠানামা আপনাআপনি বন্ধ করে ফেলেছিল। এবারে তাহলে আর বর্ষা হবে না? সারা কলকাতার গায়ে জল মাখানো ধুলো। সেই সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। বাজারে এক দিকটায় কচু শাকের ডাঁই। ক'দিন আগে এক বছরের জন্যে ল্যাংড়া বিদায় নল। মাছের পাড়ায় দেড় কিলোর ইলিশ। হিম পড়ে গেল? ার মানে কি? একটা বড় জিনিস টপকে গেল পৃথিবী। তার ই সাতচল্লিশ বছরের বেশ অনেকখানি জীবনে দেবকুমার এ কাণ্ড ার কোনদিন দেখে নি। পুরো একটা ঋতু মুছে গেল?

এরকম পর পর আর বেশিক্ষণ ভাবতে পারে নি দেবু। কারণ, ই বর্ষা হারানো একটা ভাবনায় মাথাটা আটকে থাকায় ভেতরে

টনটন করে ওঠে তার। এই টনটনানিকে তার খুব সন্দেহ। এসব জিনিসই বেশিক্ষণ থাকলে সেরিব্রালকে ডেকে আনে। সন্ন্যাস তো কেউ আর আজকাল বলে না। দেবু নিজেও কোনদিন বলে নি। তবু তার নিজের বয়সটাই এখন সন্ন্যাস ঘেঁষা।

টিফিন সেরে বসুমশায় নিজেই উঠে একটা পান সেজে খেলো। জানলার পাশেই পানের বাটা। উল্টো দিকে এক চোখের ডাক্তারের নিজের বাড়ি। আম খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া আঁটি থেকে গাছ। ফল নেই তাতে। বিস্তর ডাল। রোদ আটকাচ্ছিল বলে ডাক্তারবাবু গাছটার একটা বড় ডাল কেটে দিয়েছে ক'দিন আগে। জায়গাটা ন্যাড়া লাগলো দেবুর। এভাবে কেউ গাছ কাটে! প্রায় নিজেকে ফাটিয়ে গাছটা তার কাটা জায়গায় কয়েকটা জাম রংয়ের কচিপাতা বের করেছে। সুযোগ-সুবিধায় যদি আবার সেখানে ডাল গজায়। সত্যি হিম পড়ে গেল? এমন তো হয় না কোনবার।

আজ রবিবার। এখন ভোরবেলায় দেবুর সারা বাড়ি ঘুমোচ্ছে। বাড়ি মানে সাড়ে তিন ঘরের ভাড়াটে সে। আগেকার ধাঁচে স্কুলের কায়দায় ক্লাসরুমপানা ঘর। পর পর। থ্রি ফোর। কোনটার সঙ্গে যোগ নেই। যোগ বলতে একটা লাল বারান্দা। একদম খোলা। এবার সত্যি বারান্দাটা তো সেভাবে বৃষ্টি ভেজে নি। বৃষ্টি তাহলে এলোই না। তাজ্জব!

সামনের জানলা দিয়ে দেবু বোস আম গাছটাকে দেখলো। এই সময় তো ওর ডালপালা ভিজে থাকে। এখন ভাদ্রের মাঝামাঝি। মেঘ ঘষটানো ভাবটাই কেটে গেছে আকাশের। আস্ত একটা ঋতু উধাও? বাঃ! বেশ। বেশ।

হাল্কা করে ভাবতে চাইছিল দেবু। কারণ, এই জানাশুনো পৃথিবীতে কখনো এত বড় একটা কাণ্ড এত গোপনে ঘটেছে বলে তার মনে পড়ে না। ঠিক যেমন গতবারে ড্যাম ফেটে একটা বান

হাইওয়েতে লাফিয়ে পড়েছিল। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে লোকসুদ্ধ একটা ফিয়াট খেলো প্রথম। তারপর তামাকের লরী চ্যাংদোলা করে পুলের নীচে। শুকনো খটখটে আম গাছটাকে দেখেই দেবু বিড়বিড় করে বললো, বর্ষা টপকে হিম এসে পড়লো? কি করে টপকায়? বর্ষাটা তাহলে কোথায় সেঁধিয়ে থাকলো? এ যে একটা ভূমিকম্পের চেয়েও বড়। এর পাশে তার সাতচল্লিশ বছরের জীবনও নস্যি। কত মাঠ জুড়ে কত মাস ধরে কত ফোঁটা।

এই ভাড়া বাড়িটাকে সে এখন মনে মনে বসুজ ইটিং লজ বলে ডাকে। লজের এক নম্বর বোর্ডার সে নিজে। কারণ, এখানে ইটিং লজিং দুই-ই চলে তারই আয় করে আনা টাকায়। সেই আয়ে বিশেষ কোন কেরামতি নেই। লোকে চাকরি করে যেমন টাকা আনে।

পাশের ঘরেই থাকে দু'নম্বর বোর্ডার। শেফালী বসু। চব্বিশ বছর বয়সে দেবকুমারের বিয়ে করে আনা বউ। কাল সন্ধ্যে রাতে তাকে তার প্রিয় টিফিন দেবার সময় শেফালীর গায়ে ছিল অর্ডার দিয়ে বানানো ফিটিংয়ের ব্লাউজ—বেগুনী রংয়ের। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা। কেননা, দেবু শাড়িটায় কয়েকটা ছাপা বেগুনী ফুল আবিষ্কার করেছিল। ও তো জানেই না, এবার বৃষ্টি আসেই নি একদম। কলকাতার শিরদাঁড়াটা এখন পাতাল রেলের গর্ত। ভাল বর্ষা হলে সেখানে খাল হয়ে যায়। এবার তো তা হোল না। শেফালী যে কেন জানে না—এবারে বৃষ্টি আসে নি—অথচ হিম পড়া শুরু হয়ে গেল—মাঠে ভোরবেলা নধর সবুজ বরবটিগুলো ভিজে যায়—মোটা পাতির ঘাসে আলো পড়লেই চিকমিক করে ওঠে।

কাল সন্ধেবেলা শেফালী একা একা একটা বেণী বেঁধেছিল অনেকদিন পরে। পেছন থেকে দামী পিঠখানা ভীষণ লোভের হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ফিনফিনে ব্লাউজ বোধহয় আসলে গায়ের পাতলা

খোসা। ছাড়ালেই শেফালী। আজকাল আমরা আলাদা শুই।

এই কথাটা মনে পড়তেই দেবকুমার তার চোখের সামনে একটা আধভাঙা জাম দেখতে পেল। ভেতরটা একদম দগদগে বেগুনী। মানুষের শরীর এমন হয় ভেতরে ভেতরে। সেখানে রঙটা লাল। মাংস খাওয়া—ভালবাসা—এসব এক জিনিস। গরমের দুপুরে ঢেউ টিনের ছাদে কাকের হপ স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প দিতে দিতে দেবকুমার এরকম নানা ভাবনায় ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল।

তখনি শেফালী জেগে গেল। চোখে পুরো ঘুমের আরাম। তবু নাকের লাগোয়া গালে একটা ভাঙা দাগের ছাপ। কি করছিলে এখানে দাঁড়িয়ে?

থতমত খেয়ে গেল দেবু। ওপেনারটা কোথায়?

এই ভোরে মদ খাবে? তুমি বড় লোভী।

মদ বলো কেন শেফালী? বলো—ড্রিংকস্।

তোমার না শরীর খারাপ। পেচ্ছাব হচ্ছে না ঠিকমত।

ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন শেফালী? উঠে ওপেনারটা খুঁজে দাও তো।

আবার ডাক্তার আনতে হবে। আবার ক্যাপস্যুল—

কিছু লাগবে না। শুনলে না—অ্যালবুমিন—নিল। সুগার—নিল। পাসসেল—অকেসন্যাল। আমি সেরে গেছি।

না। যাও নি। কাল রাতে কুঁথে কুঁথে পেচ্ছাব করছিলে।

তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলে শেফালী?

ওমা! তা দেখবো কেন? ফাঁকা বাড়ি—

জানো। এবার আর বৃষ্টি হবে না। সেই সামনের বছর আবার—

বাজে কথা রাখো। দেখো দুগ্গা পুজোর মুখে আকাশ ভাসাবে

এবারে। ভাসলেই বা। আমাদের তো আর কচি কাচ্চাবাচ্চা নেই।

ওপেনারটা পিচবোর্ডের কেষ্ট ঠাকুরের পেছনে খালি শ্যাম্পুর বোতলের নীচে পেয়ে গেল দেবু। ভোরবেলা সে কোনদিন খায় নি। কিন্তু এইমাত্র ওপেনারটা হাতড়াতে গিয়ে কাঠের তাকে তিনটে মাড়কসার ছানার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বসে আছে। দিয়েই সে বুঝতে পারলো, জীবন ফুরায়ে যায়। দেবু মুখে বললো, সাত তাড়াতাড়ি কে মেয়ের বিয়ে দিতে বলেছিল ? এখন ফাঁকা বাড়িতে বেলা করে ঘুমোচ্ছো।

আগে উঠে কি করবো বলতে পারো ?

এসো। আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক করবে। একসঙ্গে দু'জনে। শেফালী—

আমার ওসব ভালো লাগে না।

ভীষণ ইচ্ছে—তোমায় একদিন মাতাল দেখি। সেই যে জল মনে করে একবার নীট জিন খেয়ে ফেলেছিলে আধ গ্লাস—দু'পেগ তো ছিলোই—তখন রুণু ছোট আমাদের—

কত শখ ! নিজের বউকে মাতাল ভাবতে ভালো লাগে ?

অন্যরকম তো। তাই না শেফালী।

আসলে তোমাদের মনে মেয়েমানুষের একটা আলুথালু ছেনাল ছবি পাকা করে আঁকা থাকে। সেইটে যতক্ষণ না পাচ্ছো—

সকালবেলা বাজে বোকো না। এসো। থাবে—

আমি এখন শুধু শুয়ে থাকবো। কোথাও যাবো না।

আমায় তো বেড-টি দিলে না ?

ওই তো তোমার বেড-টি সাজিয়ে নিয়ে বসছো। সাতসকালে !

আমি তো অ্যাডিক্ট নই শেফালী—বলেও দেবুর চোখ পড়লো আম গাছটায়। আষাঢ় শ্রাবণে গাছটা একদম ভেজে নি। ভাদ্রেও খটখটে। সারা গায়ে কাঠ পিঁপড়ে। সিমেন্টের ভেতর পথ করে

মাটিতে শেকড় নেমেছে। গাছটার তো বড় কষ্ট। কম জলে খানিকটা নীট খেলো দেবু। তার নেশা নেই। খানিক খাবার পর চিবুকের একটু ওপরে খানিক জায়গা একটু একটু কোঁচকায়। আবার সিধে হয়ে যায়। হাত দিলে টের পাওয়া যায় না। সেই সময়টাই আরামের। তখন একটা সিগারেট ধরায় দেবু। এক দমে ধোঁয়াটা বুকে পাঠিয়ে আবার তুলে আনে। এই তোলার সময়টায় ডবল আরাম।

সেরকম একটা ডবল আরাম পার হয়ে দেবকুমার বসু সিগারেটের লম্বা ছাই ঝাড়লো কাট গ্লাসে। উপহার পাওয়া অ্যাশট্রে। বসুজ ইটিং লজের দু'নম্বর বোর্ডার আবার হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। এখুনি পুরোদস্তুর রোদ উঠে যাবে। তারপরই একটা লোডশেডিং। তাহলেই চিত্তির। ভোরবেলাটাই ঘাম আর গরম দিয়ে শুরু হয়ে যাবে।

এই শেফালী। ওঠো না।

কোন জবাব দিল না শেফালী। কাজের মেয়েমানুষটি কয়লা ভেঙে আঁচ ধরাচ্ছে। ঠিকের বাসনমাজুনী ছাই ঘষছে। জমাদারের ঝ্যাটার আওয়াজ। এই বুঝি খবরের কাগজ দিয়ে গেল হকার। বেড়ালের খাবার চেয়েও নরম পায়ে খবরের কাগজ এসে পড়ে।

শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠছে না তো! অথচ ঘুম থেকে তো এই ওঠা। তবে জোর আসছে না কেন? টানটান হয়ে শুয়ে দেখলো দেবকুমার বসু। সুবিধের লাগলো না। উঠে বসলো। তাও তো তেমন কিছু লাগছে না। খিদে নেই। ঘুমের ইচ্ছে নেই। জেগে থাকতেও তেমন ভাল লাগছে না। দাঁড়িয়ে দেখলো দেবু বসু। কোন উনিশ বিশ নেই। অথচ শেফালী দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

লাফালাফি করছো কেন?

তুমি ঘুমোও নি?

দুপদাপ করলে কেউ ঘুমোতে পারে?

কোন কাজে কোন চাড় নেই আমার। কি হয়েছে বলো তো শেফালী ?

খাচ্ছোদাচ্ছো। অসুরের মত জোর হচ্ছে গায়ে। কোন পরিশ্রম নেই—

হেঁটে আসবো তাহলে ?

যা ইচ্ছে করো। বলেই শেফালী পাশ ফিরে শুলো। এই শোবার ভঙ্গীটা দেবকুমারকে অস্থির করে থাকে। কিন্তু এখন সে অস্থির হোল না। ভাদ্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ্দুর চোখ লাল করে এইমাত্র কলকাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লণ্ড্রির লোহার ইস্ত্রি একদম। সব সমান করে পালিশ দিচ্ছে। ট্রাম বাস ট্যাক্সি বসতবাড়ি নিরুপায় হয়ে পুড়ে যাচ্ছে সে পালিশে।

দেবকুমার আরেক সিপ মুখে দিল। দিয়ে বুঝলো এসব তার জন্যে নয়। জিনিসটা নরম হুইস্কি। অনেকদিন আগে কে যেন উপহার দিয়েছিল। তখন খানিকটা খায়। পরে প্রায় অর্ধেক পড়েছিল। ছিপি খুলেও দেখে নি দেবকুমার। ভাড়া বাড়িতে সবই অস্থায়ী। ফ্রিজ, রেকর্ড প্লেয়ার, ইনডেন, টেলিফোন, ফ্রুট মিকশ্চার, দাড়ি কামাবার ফেনাভর্তি টিউব। সবই। এরা এই ঠিক থাকে—আবার এই বিগড়ে যায়। এর ভেতর দেবকুমার বসু নিজেকে ইনস্ট্যাণ্ট কফি বলেই মনে করে। সে নিজেও তো নানা রকম জিনিস জুড়ে তবে দেবকুমার বসু। খানিকটা বাড়ির দেবকুমার। খানিকটা অফিসের। বাকীটা স্বপ্নের। যেমন কিনা খাট পালঙ্ক দিয়ে সাজানো এই বসুজ ইটিং লজের ঘর-গেরস্থালী।

বাড়িটা বড় ফাঁকা লাগে শেফালী।

শেফালীর তখন মিহি করে নাক ডাকছিল। আধোভেজানো জানলার ওপারেই ভাদ্র মাস। তারপর বাড়িওয়ালার একটা দেওয়াল। দেওয়াল টপকে ডাক্তারবাবুর ডালকাটা আমগাছের ন্যাড়া ছায়া—এ ছায়া আগে আরও মোটা হয়ে পড়তো।

আটটা বাজতে চললো। উঠবে না?

শেফালী অন্য জায়গা দিয়ে জবাব দিল। আরেকটু ফ্যামিলি প্ল্যানিং করো!

তুমি জেগেছিলে?

তোমার জন্যে ঘুমোবার উপায় আছে! সেই ভোর রাত থেকে উঠে খুটখাট করে যাও।

একই সঙ্গে ঘুমোতে আর নাক ডাকতে পারো। আশ্চর্য!

বাজে বোকো না। আমি ও-ঘরে গিয়ে শুচ্ছি।

শেফালী উঠে যাওয়ার সময় দেবকুমার টের পেলো, আলুথালু শেফালীর জন্যে তার কোন লোভ হচ্ছে না। এখন সে গিয়ে রাজুর পাশে শোবে। রাজা বসু। এই ইটিং লজের তিন নম্বর বোর্ডার। দেবকুমারের ছোট ছেলে। ক্লাস এইটে পড়ে। রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় রাজা পরপর দু'বার ফাইনালে উঠে খবরের কাগজের ছবি হয়েছে। সবাই বলছে—চাই কি রাজু স্পেসকি হয়ে যেতে পারে। নামটা ঠিক উচ্চারণ হয় না দেবুর মুখে। কোন্ দেশের কোন্ এক মহা দাবাড়ু সে।

মাঝের দরজাটি আটকানো। ওপাশে নীল রংয়ের মশারির ভেতর রাজু শুয়ে। সে সকাল সকাল ঘুমোয়। বেলা করে উঠে দাবা খেলতে বসে। তখন বাড়িতে কোন গোলমাল হতে পারবে না। পাছে চালে ভুল হয়ে যায়। হেলায়-ফেলায় পরীক্ষা দিয়ে রাজু টেস্থের ভেতর প্লেস রাখে। তাই কম কি! রাজু তো অর্ডিনারি লোকের মত পাস ফেল করে চাকরি খুঁজতে যাচ্ছে না। সে-ও তো ফিউচারের একজন মহা দাবাড়ু।

মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাকে আর বিশ্বাস করে না দেবকুমার। যে কোন সময় বন্ধ হতে পারে। তারপরেই তো কুলকুল করে ঘাম। তাতে পথভ্রান্ত মশা এসে বসে আর উঠতে পারবে না।

ঘামে ভেজা ডাঁড়া ভারী হয়ে যাবে। তখন গা থেকে তুলতে গিয়ে পট করে টিপে মেরে ফেলবে দেবকুমার।

এই তো জীবন। কিংবা এইভাবেই বুঝি জীবন ফুরায়ে যায়। আমার বাবার প্রায় প্রত্যেক ক্লাসে ছেলে থাকতো। থ্রি ফোর ফাইব সিক্স। প্রায় সেরকম। থ্রি-তে টাপু, ফাইবে টুলু, এইটে আমি, টেনে তনুদা। সব ক্লাসে বাবার ছেলে। আমরা স্কুলে যেতাম। এক একদিন ক্লাসে পৌঁছতে দেরি হলে স্যার ঢুকতে দিতেন না। আজও লেট? বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো এক পিরিয়ড্। কি হয়েছিল?

ভাত হয় নি স্যার।

কেন? চাল ছিল না? ফের মিথ্যে বলছিস?

ছিলো স্যার।

তবে?

রাঁধবে কে? মা তো—

কি?

কাল রাতে আমাদের ভাই হয়েছে স্যার—

যা। ভেতর গিয়ে বোস।

দেবকুমার বসু হিসেব করে দেখলো, সেই সব ভাই এখন দূরে দূরে। আলাদা আলাদা জীবন। আলাদা আলাদা সংসার। একজন সুইসাইড্ করেছে সেই প্রায় তিরিশ বছর আগে। তার চেহারাই মনে নেই দেবকুমারের। মা-বাবাই আর নেই। যাদের সংসার তারাই নেই। কে আর এখন ছেলেমেয়ের হিসেব নেবে? সে এখন একজন গেরস্থ মাত্র। এবং ভীষণ ফাঁকা গেরস্থ। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি। দাবাড়ু বালক-পুত্র মশারির ভেতর ঘুমোচ্ছে। তার মা পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো এইমাত্র। শেফালী তো বলেই গেল—আরেকটুকু ফ্যামিলি প্ল্যানিং করো।

কোন প্ল্যানিং ছিল না আসলে আমার। ভেবেছিলাম—বাচ্চাকাচ্চা বাড়ালে চালাবো কোত্থেকে? দুধের কৌটো। নতুন

মশারি। গ্রাইপ ওয়াটার। পোলিও ওষুধের জন্যে লাইন। নয়তো শেফালী তো বলেছিল—এইবেলা আর দু'একটি হয়ে গেলে মন্দ না—বয়স থাকতে থাকতে।

তা তখন খেয়ালই হয় নি। কিছুকাল আগে দেবকুমার বলেছিল কথাটা। শুনেই তো শেফালী ফোঁস করে উঠেছিল।

এই বয়সে আর লোক হাসাতে পারবো না বাপু। হলে তোমার পেটে হোক!

কেন? টাপু তো আমার বাবার পঞ্চান্ন বছর বয়সে হয়েছে।

তোমরা গরু ছাগলের মত একধার থেকে হয়ে গ্যাছো।

আর কথা বাড়ায় নি দেবকুমার বসু। তার হাত দিয়ে বছরে সাত সাড়ে সাত লাখ টাকার পারচেজের বিল পাস হয়। সে একদা বাছুরের মতই তার বাবার ভাড়াটে বাড়ির বারান্দায় হোগলার বেড়ার আড়ালে টেমপোরারি আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ হয়। সাতচল্লিশ বছর আগে এই ভূমিষ্ঠ হওয়াটার ভেতর ভাবীকালের কোন ইঙ্গিত দেখা যায়নি নিশ্চয়। এইভাবেই জীবন হয়। আমাদের ফিউচার এখন একটি ছোট্ট দাবার কোর্টের ভেতর। যাতে রাজু দান দেয়। কিংবা চাল দেয়। অনেক ভেবেচিন্তে। ঘোড়া, মন্ত্রী, সান্ত্রী সাজায়।

আমার শুধু ক্লাস এইটে একটা ছেলে আছে। তাও অর্ধেক দিন স্কুলে যায় না। স্কুলের ক্লাসে ক্লাসে আমার বাবার কতগুলো ছেলে ছিলো! ফাঁকা বাড়ি। কত দিন শেফালী বলেছে—আর দু' একটা বাচ্চা হলে খারাপ কি!

তখন মশারিতে শহুরে তেরছা জ্যোৎস্না ব্লেড হয়ে ঢুকে পড়েছে। রাত তিনটের পর ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে কলকাতায় আরেক কলকাতা বেরিয়ে পড়ে। তখন নিশুতি ট্রাম লাইনে বনপথ জেগে ওঠে। পাঁউরুটি বেকারির চিমনি হয়ে যায় নিমগাছ। এই কলকাতা হয়ে ওঠার আগেকার জায়গাটা ফিরে আসে। সেই

সময় মানুষজন খুব সরল কথা বলে। তাই শেফালী বলেছিল—আমাদের আরেকটি ছেলে হলে কেমন হয়?

হয়েও ছিল প্রায়। তখনকার যা মন ছিল দেবকুমারের—তাতে সে অ্যাবরশনের আয়োজন করে। শেফালীর স্থির বিশ্বাস—ওটি ছিলো ছেলে।

দেবকুমার বসু এক চুমুকে গ্লাস খালি করে দিল। অমনি বড় আশার দপদপানি শরীর জুড়ে শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ হার্ট বিট্ বেড়ে গেল। এই সময়টায় কঠিন কাজ সহজ লাগে। যে-কথা অন্য সময় বলতে গেলে আটকে আসে— এখন শুধু আটকে রাখা—নয়তো ফসকে বেরিয়ে যায়।

মিটসেফের মাথায় পানের গোছা। স্নোর খালি কৌটায় চুন। কুচোনো সুপারি ভর্তি কৌটো। তার পাশেই অফিস লাইব্রেরি থেকে আনা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেন আই হ্যাভ্ মেট্'। দেবেন্দ্রনাথ টেগোর। আনন্দমোহন বসু। রামকৃষ্ণ। পরেপর পাতা উল্টে গেল দেবকুমার বসু। কোন পাতাতেই তার চোখ আটকে গেল না। মায়া রায়ের বাংলা অনুবাদ। ১৯২০ সনে প্রকাশিত। কতকাল আগের বই। এই বইটা বেরোনার সময় ছবিতে আমার ওই বাবা পূর্ণ যুবক। আমি ভূমিষ্ঠ হই নি। শাস্ত্রীমশায় যাঁদের দেখেছিলেন—সেইসব দেখাগুলো ১৯২০ থেকে আরও পঞ্চাশ বছর অন্ততঃ পিছনে। সে তো একেবারে অন্য রকমের পৃথিবীতে।

বসুজ ইটিং লজের এক নম্বর বোর্ডার দেবকুমার বসু তার সামনের টেবিলে চিবুক লাগিয়ে মাথাটা রাখলো। সেজন্যে সে এখন তার খাবার টেবিলটার গা আরও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এক সময় মনে হোল—টেবিলের ওপর শুয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। জীবনটা এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন?

আমার কি কোন কাজ নেই? না, মানুষ এমন হয়ে যায় আস্তে আস্তে?

এখন সবে আটটা। আজ রবিবার। অফিস নেই। কোন জরুরী কাজ নেই। কোন পাওনাদার নেই যে এখনই আচমকা এসে তাগাদা দেবে। আমি এগোই না। পিছোই না। ভাসি না। ডুবি না। খিদে নেই। আবার কোন অখিদেও নেই আমার। বেঁচে থাকাটা কি এই রকম? মরেও তো যাই নি। তাহলে?

এ বাড়িতে কোন আনন্দ নেই। কোন উৎসাহ নেই। ফটোর বাবা মায়ের চোখেও পলক পড়ে না। শেফালী বাজার থেকে গাঁদার মালা এনে পরায় ওঁদের। মালা পাল্টে পাল্টে দেয়ও।

দেবকুমার বসু বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লো। ফর্দ তার মুখস্থ। মিঠে পান ছ'টি। দু'বিড়ে লাউডগা। আলু পাঁচশো। পটল আড়াইশো। কাটা পোনা সাড়ে তিনশো। একটা চালতে। নয়তো চারটে টমেটো। মাঝেমধ্যে একটা কি দুটো কাঁচা কলা।

বাজার থেকে ফেরবার পথে পাড়ার মোড়ে বড় গজল্লা। সেখানে রেস্তোরাঁর চেয়ার বাইরে ফুটপাতে এনে যারা বসে আছে—পলিটিক্স, ফুটবল, গাভাসকার কত কি বলে যাচ্ছে—তারা অনেকেই দেবুর চেয়ে বড়। ওদের সবই খেতে ভাল লাগে। সবই বলতে ভাল লাগে। মুখে স্বাদ আছ। মনে স্বাদ আছে। আমার নেই কেন? বাজারের ব্যাগ হাতে দেবকুমার বসু দাঁড়িয়ে পড়লো। মুচিকে বললো, গোড়ালির পেরেকটা একটু ঠুকে দাও তো ভাই।

আমার লিভার তো ভাল। চোখে বাইফোকাল। শরীর মোটামুটি সুস্থ। ওই যাঃ! বরবটি কিনি নি তো।

পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে আবার বাজারে ঢুকলো দেবকুমার। হিমে ভেজা দিশী বরবটি। টাটকা। শুকনো লঙ্কা দিয়ে মাখো মাখো তরকারি। বড় প্রিয় টিফিন তার। এবার ভাদ্রের রোদের

ডবল গরম। ব্যাপারী মেয়েছেলেটি বললো, আজ তো নেই বাবু।

কেন? আজ তোলো নি ক্ষেত থেকে?

রোজ কি তোলে? আঘাত পায় গাছ। একদিন অন্তর একদিন তুলি। আবার কাল পাবে। কাল এসো।

কাল যদি আমি না আসি?

বউদিদি আসবেন তো। তাকে চিনি আমি। ডেকে দে দোব।

সে যদি না কেনে?

সোয়ামী কি খেতি ভালোবাসে মেয়েরা জানে না? যাও, আমি রেখে দোব কাল। এবারে বর্ষা এলো নি তো। জমিতে জো নেই।

জো কি গো?

ওই যে অস। যাকে তোমরা রস বলো বাবুরা—

বাজার ফেরত পাড়াটাও শুকনো খটখটে লাগছিল দেবকুমারের। গেরস্থ বাড়িগুলোর সামনে পোড়া কয়লার ছাই। রক্তমাখা ন্যাকড়া। মরা ইঁদুর। পেঁপের চোকলা। পাতাল রেলের জন্যে বড় রাস্তা ছেড়ে মিনিবাসগুলো এ-পথে। ধুলো। গরম। ছায়া নেই। রোদের চেহারা সাদা। কোথাও একটু রস নেই। ভাঙা টিউবয়েল বসাচ্ছে। সেখানটায় পোড়ি কাদা ভুগভুগ করে পাতাল থেকে বেরিয়ে আসছে। তার পাশেই পরেপ্পর কলকাতার গেরস্থ বাড়ি। রং হয় নি কতকাল। আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়াটে। বাড়িওয়ালা কোন এক ফ্লোরে। নয়তো ভাড়া দিয়ে ছিমছাম জায়গায় উঠে গেছে। এই শহরটা নতুন করতে পাতালের গলিগুলো সাফ করা দরকার। চাই আরও চওড়া রাস্তা। পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া সন্ধেবেলায় শহরের মাথায় ঝুলে থাকবে। আর কত যে বাড়ীর কলি ফেরানো দরকার, তার তো ইয়ত্তাই নেই।

এবার আবার বর্ষা এসে শহরটা ধুয়ে দিয়ে যায় নি। কি গেরো। টিউবয়েলের বালি তোলা, পাঁক তোলা দেখতে দেখতে দেবকুমার নিজের ভাড়া বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

বাড়ি ঢুকেই বসার ঘর। বসুজ ইটিং লজের এই ঘরখানি কখনো বৈঠকখানা বা ড্রইং রুম। আবার আচমকা লোক এসে উঠলে এ ঘরখানাই শয়নমন্দির। তাই খাট আছে। সোফা আছে। আছে রেকর্ডপ্লেয়ার। আর কাটগ্লাসের অ্যাশট্রে।

তাতে আস্তে আস্তে ছাই ঝাড়ছিল অসিত। অসিত দত্ত। দেবকুমারকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ। তোদের কাজের মেয়েলোকটি বললো—বাজারে গেছিস।

চা দিয়েছে?

করছে বলে বসতে বলে গ্যালো।

শেফালী আসে নি?

ঘুম থেকে ওঠেন নি হয়তো। বোস না দেবু।

দাঁড়া বাজারটা রেখে আসি।

রান্নার কাজের মেয়েমানুষটির নাম তৃপ্তি। বয়স হয়েছে। হয়তো বালবিধবা। ডাকঘরে টাকা রাখে। থাকে কাছেরই পোড়া বস্তিতে। পুলিস রাত হলে ও পাড়ায় রোজ তল্লাসী করছে বলে ইদানীং সারাদিনের কাজের পর বস্তির ঘরে ফিরে যায় তৃপ্তি। নয়তো ঘর নাকি বেদখল হয়ে যেতে পারে। দেবকুমারকে মাঝে মাঝে ধমকে কথা বলে। তুমি বলে ডাকে। মাঝে মাঝে দোক্তা পাতা পোড়াতে দেয়। দুপুরে সবার খাওয়া-দওয়ার পর। তখন তামাক পাতার গন্ধটা দেবুর খুব ভালো লাগে। বাজার নামিয়ে দিয়ে তৃপ্তিকে বললো, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চালতেটা খেতো করবে।

না। পারবো না।

দেবকুমার জানে, এ হোল গিয়ে তৃপ্তির এক রকমের 'হ্যাঁ' বলা।

তার হাতের রান্না ভালো বললে তৃপ্তি যে কোন খাবার খেটেখুটে রাঁধে। আসলে তৃপ্তি তার কাজে স্বাদ পায়। বয়স তার ষাট বাষট্টি হবে।

দেবকুমার অন্য কথা বললো, বৌদি আর আমাদের—সবসুদ্ধ তিন কাপ চা দেবে।

বৌদি ওঠে নি। ভোরবেলাই মদ খাও নি তো?

একটু চুপ করে থেকে আস্তে বললো, এখুনি উঠে যাবে। বলে বসার ঘরে চলে এলো দেবকুমার। ভোরে উঠিস বুঝি আজকাল।

না উঠে উপায় নেই দেবু। আর তো পনেরো বছর চাকরি আছে। অ্যাকটিভ্ থাকতে হলে বডি ফিট রাখতেই হবে। তাছাড়া—

তাছাড়া ভেবে ত্থাখ্—আমারই পেনসন, আমারই গ্র্যাচুইটি, ইনসিওরেন্স, সেভিংস সার্টিফিকেটের সব টাকা ঋতু এনজয় করবে। আর আমি স্ট্রোকে ল্যাংড়া হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখবো?

তোরই তো বউ ঋতু। ওরও তো স্ট্রোক হতে পারে।

পারে দেবু। কিন্তু মেয়েদের স্ট্রোক হয় না। হলে পটল তোলে। ওরা তো স্মোক করে না।

হো হো করে হেসে উঠলো দেবকুমার বসু। আসলে ওদের টেনসন কম। কি খাবি বল?

সে শেফালী এলে বলবো।

এখনো ওঠে নি হয়তো। দেবকুমারের কথা শেষ না হতেই শেফালী এসে ঘরে ঢুকলো। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো। শাড়িটা পালটেছে।

চায়ের সঙ্গে কি খাবেন?

স্রেফ বিস্কুট।

ব্যাস?

এই 'ব্যাস' বলার ভঙ্গীতে দেবু পরিষ্কার দেখলো—এবার যে বর্ষা আসে নি—তার কোন দাগই পড়ে নি শেফালীর মুখে। একটু আগেই সে বাজারে ব্যাপারীদের মুখে শুনেছে—হিম এগিয়ে এসে না পড়লে যা কিছু সবজী মাঠে ছিল—সব পুড়ে খাক হয়ে যেত। অথচ শেফালী একটুও ঝলসায় নি। এর নাম ঘুম। বিশ্রাম। ডায়েটিং। প্রসাধন।

প্রসাধন বা কসমেটিকস—যাই মনে পড়ুক না কেন—দেবকুমার বসু পারিষ্কার দেখতে পায়—জন্তুর চর্বির সঙ্গে মিহি গুঁড়োর চকখড়ি মিশিয়ে গন্ধ তেল গুঁজে দেওয়া হচ্ছে তাতে। তাই-ই স্নো। এই জিনিস মুখের খুঁত ঢাকতে লাগে।

তারপর এক সময় চা এলো! বিস্কুট এলো। আপনারা বসুন বলে শেফালী উঠে যাচ্ছিল। অসিত তাকে যেতে দিল না। তারপর বলুন—রুণু কেমন আছে? শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে?

আসতেই চায় না। কিন্তু আরেকজনের তো—বলে শেফালী দেবুর মুখে তাকালো।

অসিত হাসলো। তা তো কষ্ট হবেই। কে বলেছিল সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে। রুণু তো আরও ক'বছর এ বাড়িতে থাকতে পারতো।

শেফালী এক সময় উঠে গেল। ঘরের বাইরের বারান্দাটা রোদে পুড়ে যাচ্ছিল। কোথাও একটু ছায়া নেই। শেফালী আবার এ ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ালো। তোমার জিনিসপত্তর টেবিল থেকে সরিয়ে দিয়ে এসো। রাজু খেলবে।

অ্যাতো বেলায় ঘুম থেকে উঠে এখন দাবা খেলতে বসবে? সেজন্যে আমায় গিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে আসতে হবে? আশ্চর্য! এসব কথা মনে এলেও দেবকুমারের মুখে ফুটলো না। সে আস্তে অসিতকে বললো, একটা ড্রিংক নিবি?

না। এই তো চা খেলাম। মর্নিং ওয়াকের পর লাইট চা ভালো। তুই দিনের বেলা খাস ?

খাই না। কিন্তু আজ একটু খেয়ে দেখলাম। আমার তো কোন নেশা নেই।

অসিত দেবুর চোখে চোখ রেখে বললো, তুই এই বেলা যা হোক কিছু একটা নেশা কর।

এ বয়সে আর হয় ?

না না। একটা নেশা ধরে ফেলা দরকার তোর।

দেবকুমার জানতে চাইলো, কেন ? খুব জরুরী ?

হ্যাঁ। তুই বোধহয় জানিস না—তুই আস্তে আস্তে নীতিবাগীশ হয়ে পড়ছিস। তোর কোন বন্ধু নেই।

দেবকুমার ঘরের ছায়ায় বসে বাইরের রোদের ঝাঁঝ দেখতে পাচ্ছিল। বাইরের বারান্দায় রোদ আটকানোর আম গাছের সেই ছায়াটা তো আর নেই। রাজু এতক্ষণে টেবিলে কোট সাজিয়ে বসেছে।

আমি তো কারও ক্ষতি করি নি। কারও পাকা ধানে মই দিই নি।

দিস নি ঠিকই। কিন্তু তুই বড় ট্যাক্টলেস। সবাইকে তুই কেন শত্রু করে দিচ্ছিস ? কোন জায়গায় তোর হয়ে কোন ভাল কথা শুনি নি।

আমি কি চোর ? মিথ্যেবাদী ? খুনী ?

কোনোটাই নয়। তবু তোকে নিয়ে এত আপত্তি কেন ? কোন নাম বলছি না। আশা করি কোন নাম জানতে চেয়ে তুই প্রেস করবি না।

আমার বন্ধু হলে তোর নাম বলা উচিত অসিত।

নাম আমি বলতে পারবো না দেবু। আর এই বয়সে নাম জেনেই বা কি করবি ? মানুষ তো আর পাল্টাতে পারবি না।

তোকে পারচেজ থেকে জেনারেলে আনার জন্যে কত চেষ্টা করলাম। যাকেই বলি—সে বলে—হোয়াই বাসু? আরও তো অন্য লোক রয়েছে।

আমি আমার মেরিটে যাবো অসিত।

মেরিট আজকাল কেউ দেখে না। তুই একটু মিশুক হতে পারিস না দেবু?

হয়ে আমার লাভ?

কেন? একটু করে কথা বলবি সবার সঙ্গে। সবাইকে সুইট কথাবার্তা বলবি।

সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে শুধু হিপোক্র্যাট। নয়তো জালি লোক। যার জীবনে কিছু করার আছে—সে কখনো সবার প্রিয় হতে পারে না।

তুই কি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ? আছিস তো পারচেজে। কি মহান কাজ করবি সেখানে?

অনেক কিছু করার আছে। প্রথম কাজ—আমি পারচেজে থেকেও একটি পয়সা ঘুষ খাবো না। এটা কিছু কম কাজ নয় অসিত।

এতে কোম্পানির কিছু যায় আসে না ভাই। কোম্পানি চায় আমরা ঘুষ খাই। তাহলে মেটিরিয়ালের খরচা বেশি দেখিয়ে প্রোডাক্ট প্রাইসের পড়তা বেশি দেখাতে পারবে। তার চেয়ে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলা ভাল নয় কি? আমি কারও বদনাম করি নে। আমার কাছে সবাই ভাল। কারণ আমার কোন অ্যামবিশন নেই।

রাগ করিস নে অসিত। কারও বদনাম না করা একটা বদামো। তোর অ্যামবিশন আছে বলেই এই বদামি করিস।

আমায় কি বলছিস, তা বুঝতে পারছিস দেবু?

বুঝেই বলছি। যার জীবনে কিছু করার থাকে—তার লাইকস্

ডিজলাইকস্‌ও খুব স্ট্রং। তার গায়ের গন্ধও আলাদা। সে যে জায়গাতেই থাকুক—সেখানেই সে কিছু না কিছু একটা করবে।

ভগবান তোর হাতে দুনিয়ার ভার দিয়েছেন বল!

অত বড় কথা বলতে পারবো না।

এজন্যেই তোর কথাবার্তায় নীতিবাগীশের ছাপ এসে পড়ছে।

তা পড়তে পারে অসিত। একটা বিশ্বাস—কিংবা বিশ্বাসে পৌঁছাবার জেদ—চেষ্টা আমার সাধারণ অফিসকে আমার চোখে অসাধারণ করে দেয়। বলতে পারিস—তখনই আমি জব স্যাটিসফ্যাকশন পাই। নয়তো অফিসে যাবো কেন?

সেজন্যে সাপ্লায়াররা তোর নামে চুকলি কাটছে। তুই নাকি বোতল না পেলে চেকে সই করিস নে?

তা তো বলবেই। নিজের পয়সায় আমি মদ খাই। আমার পাবলিক রিলেশনস্‌ ভালো নয় আমি জানি। কিন্তু কি করবো? আমি তো আমাকে পাল্টাতে পারবো না অসিত।

বক ফুল ভাজা খাবেন নাকি? বলতে বলতে ব্যাসনে ভাজা কয়েকটা ফুল নিয়ে প্লেট হাতে ঘরে ঢুকলো শেফালী। সেই ঝোঁকেই দেবকুমারকে বললো, অত কথা বলছো কেন? রাজুর দান ভুল হয়ে যাচ্ছে—

সাত সকালে দাবার কোর্ট নিয়ে বসলো? পড়বে না?

পড়ে তো কত দিগ্‌গজ হয়েছো—বলতে বলতেই শেফালী অসিতের চোখে পরিষ্কার করে তাকালো। আপনার বন্ধু তো আজকাল ফাঁক পেলেই কবিতা লেখে।

তাই নাকি?

সেকি? আপনি জানেন না?

দেবকুমার বসু তার বউকে কোন বাধা দিল না। এই মহিলা বাজারে ঢুকলে মাছওয়ালারা বউদি বউদি বলে চেঁচায়। মুর্গীওয়ালা বাকী দেয়।

॥ দুই ॥

পতন ও পত্তনে
ইতিহাস সমান হাসে
পরাজিত রক্তের নাম যেমতি পুঁজ

এই অব্দি লিখে দেবকুমারকে থামতে হোল। এখন রেডিওতে কোন স্টেশন নেই। আজ ইলেকট্রিক যায় নি। রাত বারোটা। কাল সোমবার আমার অফিস। শেফালী রাজুর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। কবিতাটা হয় নি। শেষের তিন লাইনে এসে ঠেকে গেল দেবকুমার বসু। আমার এ কবিতা তো কোথাও ছাপা হবে না। আমি অক্ষরবৃত্ত জানি না। মাত্রাবৃত্ত জানি না।

একবার শেফালী, রুণু আর রাজুকে নিয়ে দেবকুমার বসু বালেশ্বরে গিয়েছিল। বালেশ্বর বাজারে টাটকা মাছের ছড়াছড়ি। হাইওয়ে বাংলোতে উঠেছিল সেবারে। চমৎকার মিষ্টি চিংড়িমাছ রেঁধে দিল বাংলোর ঠাকুর। শীতকাল। দুপুর দুপুর বেরিয়ে পড়েছিল দেবকুমার। অন্ধ্রের মাছধরা ডিজেল বোটে করে। বালেশ্বরের নদীটা যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে—সেখানটায় নদীর মাঝামাঝি তীরের একটা মুখ এগিয়ে এসেছে। জায়গাটা পাথুরে। এ পথেই নাকি রবার্ট ক্লাইভের লোকজন কলকাতায় সিরাজের তাড়া খেয়ে জলপথে এখানে আশ্রয় পেয়েছিল। এই কথা শোনার সময় পড়ন্ত সূর্যের আলো মুছে যাচ্ছিল। একটা জলপাখি প্রায় মানুষের গলায় হেসে উঠে অন্ধকার সেই পাথুরে তীরের দিকে চলে গেল। এই তো ক'বছর আগে।

তখনই দেবকুমার বসু মনে মনে ওই লাইনটা পায়।—

পতন ও পত্তনে ইতিহাস সমান হাসে
তাই—
পরাজিত রক্তের নাম পুঁজ।

এরকম কত কবিতাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেবকুমারের কলমে চলে আসে। তখুনি যদি অফিস থেকে ছুটে এসে বাড়ীতে ডাইরীতে লিখে ফেলতে পারতো লাইন ক'টা, তাহলে সে সব লাইন হারিয়ে যায় না।

মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। পাশের ঘরে ঘুমন্ত রাজুর পাশে ঘুমন্ত শেফালী। রাজু স্কুলে যায় কোনরকমে। সে যেহেতু দাবার শিশুপ্রতিভা—তাই স্কুলেও নাকি পড়শুনোর কোন চাপ নেই রাজুর ওপর। চমৎকার। অ্যানুয়ালে ফেল করলে স্কুলে তুলে দিতে পারে ওপরের ক্লাসে। কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করবে কি করে? চাকরিই বা পাবে কোত্থেকে? দাবা খেলার কোন চাকরির বিজ্ঞাপন তো দেবকুমারের চোখে পড়ে নি। এভাবে জাঁক দিয়ে কি প্রতিভা পাকানো যায়?

দেবকুমার বসু তার বইয়ের তাক থেকে একে একে প্রিয় বইগুলো নামাতে লাগলো। এর ভেতর তার স্কুল জীবনের বইও আছে। চারু ও হারু। ভোম্বল সর্দার। দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকী। ১৯৪৪ সনের পুজো বার্ষিকীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার প্রিয় লেখকের নামটা বেরিয়ে পড়লো। সুকুমার দে সরকার। গাছপালার ভেতর একটি হরিণের মুখ।

এই গল্পটি দেবকুমার বসু জানে। একটি বাচ্চা ছেলেকে একবার এক নেকড়ে মা ধরে নিয়ে যায় খাবে বলে। নেকড়ের বাসার বাচ্চা নেকড়েরা মানুষের বাচ্চাটাকে না খেয়ে খেলার সঙ্গী করে নেয়। মানুষের বাচ্চা শেষে নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে। তার মুখ দিয়েও নেকড়ের ডাক বেরিয়ে আসে। মানুষের ভাষা সে ভুলে যায়। চলাফেরা করে হামাগুড়ি দিয়ে।

সুকুমার দে সরকার সেই গুহায় যাবার পথের বিবরণ দিয়েছিলেন আশ্চর্য। শিকারী সে পথ দিয়ে নেকড়ের গুহার দিকে এগিয়ে চলেছে। মানুষের বাচ্চাটি এখন বড় হয়েছে। সে নেকড়ের ডাক দিয়ে বেরিয়ে এলো। শিকারী দেখতে পেয়েও তাকে গুলি করলো না।

আরেকটা গল্পে সুকুমার দে সরকার লিখেছিলেন—একটা হরিণ অভিমান করে আত্মহত্যা করলো। ওপর থেকে নীচের খাদে লাফিয়ে পড়ে। সেখানে কোন জল ছিল না। শুধু পাথর আর কাঁটাঝোঁপ।

সুকুমারবাবু ফিরে আসুন। মনে মনে এই কথাটি বলে দেবকুমার বুঝলো, সুকুমার দে সরকার তো আর ফিরবেন না। তিনি তো অনেককাল হোল উধাও। কোন পত্র-পত্রিকায় আর তাঁর লেখা দেখতে পায় না দেবু। সেই অভিমানী আত্মঘাতী হরিণ—নেকড়ের গলায় মানুষ ডাকছে—এ আর হবে না।

বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেবু দেখলো, বর্ষার কোন চান্স নেই। চাঁদ আছে বলে সামান্য আলো। বাতাস নেই। আছে শুধু—কিছু মশা। তারা গান গাইছে আর মানুষের গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এরকম অবস্থায় কি সুকুমার দে সরকার থাকতে পারেন?

শেফালী পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরেই। রাজুর এখন মাঝরাত। আমি এ জীবন নিয়ে কি করবো? আমার মৃত্যুর কোন চান্স নেই। হাড়ে মাংসে ঠাসা একটা লম্বা শরীর। এ শরীর দিয়ে আমি কি করবো? খেতে পারি। খেয়ে যাই। কিন্তু তারপর? ঘুমোতে পারি। ঘুমোই। কিন্তু তারপর?

সুকুমার দে সরকার এই পৃথিবীর কোন্ জায়গায় আছেন—কে জানে? তাঁরই লেখা এ পৃথিবীতে হরিণ আত্মঘাতী হয়। নির্জন বনপথে বাঁদর শিশু হঠাৎ অজগরের স্থির দৃষ্টিতে পড়ে গিয়ে আর নড়তে চড়তে পারে না। এই কলকাতায় এখন আমরা কোটি

কোটি মশার খাদ্য। কোন বাতাস নেই। এবার বৃষ্টি আসে নি। আস্ত একটা ঋতু টপকে হিম চলে আসছে। শহরের শেষে ভোরবেলার ঘাসের ডগায় ভিজে ভিজে হিম পড়তে শুরু করে দিলো। একি কাণ্ড!

গোটা গোটা হরফে দেবকুমার বসু তার কবিতার খাতায় লিখলো—

মানুষের ইতিহাসে বিস্ময় চাপা পড়ে
মানুষেরই কারণে
কেন না, মানুষ নিজেই সব সময় বিস্ময়ের অতীত
সে যখনই জানে, পৃথিবীতে এই হয়, এইভাবেই হয়
বিস্ময়, বিশ্বাস. উদ্বেগ—সবই আসলে তখন
প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক বোধ

কলম থামাতে হোল দেবকুমারের। কেন না, তার এখন খিদে পাচ্ছে। শেফালী এসব জানে বলেই বুকসেলফের মাথায় স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে হাতে গড়া রুটি আর পাটালি রেখে দিয়েছে। খেয়ে এক গ্লাস জল খেল দেবু। দূরে কোথাও বোমা ফাটলো। হয়তো তৃপ্তিদের পোড়া বস্তিতে।

প্রিয় সুকুমার দে সরকার। আমি যে আর পারছি নে। এখানে আমাকে ট্যাক্টফুল হওয়া দরকার। তাহলে সবাই নাকি আমাকে নেবে। আমি তাহলে পারচেজ থেকে জেনারেলে বদলি হয়ে যেতে পারি। সবার সঙ্গে বেশ সদ্ভাব রেখে চললে সাপ্লায়াররা দু'নম্বর জিনিস দিয়ে টেবিলে টেবিলে কর্তাদের জন্যে ভাগা পাঠাতে পারে। আমি এইটেই বুঝি নি এতদিন।

দু'ঘরের মাঝে একটা দরজা।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেবকুমার তার ধর্মপত্নীকে খুব আস্তে ডাকলো —শেফালী—ও শেফালী—

কোন জবাব পেল না। তাই দেবু আবার ডাকলো, এ ঘরে এসো। শোবে না?

বলেই বুঝলো, কী বোকামি। শেফালী তো শুয়েই আছে। বেশি রাত হলে দেবকুমার বুঝতে পারে, পৃথিবীকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। নয়তো পৃথিবীর অনেক কিছু করার ছিল।

সুকুমারবাবু। আপনি পুজো বার্ষিকী থেকে কোনদিনই কি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না? আমার বউ শেফালী ইদানীং আর আমার সঙ্গে শোয় না সুকুমারবাবু। আমি একা এখন নেকড়ের গুহায়। শেফালী ও ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

এখন রাত প্রায় নিশুতি। পাড়ার রেডিওরা ঘুমোচ্ছে। বিড়ির দোকানের লাইট থাকলে স্কন্ধকাটা আম গাছটার সারা শরীর এখনই দেখা যেতো। সারা বাড়ি ঘুমে। আলমারির আয়নার সামনে গিয়ে দেবকুমার বস্ত্র দাঁড়ালো। এই তো আমার শরীর। এই যে সেই বুক। আমার পেছন থেকে আমার দু'গাল দেখা যায়। গায়ে কিছুকাল হোল কয়েকটি লাল তিল দেখা দিয়েছে। যেগুলো পেটে আর বুকে, সেগুলোকে দেখতে পাই। ছুঁতে পারি। কিন্তু দেখতেই পাই না—ছুঁতেও পারি না পিঠের দিককার তিলগুলো। বুকের ওপর ডান দিককার আঁচিলটা ডান হাতে ছুঁয়ে দেখলো। দেবকুমার এ ব্যাপারে সিওর যে, পৃথিবীর তাবৎ আঁচিল শরীরের আঠা দিয়ে তৈরি। শরীরে একটা গুপ্ত আঠা আছে সবার। তাই দিয়ে আঁচিল তৈরি হয়। কেন না, ডান বুকের এই আঁচিলটা শিরিস আঠার মতই তার বুকে জমে উঠেছে। কিছুদিন অন্তর দেবকুমার নখের চিমটি দিয়ে আঁচিলের চূড়োটা কেটে ফেলে। তখন আঁচিলের ডগাটা হাতের তেলোয় ফেলে দেখছে দেবু। লাইটের নীচে। একদম শিরিস আঠার শুকনো দানা। শরীরেও রস ঝরে। সাদা আঁচিলের চেহারা নিয়ে তা ফুটে বেরোয়।

স্তব্ধ পৃথিবীর ভেতর আরও স্তব্ধ এ শরীর
স্মৃতি, সংস্কৃত, সংস্কারে মাজা মন কোন্ পাতালে
শেকড় নামায়, নামাতে থাকে
আর্টিজীয় কূপে জল আরও গভীরে গড়ায়
অন্ধকার মৃত্তিকার যমজ জীবন বিকারের বালি নিয়ে অনেক
অন্ধকারে অর্থহীন রুচির স্লেট হয়ে থাকে।

দেবকুমার বসু তার বাঁধানো কবিতার খাতায় একদম কাটাকুটি না করে এ কথা ক'টি লিখে ফেললো। লিখে বুঝলো সে যে জায়গায় পৌঁছতে চাইছে—সে জায়গায় সে যেতে পারছে না। এই শরীর আরও কোন প্রবীণ শরীরের উত্তরাধিকারী। জন্মজন্মান্তরে কোন অতি প্রবীণ প্রবৃদ্ধ বাবা থেকে তার এই শরীরের শুরু। কোন অতি বৃদ্ধ বানর পিতা নানা জীবনের ভেতর দিয়ে তাকে এই শরীর দিয়েছেন। সে শরীরের রক্তে পৃথিবীর সমবয়সী ঘ্রাণ। অস্থিতে মাটির জন্মের সময়কার দাগ। তাই পৃথিবীর বুকের ভেতরকার মাটির নীরব ভাবটা শরীরের ভেতরেও স্তব্ধ হয়ে আছে। সেখানে বোধির স্তর কখনো কখনো আরও অতি প্রাচীন কোন স্তরে নেমে যায়। ওপরে জেগে থাকে বাতিল কোন স্মৃতি বা রুচি ঊষার অন্ধকারে—একা একা।

বাবা যে কেন আমাকে কমার্স পড়িয়েছিলেন। আশ্চর্য! পাণ্ডিয়ার লেখা কমার্সিয়াল ল সাপ্লায়ারদের সঙ্গে আমার কোম্পানির চুক্তির সইসাবুদে কাজের হয় ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ভেতরকার কোন কাজেই লাগে না। আমার তো শেফালীর সঙ্গেই শোয়ার কথা। অথচ—

এরপর দেবকুমার বসু শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। মাথার নীচের বালিশগুলো অসমান। নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখছিল—শরীরের অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায় আঁচিল গজাচ্ছে। তাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলারও কোন উপায় নেই। এরকমই একটা নরম

তুলতুলে আঁচিলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে দেবকুমার বসু ঘুমিয়ে পড়ে। তার মাথার ওপর ছাদ। ছাদের ওপর একতলায় বাড়িওয়ালার ছোট ভাইয়ের ফ্যামিলি। ছোট ভাইয়ের মাথার ওপর ছাদের ওদিকে ছোট ভাইয়ের বড় ভাই ও বাড়িওয়ালার ফ্যামিলি। তাদের বাসায় লোডশেডিং হয় না। এ. সি., ডি. সি. দুই-ই আছে। এই দোতলার ছাদের ওপিঠেই ভাদ্রের মাঝামাঝি একটা স্টেনলেস আকাশ। তাতে গুটিকয় তারা। বাতাস নেই। মশা। গরম।

এক ভদ্রলোক এসে দেবকুমারকে ডাকলো। উঠে এসো দেবু।

দেবকুমার তাকিয়ে দেখে অবাক! পায়ে পাম্প। কমাণ্ডার গোঁফ। সাদা ফুলশার্টের নীচে কচি ধুতির কোঁচা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। হাতে রাজা ফাউন্টেন পেন। মাথার সিঁথি থেকে বাঁয়ে কপালে জুতোর ব্রাস টাইপে এক পোচড়া চুল ঝুলে পড়েছে। এরকমই একটা ছবি কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক এরকম একজন লোক। খুব চেনা।

আপনি?

উঠে এসো বলছি। বেশি সময় নেই।

আপনাকে তো—

চেনার কথা নয় দেবু। আমি সুকুমার। চলে এসো।

কোন্ সুকুমার?

এই মরেচে। এখন হিসেব দিতে বসবো নাকি! চলে এসো। আমি তোমার সুকুমার দে সরকার—

বলতে বলতে সুকুমার দে সরকার দৌড়াচ্ছিলেন। ধুতির কাছার বাইরে ছুটন্ত বাঁ পায়ের কাফ মাসেল বেরিয়ে। দেব সাহিত্য কুটীরের বইতে এরকম চেহারার লোক এঁকে তার চোখে প্যাসনের চশমা দেওয়া হয়। পুজো বার্ষিকীতে এই চেহারার লোকের ছবিতে চশমার সুতো ফুলশার্টের বোতামে লটকানো থাকে।

এতকাল পরে এই প্রথম সুকুমার দে সরকারকে দেখতে পেয়ে দেবকুমার বসুর শরীরের ভেতর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। একই সঙ্গে কান্না আর হাসি এসে ভালো বাংলায় দেবকুমারের ওষ্ঠ স্ফুরিত করে দিল। চোখে বুঝি জলও এলো। আপনি সুকুমার দে সরকার—?

এই দ্যাখো। দাঁড়িয়ে আছে। চলে এসো।

দেবকুমার পেছন পেছন ছুটে গেল। দিনের আলোটা দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর পাতার রংয়ের। একদম ঘিয়ে সাদা। রবীন্দ্রসদনের সামনে কাশফুল পাতাল রেলের গর্তে বেগবতী নদী। ওপড়ানো মাটির পাহাড়ে সেই হরিণটা স্থির চোখে দাঁড়িয়ে। সুকুমার দে সরকার তারই দিকে ছুটে গেলো।

টাটা সেণ্টারের সামনেটা রাতারাতি ঘন জঙ্গলে ছেয়ে গেল। গাছের পাতার ছায়া আর আলোয় একদম গল্পের বইয়ে আঁকা রোদজাফরি। দূরে একটা বনপথ—শুকনো পাতায় ঢাকা—দু'একটা লতানে সবুজ—তারপরই খোসা ওঠা দেওয়ালের এক পুরনো বাড়ি—কেনিলওয়ার্থ হোটেলটার দিকে।

ছুটন্ত সুকুমার দে সরকারকে এগিয়ে আসতে দেখেও হরিণটা একটুও নড়লো না। এই সেই আত্মঘাতী হরিণ। ওপড়ানো াটির ঢিবিতে কিছু পাঁশুটে লতাপাতা। ডাল-পালা ছড়ানো রিণের দুই শিং। গাঢ় কালো চোখের বর্ডারে হরিণটার গায়ের নে-হলুদ লোমের বর্ডার। ব্যাক-গ্রাউণ্ডে একটি বিটপি। পরে বে আর কি! এখন একদম চারা।

আচমকাই হরিণটা ঝাঁপ দিলো। সুকুমার দে সরকারকে ঘেঁষে। ীচের নদীতে। আসলে নদী নয়। পুজো বার্ষিকীর পাতার য়ে সাদা রংয়ের বাতাস। পাতাল রেলের লোহার কড়িবর্গা কে জল মেঝেতে পড়েছিল। আসলে তো সব জলই গোড়ায় াস। মাঝে কুয়াশা হয়। শেষে নদী। হরিণটা ঝাঁপ দিতেই

সব পরিষ্কার হয়ে গেল দেবুর। হরিণটা তখন শব্দ করে পাতালে পড়ছিল। পাতাল রেলের পাতালে। লোহার বিম, জয়েস্টে হরিণ শিংয়ের ডালপালা :পড়ছিল আর কড়মড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছিল। সুকুমার দে সরকারের হাত থেকে রাজা ফাউন্টেন-পেনটাও পড়ে গেল।

তারপরই হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়—টেনে তুবড়ে বাঁকা কিংবা ছোট করা যায়—এমন সব সশব্দ গৎ অদৃশ্য কোন পিয়ানো থেকে উছলে গড়িয়ে যেতে লাগলো। চরাচরে আলোর রং গাঢ় হয়ে উঠছিল। একমেব বনপথে খড়খড়ে শুকনো পাতাগুলো সোনালী হয়ে উঠছিল।

দেবকুমার বসুর ঘুম ভেঙে গেল। তখনো তার চোখে পুজো বার্ষিকীর পাতার ঘিয়ে সাদা রং। অথচ পৃথিবীতে তখন ফুটে উঠেছে ভাদ্রের মাঝামাঝি সকালবেলার পোড়া রোদ।

তুমি বলে ভোরে ওঠো বাবা?

চোখ মেলে বসুজ ইটিং লজের তিন নম্বর বোর্ডারকে এক নম্বর বোর্ডার দেখতে পেল। রাজু দেবুর দিকে পেছন ফিরে ঘরের তাকে কি খুঁজছে। আমার একটা এক্স্ট্রা কোট ছিল যে বাবা—

শুয়ে শুয়েই দেবু বললো, খুঁজে দ্যাখো। আমি তো খেলি না।

তুমি হাত দাও নি তো?

পাকা পাকা কথা শিখেছো। সকালবেলা গিয়ে পড়তে বোসো।

ইস্। পুজোর আগেই আমাদের ইস্টার্ন জোন সেমিফাইন্যাল।

উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার বসু।

এবার কোথায় খেলা বসবে রাজু?

লখনউয়ের সেকরেটারিয়েট ক্লাবে। তুমি যাবে বাবা? বলে রাজু ঘুরে তাকালো। আর অমনি চমকে ছুটে এলো কাছে।

তুমি কত বুড়ো হয়ে গ্যাছো বাবা—একি ? গোঁফের অর্ধেকই তো পেকে গেছে। সিঁথিটাও—

তুমি তো খেলা নিয়ে মত্ত। আর কিছুদিন পরেই তো আমি মরে যাবো রাজু।

সকালবেলা খারাপ কথা বোলো না বাবা।

দেবকুমারের মনের ভেতরে তখনো লোহার জয়েস্টে ঘষটানো ডালপালা সমেত হরিণের শিংয়ের কড়মড়াৎ আস্ত শরীরটা সুদ্ধু পাতালে চলে যাচ্ছিল। কারও বাবা চিরকাল থাকে না বাবা। তুমি একটু পড়াশুনোয় মন দাও রাজু।

ওসব বিচ্ছিরি কথা রাখো তো। কালও তো তোমার গোঁফ এতটা পাকা ছিল না বাবা—

কাল তো তুমি আমায় দ্যাখো নি রাজু। শুয়ে শুয়েই এক নম্বর বোর্ডার কথা বলে যাচ্ছিল। একটু আগেই তো হরিণটা আত্মঘাতী হোল। কালো চোখের কানাতে চুনে হলুদ রঙের ভেলভেট বর্ডার।

তাহলে পরশু দেখেছি বাবা।

উঁহু।

তাহলে তার আগের দিন নিশ্চয় দেখেছি। তুমি তো ভীষণ বুড়ো হয়ে গ্যাছো বাবা।

তা তো হবোই রাজু। তুমি দাবা ছেড়ে দিয়ে এই বেলা পড়তে বোসো। রুণুর বিয়ে দিয়ে আমার হাতে আর টাকা নেই। ভেবো না ব্যাঙ্কে অনেক জমানো পয়সা আছে। তাই তো পড়তে বলছি তোমাকে—

থামো। খালি বাজে কথা। দাবা খেলে আমি ওয়াল্ড চ্যাম্পিয়ন হবো একদিন। তখন দেখো কত মিলিয়ন ডলার তোমার জন্যে নিয়ে আসি।

মিলিয়ন মানে জানিস রাজু ?

না। তুমি আজই এত বুড়ো হয়ে গেলে কি করে বাবা ?

জানিস না বলেই তো তোকে পড়তে বলছি রাজু।

না বাবা। তুমি এই মাত্তর বুড়ো হয়ে গ্যাছো। আমি সিওর বাবা। কালও তুমি এমন ছিলে না বাবা। বাবা—

চমকে রাজুর মুখে তাকিয়ে উঠে বসলো দেবকুমার। অনেকদিন পরে বসুঞ্জ ইটিং লজের এক নম্বর বোর্ডার তিন নম্বর বোর্ডারের মুখোমুখি হোল। কোনদিন ওদের বড় একটা চোখে চোখে তাকানো হয় না। যদিও এক নম্বর জানে—ভায়া সে—এই পৃথিবীর গভীরে স্তব্ধতা—নির্জনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া—রক্তের গন্ধ—আসলে অতি প্রাচীন বানর পিতার সব কিছুই তিন নম্বরে প্রবাহিত। এইমাত্র তারই সামনে তারই ছেলের বুকের ভেতর 'বাবা' কথাটা এত জোরে রিবাউণ্ড করলো যে, মনে হবে, রাজুর বুকটা বুঝি ঢেউ টিন দিয়ে বানানো। তাতে শব্দের ধাক্কা লাগলে খনখন করে ওঠে।

রাজুর চোখ বড় হয়ে উঠলো। হাফপ্যান্টের বাইরে হাঁটুর মালাই চাকি দুটো কালো। চোখ টলটলে। বুক খানখান হয়ে যাওয়া গলায় রাজু চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি নিশ্চয় কাল রাতে—

ধমকে ছেলেকে থামালো দেবকুমার। যাও। পড়তে বোসো গে—যাও বলছি।

রাজু দেবকুমারের দিকে চোখ রেখে বসুঞ্জ ইটিং লজের দু'নম্বর ঘরে চলে গেল। ওখানে তার বিছানার ওপরেই দাবার কোট সাজানো থাকে। দেবকুমার বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নাঃ! কোথায় বুড়ো হয়েছি ? সারাদিন পড়ে পড়ে দাবা খেলবে। বাপের দিকে তো তাকায় নি অনেকদিন। হয়তো ওর ছোটবেলায় আমায় লাস্ট দেখেছে। যদিও আমরা একই বাড়িতে আছি। ছোটবেলার পর থেকেই রাজুর চোখ তো দাবার কোটে।

মা। মা। দেখবে এসো। রাজুর গলা এ ঘরে ছিটকে এসে পড়ছিল।

শেফালী তৃপ্তিকে দিয়ে খয়রা মাছ কোটাচ্ছিল। ডিরেকশন দিয়ে। তৃপ্তি কলতলার চাতালে। শেফালী বারান্দায়—উঁচুতে। সেখান থেকেই শেফালী চেঁচিয়ে বললো, এখন আমার সময় নেই। তুমি তিন দান খেলে নাও বাবা।

তুমি দেখবে এসো। কাল রাতে বাবা একদম বুড়ো হয়ে গেছে।

তৃপ্তিকে ডিরেকশন দিতে দিতেই শেফালী হাসির নামে খাঁটি বিষ তার কথায় ঢেলে দিয়ে বললো, এ আর নতুন কথা কি! তোমার বাবা তো গোড়া থেকেই বুড়ো। আমার অনেক কাজ এখন। যাও, তুমি খেলে নাও গে। এর পর:স্কুলের সময় হয়ে যাবে।

মায়ে পোয়ের কথা শুনছিল—আর চিড়বিড় করে জ্বলে যাচ্ছিল দেবকুমার। আমি গোড়া থেকেই বুড়ো। মনে রেখো শেফালী—ছাদনাতলায় তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সময় মেয়েরা আমায় দেখতে ভেঙে পড়েছিল। তখন আমার বাইসেপ ছিল একুশ। টাইট। আমি গোড়া থেকেই বুড়ো মানে কি আমার এই শরীর মনের কোন গোড়া আছে—যেখানটাকে আর কি শেকড় বলা যায়। আসলে আমি কি মেটে আলু? তাই-ই যদি হয়—আমার কোন্ জায়গাটা দিয়ে বুড়োমির শুরু? কিংবা শেকড়ের?

এসব ভাবনার কোন কুলকিনারা করতে না পেরে দেবকুমার বসু আবার অয়ারড্রোবের আয়নায় গিয়ে দাঁড়ালো। আয়নায় শরীরের গোড়া দেখা যায় না। মনের গোড়া তো:দূরের কথা। দেবকুমার তার সাতচল্লিশ বছরের বডিতে কোথাও তেমন কোন বুড়োমি দেখতে পেল না। কালও যে বডি নিয়ে সকাল শুরু করেছিল—আজও সেই বডি এখন আয়নায়। মোটা গোঁফের

সবটাই প্রায় কালো। তাতে শুধু কয়েকটা সাদা তার। দেবকুমার সাধারণতঃ তার গোঁফ ছাঁটে না। এই সাদা কালো নাকি তার মুখমণ্ডলকে গ্র্যানজার দেয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে অফিসের ভাত দিতে এসে শেফালীর হাত থেকে গরম ডালসুদ্ধ বাটিটা পড়ে গেল। মাথা নীচু করে ভাত ভাঙতে ভাঙতে মাথা তুললো দেবকুমার। কি হয়েছে বল তো তোমার?

একথা বলেও দেবকুমার দেখলো, শেফালী স্থির হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

এতকাল ভাত দিচ্ছো। তবু ডালের বাটি হাত ফসকে পড়ে যায়!

এবারও শেফালী কোন কথা বললো না।

তাকিয়ে আছো কেন? আরেক বাটি নিয়ে এসো। খেয়ে অফিস যাবো না?

বলতেই শেফালী ছুটে গিয়ে আরেক বাটি ডাল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মুখে কথা নেই কোন। চোখ দেবকুমারের মুখের ওপর। একদম স্থির। বাইরের পোড়া রোদের তাত ঘরে চলে আসছিল। তোমার কি হয়েছে শেফালী?

চোখ স্থির রেখেই শেফালী বললো, আমার নয়। হয়েছে তো তোমার?

কি? কি বলছো তুমি?

ঠিকই বলছি। শুধু শুধু রাজুকে বকলে তখন।

ভাত ফেলে উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার বসু। সে তখন নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। যদিও সামনে কোন আয়না নেই। শুধু তার ধর্মপত্নীর স্থির মুখখানা তার দিকে ফিক্স করে তোলা। হাত ধুয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেবকুমার বসু পরিষ্কার দেখলো, শেফালীর দুই ভ্রূর মাঝখান থেকে একটা নীল শিরা দপদপ করতে করতে সিঁথিতে

মিশে গেছে। এমন ছবি ক্লান্ত লোকের কপালেই থাকে। চোখের কোন পলক পড়ার নাম নেই। যাকে বলে একদম নির্নিমেষে শেফালী তাকিয়ে আছে। শেফালীর মুখেই দেবকুমার নিজেকে দেখতে পেল। তার নিজের চোখ ছোট হয়ে এলো। এখানে কোন আড়াল নেই। সে একদম খোলাখুলি শেফালীর চোখের সামনে। কি বলতে চাও তুমি ?

ও ঘরে গিয়ে বড় আয়নায় দেখে এসো নিজেকে—

বড় আয়নার দরকার হয় না সব সময়। আমি দেখেছি।

দেখেছো। তাহলে ?

তাহলে আবার কি ?

তুমি এক রাতে বুড়ীয়ে গেলে কি করে ? বলতে বলতে কেঁদে ফেললো শেফালী। তারপর গুনগুন করে কাঁদতে কাঁদতে যা বললো, তার মানে দাঁড়ায়—তাহলে কি অফিসের ক্যাশ ভেঙেছো ?

বাজে বোকো না। আমি ক্যাশিয়ার নই শেফালী।

কাঁদতে কাঁদতেই শেফালী বললো, শুনেছি অফিসের ক্যাশ ভাঙলে ধরা পড়ার ভয়ে—লজ্জায়—কিংবা ব্যাঙ্ক ফেল মেরে নিঃস্ব হয়ে গেলে রাতারাতি চুল পেকে যায়—বুড়ো হয়ে যায় লোকে—

আঃ! চুপ করো। ন্যাকামির একটা শেষ আছে। আমি ডিজঅনেস্ট নই। এখন আর ব্যাঙ্ক ফেল মারে না। সব সিডিউল ব্যাঙ্ক এখন। তুমি ভালো করেই জানো—ব্যাঙ্কে রাখার মত টাকাই নেই আমাদের।

তাহলে ?

তাহলে কি শেফালী ?

কাল ? কাল রাতে কখন তুমি বুড়ো হয়ে গেলে ? আমরা তখন তো ওগো পাশের ঘরেই শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। কিছু টের পাই নি তো ! একটা চুলও আর কাঁচা নেই মাথায়—

একদম বাজে কথা শেফালী। সিঁথিতে কয়েকটা পাকা চুল তো ছিলোই আমার।

ভাল করে আয়নায় ছ্যাখো। সারা সিঁথিটাই সাদা। কাল সন্ধেরাতেও তো এমন ছিল না। কিছু কি মেখেছো মাথায়?

তুমি পাগল হয়ে গ্যাছো শেফালী।

আমি নয়—তুমি পাগল হয়ে গ্যাছো বলে কিছু দেখতে পাচ্ছো না। কাল রাতে ক'টার সময় তোমার এমন হোল গো? বলতে বলতে শেফালীর গলা আবার বুজে যাচ্ছিল। কিন্তু দেবকুমারের ধমকে সে কান্না গিলে ফেললো।

খানিক পিছিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে যাবার দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো দেবকুমার। ঘড়ি দেখে কেউ বুড়ো হয় না। রাতারাতিও কেউ বুড়ো হয় না শেফালী। ঠিক ঠিক বুড়ো হতে আমার আরও অন্ততঃ দশ বছর দেরি আছে।

কিন্তু তুমি হয়েছো। চোখের নীচেটা ফুলোফুলো। আয়নায় ছ্যাখো। কেমন ঝুলে পড়েছে—

দেবকুমার বুঝলো আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাগে রাগে গায়ে জামা চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বসুজ ইটিং লজের টানা বারান্দার গায়ে পরপর তিনখানা ঘর। তিন নম্বর বোর্ডার তার বিছানায় বসে খুব মন দিয়ে দাবার চাল দিচ্ছে। একই হাতে দু'জনের দান দিচ্ছিল রাজু। চোখ দাবার ছকে। চোখের কালো মণি টলটলে। দেবকুমার পরিষ্কার দেখতে পেল —চোখের কানাতে চুনে হলুদ রংয়ের ভেলভেট লোমের বর্ডার। দেখতে পেয়েই তার বুকের ভেতরটা খচ করে উঠলো। অমনি সে প্রায় বেড়ালের পায়ে সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলো।

পাতাল রেল হবে বলে এদিককার সদর রাস্তায় এখন দক্ষযজ্ঞ। তাই দেবকুমারদের বাড়ির সামনের রাস্তায় অফিস টাইমের মিনিবাস। এস সেভেন। মড়া চলে যাওয়ার পর খই।

দেবকুমার দেখলো, সে অফিসে যাবার মত তৈরি হয়ে বেরোয় নি। পায়ে স্যাণ্ডেল। মানিব্যাগ আনে নি। আমার সঙ্গে একঘেয়ে থাকতে থাকতে রাজু—রাজুর মা—দু'জনেরই চোখে দোষ—নয়তো মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। একরাতে তো আর একটা লোক বুড়ীয়ে যায় না।

যায় হয়তো! স্বপ্নভঙ্গ হলে। কিংবা বড় আশায় ছুলে বড় লোকসানের সামনে পড়ে গেলে। সর্বস্বান্ত হয়ে। কিন্তু আমার তো সেসব হয় নি। আর আমিই বা বুড়ো হতে যাবো কেন রাতারাতি। দিব্যি হাঁটতে পারছি। দিব্যি খেতে পারি। আসলে রাজু বা শেফালীকে তো কোনদিন সেভাবে মাথা দিয়ে—শরীর দিয়ে নিজের জন্যে আয় করতে হয় নি—পরের জন্য তো দূরের কথা! তাই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটিয়ে আসছে। ঘরে শুয়ে বসে আরাম করতে থাকলে একদিন মাথার যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকমত কাজ করা বন্ধ করে দেয়। নয়তো আমায় বুড়ো দেখে!

একথা ভাবতে ভাবতেই দেবকুমার একটা বাসে উঠে বসলো। অফিস টাইমের বাস। সেই সঙ্গে গরম। মানুষজন ঝুলছে। ভেতরটা একদম গাদাই। প্রায় তারই বয়সী ঘাঘু অফিসমুখো একজন দেবুকে বলে বসলো, এমন সময় আপনারা বেরোন কেন?

হ্যাণ্ডেল থেকে হাত সরে যাচ্ছিল। পা রাখতে গিয়ে পাশের লোকের পা মাড়াতে হয়। অন্যদিন দেবকুমার ডিপো ঘুরে ট্রামে অফিস যায়। নয়তো লেকের গা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন ধরে শেয়ালদা যায়। তারপর সেখান থেকে শেয়ার ট্যাক্সি কিংবা পায়ে হেঁটে অফিসে চলে যায়।

বাস থামতেই প্রায় টুপ করে খসে পড়লো দেবকুমার। তার তো আসলে এখন যাবার কোন জায়গা নেই। বাসের লোকটা কাকে ও কথা বললো? এমন সময় আপনারা বেরোন কেন?

আপনারা মানে কারা? আমি টিকিট কেটেই যাতায়াত করি।

খচ্ করে একটা কথা মনে হোল তার। আপনারা মানে কি—যাদের বয়স হয়েছে ? সে-তো সব প্যাসেঞ্জারেরই বয়স হয়েছে। তবে কি ?

দেবকুমার তাড়াতাড়ি হেঁটে এমন একটা পানের দোকান পেল—যেখানে সিগারেট ধরিয়ে আয়নায় মুখ দেখা যায়। নাঃ! যেমন ছিলাম—তেমনই তো আছি। আমাকে তো রিটায়ার্ড—অশক্ত বুড়ো ভাবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আর গুঁড়োরা ফাঁকা সময়ে বাস ট্রাম ধরে থাকে। বাড়ির লোকজন তাই চায়। পাড়ার লোকেও তাই চায়। তাহলে লোকটি ওকথা বললো কেন ? কি মানে থাকতে পারে ও কথার ?

রাস্তায় হাঁটাও আজকাল কঠিন। তাছাড়া হাঁটা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে দেবকুমার। কেননা, বাজার হাট ছাড়া বড় একটা বেরোনো হয় না তার। বিশ বছরের ওপর সে একজন অফিসযাত্রী। সকাল ন'টায় কলতলায়। বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে উল্টোমুখো ট্রাম ধরে সে বাড়ি ফিরে থাকে। ফলে কলকাতার রাস্তায় দেবকুমারের হাঁটা হয় না অনেককাল। পোড়া রোদ এখন কলকাতার নীচে আঁচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

দেবকুমার ভেবে দেখলো, এই কলকাতাই আমার যৌবনের নিকুঞ্জ। তিন চার মাইলের ভেতর তার কলেজ। পিতৃশ্রাদ্ধের সোনাকার্তিকের ঘাট আদি গঙ্গার গায়ে। লাইন দিয়ে সিনেমা দেখার ছবিঘর। ওজন নেবার যন্ত্র। আড্ডা দেবার রেস্তোরাঁ। সবই কাছাকাছি। অথচ এখন কোথাও যাবার জায়গা নেই। এইভাবে যাবার জায়গা ফুরিয়ে যেতে বসেছে। যাদের সঙ্গে সকাল বিকেল আড্ডা দিয়েছি—তারা সবাই আমারই মত ঘোর গেরস্থ। রবিবারটা আলসেমির। শনিতে নমঃ নমঃ। কখন ছুটো বাজবে। সোমবার সাজো সাজো। এই তো অনেকদিন ধরে একই জীবন : তার ভেতর এবার আবার বর্ষা আসে নি। পটল আড়াই টাকায় নামে। আবার ধাঁ ধাঁ করে চার টাকায় ওঠে। এত ভিটামিন

চারদিকে। এত ইনসিওরেন্স। শহরে আরও একটা ফ্লাইওভার হবে। গঙ্গার গায়ে হাওড়া ব্রিজে উঠতে যাত্রার পাকা হোর্ডিং। তবু একটা বর্ষা আনা গেল না এবার। এখনই ভোরবেলা হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়লে ধোঁয়া দেখা যায় না। কিন্তু হিম তো পড়ে গেল। এই করেই কি আমার সব ফুরিয়ে যাচ্ছে? আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না কেন? আমার মোহনবাগান নেই। টেস্ট ম্যাচ নেই। কংগ্রেস-কমুনিস্ট নেই। নেই রেস। কিংবা কন্ট্রাক্ট ব্রিজ। আমি পেপারব্যাক পড়ি না। আলুর দোষ নেই। ব্লাড-প্রেসার নরমাল। সুগার নেই। ডায়েটিং বা জগিং—কোনরকম বাড়াবাড়িই নেই আমার। রোগা বা অলম্বুস মোটা—কোনোটাই আমি নই। দেবকুমার বসু আরও তলিয়ে ভাবার জন্যে একটা বড় বাড়ির ছায়ায় ঢুকে গেল। তখন তার মনে পড়লো, আমার কোন গুরু নেই। আমি কোনদিন কোন দাবি নিয়ে প্রতিবাদ করি নি। আবার হামলে পড়ে কোন কিছু সাপোর্ট করি নি। হাত দেখাই নি কোনদিন। কোষ্ঠী নেই আমার। এই সেদিন জানলাম—আমারও নাকি একটা রাশি আছে। লগ্ন আছে। ভক্তি বলতে বাবা মায়ের ছবিতে শেফালীর কিনে আনা মালা শুকিয়ে গেলে পাল্টে দিতে বলি। এই তো আমি।

অফিস করি। টিফিন খাই। ট্রামের জানালার সিটটা পেলে নিজেকে লাকি ভাবি। একবার সপরিবারে নাগপুরে বেড়াতে গেছি মাত্র। ব্যস্। এরকম হলেই কি জীবন ফুরায়ে যায়? দশ গ্রাম সোনার দাম কত রোজ কাগজ পড়ে জানতে পারি। আর কোন খাঁটি জিনিসের কথা কাগজে ছাপা হয় কি!

দেবকুমারের দাঁড়াবার জায়গাটা ভিড় থেকে কিছু আলাদা। মেইন জনস্রোত একটু দূর দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল। এতসব ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে তার মাথার ভেতর সাতচল্লিশ বছরের জীবন আর জগৎ চলকে গেল। শহর মানে দুনিয়ার মানুষ থাকার একটা

চিহ্ন। আগেকার বাংলায় জনপদ। দেবকুমারের মাথায় সবই একসঙ্গে ভেঙে পড়ার যোগাড়। ছাত্রজীবন, চাকরির বন্ধুরা, দু' একটা রাস্তা, আস্ত দর্জিপাড়া কাত হয়ে তার মাথার ভেতর ভেঙে পড়লো। মগজের ভেতর কালো সুলেখা কালিতে দর্জিপাড়ার আধখানা ডুবে আছে।

একজন রিক্সাওয়ালা ছুটে এসে দেবকুমারকে ধরলো। তাকে একটু আগেই সে পাদানীতে বসে খৈনি ডলতে দেখেছে। লোকটা দেবুকে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরে ফেললো, বুঢ়া পা মে ইতনা ধূপ আচ্ছা নেহি বাবুজী। কাঁহা চলে?

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল দেবু। যাকে বলে মাথা ঘুরে যাওয়া—তাই-ই হয়ে থাকবে। দেবকুমার হনহন করে বাড়ি ফিরে এলো। আমাকে একমাত্র সুকুমার দে সরকারই বাঁচাতে পারেন। অমন কমাণ্ডার গোঁফ। বনজঙ্গলের লতাপাতা, গাছের ছায়া, পাহাড়ী নদী—সবই ওঁর চেনা।

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে দেবকুমারের পরিষ্কার মনে পড়লো, সে তো এরই ভেতর একটা কবিতার কাছাকাছি এসে পড়েছে। কবিতা এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় আসতে থাকে।

আমি কি হারিয়ে যাচ্ছি
যেতেছিলাম অনেকদিনই
ভাসমান শেকড় হয়ে
চূর্ণ ঢেউ পেছল পথে একে একে
নানা জন্মের নানা ডাকঘরে।

আর কোন লাইন আসছে না দেখে দেবু বসুজ ইটিং লজে ঢুকে পড়েই সিধে তার ঘরে চলে গেল। এক্ষুণি কবিতার বাঁধানো খাতায় লাইনগুলো লিখে ফেলা দরকার। নয়তো ভুলে যাবে। অস্থির হরফে লাইনগুলো কাগজে বসিয়ে ফেললো। এখন কি 'যেতেছিলাম' লেখে কেউ আর!

যেতেছিলাম অনেকদিনই
নানা জন্মের নানা ডাকঘরে……
শুধু আসে নি একটি বর্ষা
জীবন ফুরায়ে যায়……

কথা ক'টি দেবকুমারের মাংস ভেদ করে একেবারে হাড়ে শীত এনে দিচ্ছিল। এবার যাই। আর আসব না। কি একটা হারিয়ে যাচ্ছে যেন। এখন সারা পাড়ায় বউদের রাজত্ব শুরু হোল। স্বামীরা অফিসে চলে গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে আশ্বিনের জন্যে আকাশ রেডি হচ্ছিল।

যেতেছিলাম অনেকদিনই
শরীরটাকে খুলে রেখে
যেখানে আমরা অনেকে ভাসি
কেউ কারও নই এমনই এক অনাত্মীয় সুখে
মহাশূন্যের নিঃসীম আহ্লাদে
নানা জন্মের নানা ডাকঘরে
ভাসমান শেকড় হয়ে চবনপ্রাশ বা প্রয়াসে

দরজায় জোড়া ছায়া পড়লো। খট করে খাতা বন্ধ করে ফেললো দেবকুমার। তুই ? তুই কখন এলি শশাঙ্ক ?

স্টেথিসকোপ হাতে শশাঙ্ক হা হা করে হেসে পড়লো। এই শশাঙ্কতিলক তোর সঙ্গে ক্লাস এইট থেকে আছে। কি বলে হয়েছে তোর ? শেফালী ফোন করে ডেকে আনলো। আলোয় এসে দাঁড়াতো—

তার আগে তুই শেফালীকে দ্যাখ শশাঙ্ক। মাথার কোন গণ্ডগোল হয়ে থাকবে।

শেফালী শশাঙ্কর পাশেই ছিল। একথায় চুপ করেই থাকলো। তারপর এগিয়ে এসে শশাঙ্ককে বললো, আপনার ক্লাস-ফ্রেণ্ডকে দেখুন—একরাতে কতটা বুড়ো হয়ে গেছে—বলেই আঁচলে নিজের মুখ চেপে ধরলো।

শশাঙ্ক বলে বসলো, ঘাবড়াবার কিছু নেই। টেক ইজি।

আমি ঘাবড়াবো কিরে! আমি তো নরমাল।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। শুয়ে পড় তো। পেচ্ছাব হচ্ছে?

শুধু শুধু শোবো কোন্ দুঃখে।

বলছি শুয়ে পড়—বলতে বলতে শশাঙ্কতিলক ব্যানার্জী এম. ডি এগিয়ে এল। তারপর চওড়া দু'খানা হাত দিয়ে দেবকুমারকে একরকম জোর করে শুইয়ে দিল। কবিতা লিখছিলি! ওসব লিখিস কেন? স্রেফ গ্ল্যাণ্ডের বিকার। চিৎ হয়ে শো—

বেঁচে থাকা—মরে যাওয়াও একরকমের বিকার।

ও তো বডি সেলের ব্যাপার দেবু। লাগছে?

উঃ! বলে বিছানায় প্রায় ঠেলে উঠলো দেবকুমার। তার কোমরের নীচে থেকে দু'হাতে চাপ দিচ্ছিল শশাঙ্ক। আবার একবার দিলো। লাগছে?

উঃ! খুব লাগছে রে—। সাংখ্যদর্শনে বলেছে—মন হোল অন্নময় কোষ।

চোখ দেখি—

আমি তো নরমাল শশাঙ্ক।

সে আমি বুঝবো। পাকা গোঁফগুলো ছাঁটিস না কেন? হুঁ। চোখের নীচেটা ঝুলে পড়ছে। জল খাবি বেশি করে।

একটা দুটো গোঁফ পাকতে পারে আমার। নয়তো আমার চোখ—বডি—সব নরমাল। কোনরকম পেইন নেই আমার শশাঙ্ক।

পেইন নেই তো কবিতা লিখিস কি করে? শুনিছি পেইন থাকলে পোয়েট্রি আসে।

ভুল শুনেছিস। আমি নরমাল। কবিতা হোল গিয়ে বিষাদের ফসফরাস। কিংবা আহ্লাদ। অন্ধকার হয়ে এসে জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

না দেবু। তুমি নরমাল নও। তোমার পাইলো নেফ্রাইটিস হয়েছে। ইউরিন টেস্ট করাও। ক্যাপসুল চলবে। মাংস বন্ধ। পেলভিসের পাশে নেফ্রা ড্রাম ফুলছে তোমার।

শেফালী দাঁড়িয়েছিল। আরেকটু ভালো করে দেখুন আপনার বন্ধুকে।

দেখেছি।

শুধু নেফ্রাইটিস নয়। আর কিছু হয়েছে।

আমার কিছু হয় নি শেফালী। শশাঙ্ক, তুমি তোমার চেম্বারে যাও। রাজুর দান দেওয়া ছ্যাখোগে শেফালী!

রাজু এখন ইস্কুলে। বলেই শেফালী বারান্দায় চলে এলো।

দেবকুমার তার বন্ধ কবিতার খাতার সামনে স্থির হয়ে বসলো। খোলা জানলার বাইরেই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। বারান্দায় দুই সাইজের দু'খানা ছায়া কাছাকাছি। শেফালী আর শশাঙ্ক ফিসফিস করে কথা বলছিল। বিষয় নিশ্চয় আমি। আমাকে নিয়ে এত কথা বলার কিছু নেই। শলাপরামর্শের ব্যাপারও আমি নই। আমি জানি—এখন আমি ওদের চোখে বুড়ীয়ে গেছি—একদম আচমকা। এটাই এখন আমার চারদিক থেকে দেওয়াল তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। আর এই ষড়যন্ত্রে আশপাশের সবাই জড়িত। বাসের অপরিচিত প্যাসেঞ্জার। ভোলেভালা রিক্সাওয়ালা। সবাই।

আসলে শশাঙ্ককে আমি এখনই ডেকে বলতে পারি—পরিষ্কার বলতে পারি—এ বাড়ির ভেতর আমার সঙ্গেই তো তোর প্রথম পরিচয়। সেই ক্লাস এইটে। থার্ড বেঞ্চে। তুই নদী পার হয়ে এসে তোর বাবার হাত ধরে আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলি। গরমকালে ঘামলে তোর গলার চারপাশে নুন শুকিয়ে থাকতো। আমি আর তুই-ই কলেজে থার্ড ইয়ার অব্দি হাফ-প্যাণ্ট পরে গেছি। ক্লাস এইটে থাকতে তুই আমাকে বিয়ে করেছিলি। তখন মফঃস্বল স্কুলে এমন একই বেঞ্চে দু'জনের খুব ভাব হলে—ভাল-

বাসা হলে—পাশাপাশি বিয়ে হয়ে যেতো। আমিই তোকে প্রথম সুকুমার দে সরকারের গল্প পড়ে শোনাই। নদীর পারে বসে। বিকেলবেলায়।

হরিণটার জন্য তুই কেঁদে ফেলেছিলি। আজ শেষরাতে সুকুমার দে সরকারের সঙ্গে কতকাল পরে দেখা হোল শশাঙ্ক। ওঁর চেহারা আগে কখনো আমি দেখি নি। স্বপ্নেই প্রথম দেখলাম। হাঁটলে পেছন থেকে ধুতির বাইরে পায়ের কাফ মাসেল বেরিয়ে পড়ে। ওঁর লেখা বনে জঙ্গলে বইটা আমি আর তুই মাঠে বসে সন্ধ্যে অব্দি পড়তাম। আরেকটা যে কি বই ছিল—কার লেখা ঠিক মনে নেই—ওঁর কি? চারু ও হারু। এখন দিনে পাঁচশো টাকার কম ভিজিট পেলে তোর মন খারাপ হয়ে যায়! আমি তোকে পরিষ্কার বলতে চাই—তুই একবার শেফালীকে এগ্‌জামিন করে ছাখ্। রাজুকে। নিশ্চয় ওদের চোখে কোন ফিল্টার পড়েছে। নয়তো আমার চুল, গোঁফ সাদা দেখবে কেন? এরপর হয়তো বলবে—আমার এমন মোটা ভ্রূ-জোড়াও সাদা হয়ে গেছে।

এই শশাঙ্ক?

বারান্দা থেকে গলা ভেসে এলো। এখন চেম্বারে লোক বসে থাকবে। রাতে যদি বলিস তো আসতে পারি।

শোন্ না। তোর সুকুমার দে সরকারকে মনে আছে?

কোন্ ক্লাসে পড়তো? এইটে কি?

ধ্যুৎ! তোকে বলে কোন লাভ নেই।

পরে বলিস। রাতে তো আসছিই। ক্যাপসুল লিখে দিয়ে গেলাম। ইউরোবায়োটিক। দিনে চারটে করে সাতদিন খাবি। কেমন?

দেবকুমার বসু কোন জবাবই দিল না। সে বুঝলো, এখুনি তার খাতা খোলা দরকার। একটি লাইন গুনগুন করে আসতে শুরু করেছে। অথচ এসব থামিয়ে রেখে দুনিয়ার লোকের সঙ্গে নাকি

ভাল ব্যবহার করা দরকার। তাহলে সুনাম হয়। কেউ কারও নই এমনই এক অনাত্মীয় সুখে। নানা জন্মের নানা ডাকঘরে। শরীরটাকে খুলে রেখে যেখানে আমরা অনেকে ভাসি। মহাশূণ্যের আহ্লাদে। নির্বিকার আহ্লাদে। যে যার কোট খুলে পরম অনাত্মীয় হয়ে ভাসি। আবার যদি আসি—আবার জলে ভাসি।

॥ তিন ॥

ব্যাকট্রো ক্লিনিকাল ল্যাবরেটারিতে আসবার ইচ্ছা ছিল না দেবুর। সন্ধেরাতে রান্নার লোক তৃপ্তি বললো, যাও তো দাদাবাবু। সারা সংসার কাঁদায়ে লাভ কি? অসুখ করলি ওষুধ খেতি হয়।

এই বোকা বৃদ্ধাকে কিছু বলে লাভ নেই। পরদিন ভোরবেলা খালি পেটে ল্যাবরেটারিতে এসে হাজির। নাম লিখিয়ে টাকা জমা দিয়ে একটা নম্বর পেল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে নম্বর লেখানো কাচের বিকারে তাকে পেচ্ছাব করতে হোল।

তারই সামনে স্যাম্পেল দেখে ল্যাবের লোক লিখলো—গোটা গোটা অক্ষরে—কলার—পেল ইয়েলো। তারপর বললো, কাল সকালে এসে রিপোর্ট নিয়ে যাবেন। বয়স লেখান নি তো। এজ কত?

আজও অফিসে যাবে না ঠিক করেছিল দেবু। সাতচল্লিশ।

কি বলছেন?

হ্যাঁ। যা বয়েস তাই-ই তো বলবো।

ওঃ! বলে লোকটি মনে মনে ভাবলো—চুয়াত্তর না হোক—সাতষট্টি তো হবেই। আগের দিনে তো কেউ বয়স লিখে রাখতো না। নিশ্চয় ভুলে গেছে লোকটা!

হাঁটতে হাঁটতে ভালোই লাগছিল কলকাতার রাস্তায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদেও বড় বড় বাড়ির ছায়া পাওয়া যায়। যদি অসিত বেরিয়ে না থাকে—অফিস যাওয়ার আগেই অসিতকে ধরতে হবে বাড়িতে—এরকম ভাবতেই হাঁটার স্পীড বাড়িয়ে দিল দেবকুমার।

প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে অসিতদের বাড়ি। পুরানো কায়দায়। কিন্তু বড়। আসলে ঋতুর বাবার বাড়ি। একটাই মেয়ে বলে ঋতু বাড়িটা পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। একতলায় ঋতু দত্তর হোম সায়ান্স স্কুল। স্পোকেন ইংলিশও শেখানো হয়। এ প্রাইভেট ইস্কুলের প্রসপেকটাস দেখিয়েছে অসিত তাকে। ঋতু দত্তর নামের আগে লেখা—রেকটর।

বেলাবেলি ক্লাস হয়। বাড়ির ষোল-সতেরোজন গিন্নী স্পোকেন ইংরিজি শেখে। তাছাড়া অনেকে আচার বানানো শেখে। শেখে ঘর সাজানো। ইকাবানা। লেসের কাজ। ফল সংরক্ষণ।

গোলাম মহম্মদ রোডে ঢুকেই অসিতদের বাড়ি চোখে পড়ে। রাস্তায় বেওয়ারিশ গুরু ছাইগাদায় উড়ে আসা পাঁউরুটির ফিনফিনে মোড়ক খাচ্ছিল। উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লম্বা চোখে দেবকুমার দেখলো, ঋতু দত্ত একটা বড় টেবিলের সামনে বসে অল্পবয়সী একটি মেয়েকে দাঁড় করিয়ে ধমকাচ্ছে। বসার ভঙ্গী-টঙ্গী একদম পুরুষদের। চেয়ার পেলেই মেয়েদের মাথা বিগড়ে যায়।

নিশ্চয় অসিত এখন অফিসে। উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঋতুর ধমকানো দেখতে দেবুর এখন বেশ ভালো লাগতে লাগলো। ইস্! যদি ঋতু আমায় এমন দাঁড় করিয়ে ধমকাতো। রীতিমত আনন্দ হোত। তারপর যদি জানতো—আমি তার স্বামী অসিতের কলিগ্—অমনি এই রাগ—ধমকানো—মুছে গিয়ে লজ্জা, সংকোচ একটি গাঢ় কবিতা হয়ে ফিরে আসতে থাকতো। মহিলারা স্বামীর অ্যাবসেন্সে কোন কর্তৃত্ব পেলে দিব্যি দুঁদে হয়ে ওঠে। চোখ পাকায়। ধমকাতে গিয়ে গলা চিরে ফেলে।

পরদিন সকালে চাকরি ছেড়ে দিল তৃপ্তি। ভ্যাপসা গরমে ভোরবেলাটাই এলো এমন করে। যাবার সময় তৃপ্তি বুড়ী

ঝমঝমিয়ে বললো, দাদাবাবু একরাত্তিরে বুড়ো হয়ে গ্যালো। এমন রোগ তো কোন বাড়িতে দেখি নি। কোথ্‌কার গোপ্ত রোগ!

আঁচলচাপা মুখে পাশের ঘর থেকে শেফালী মাথাটা বের করলো। কাজ ছেড়ে দিচ্ছো দাও। বাজে বদনাম করো কেন গেরস্থর?

তৃপ্তির তামাক পাতা পোড়ানোর গন্ধ আমি লাইক করি। ভাত দিয়ে জানতে চায়—ওর রান্না আমার কেমন লাগে। মাঝে মাঝে রাজুর কথার পিঠে কথা ফেলে ছড়া বলে। সে কেন ধরতে পারছে না—গোপ্ত রোগ আমার নয়—গোপ্ত রোগ বাড়ির সবার হয়েছে—আমাকে বাদ দিয়ে। নয়তো আমাকে এত বুড়ো দেখার তো কারণ নেই কোন। তবে বাসে একজন প্যাসেঞ্জার, একজন রিক্সাওয়ালা আর ব্যাকট্রো-ক্লিনিকাল ল্যাবরোটরির একজন লোক আমায় বুড়ো বলেছে বটে।

তৃপ্তি বুড়ী বিদেয় হবার পর দেবকুমার গলা চড়িয়ে বললো, অফিস যাবো কিন্তু। রান্না হয়েছে তো।

শেফালী রান্নাঘরে যাবার আগে ফ্রিজে রাখা কাটা পোনা বের করছিল। ধরা গলায় বললো, সে জানি। আজ ইউরিন রিপোর্ট আনবে না?

সে আমার মনে আছে। বলে দেবকুমারের নজরে পড়লো, বসুজ ইটিং লজ অন্যদিনের চেয়েও শান্ত। রুনুটার বিয়ে হয়ে গিয়ে ইস্তক এ বাড়ি হাসপাতালের চেহারা নিয়েছে। রাত্রিবেলা মনে হবে পি জি-র উডবার্ন ওয়ার্ড। অর্ধেকদিন রাজু ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে। ওর সমবয়সী বন্ধুর বড় অভাব। আসলে রাজু তার যোগ্য বন্ধু পায় না। পাবে কি করে! ও বয়সে ক'জন আর দাবা খেলে? শেফালী সন্ধেরাতে রাজুর নিদ্রাসঙ্গী। মায়ে পোয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাবার করে দেয়। বেশিরভাগ রাতে শেফালী কিছু খায় না। তাতে নাকি সকালবেলা শরীরটা ঝরঝরে লাগে।

তাই প্রায়ই নিশুতি রাতে সারা বাড়ি আলো জ্বালিয়ে—রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে—খাবার টেবিলে তিনজনের খাবার সামনে রেখে দেবকুমার বসু খেতে বসে। বেশি যে খায় তা নয়। তবে মনে হয়—খাবার থালা যেন অপারেশন টেবিলে সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কিংবা বক রাক্ষস যেন তার নিজের বাড়ির নিজের ডাইনিং টেবিলে। ফ্যামিলি যা কিছু পাশের ঘরে মরে পড়ে আছে। খাচ্ছে কিন্তু ওবেলার রান্না। ঢেঁড়স। কি কাটা পোনার ঝোল। টিপিকাল গেরস্থ খাবার। খেতে হচ্ছে—একা—ফাঁকা বাড়িতে।

রাজু যে কেন আজ সকালে দাবার কোর্টের দিকে তাকিয়ে অন্য মনে বসে আছে—তা বুঝতে পারে দেবকুমার। রাজুর রোগটা দেবুর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে। অতটুকু বুকের ভেতর এলোপাথাড়ি করে 'বাবা' ডাকটাকে আছাড় মারছিল। একদম ঢেউতোলা টিনের বুক। শব্দের বাড়িতে থনথন করে বাজে। রাজুর চোখে ছানি জাতীয় কোন ফিলটার পড়েছে। নয়তো আমায় রাতারাতি কেন বুড়ো দেখবে? ওর পরেই অবশ্য শেফালী দেখে।

চান করে সিঁথি কেটে মাথা আঁচড়ালো দেবু। বসুজ ইটিং লজ এমনিতেই শান্ত নির্জন থাকে। তারপর শেফালী আর রাজু তাকে বুড়ো দেখতে শুরু করার পরই বাড়িটা আরও শান্ত হয়ে গেছে। আসলে ওরা যে মনে পাথর বয়ে বেড়াচ্ছে সেই থেকে তা বুঝতে পারে দেবু। এখন ওদের বোঝানো দরকার—এ পাথর আমার কোন অসুখের জন্যে চিন্তায় নয়—আসল এ পাথর তোমাদের অসুখের জন্যেই যে অসুখের খবর এখন পর্যন্ত তোমাদের কেউ বলছে না। মানে তোমাদের চোখে ফিলটার পড়ার খবরটাই তো তোমরা এখনো পাও নি। নইলে রাতারাতি আমায় তোমাদের বুড়ো লাগবে কেন। সাতচল্লিশে বুড়ো হবার মত মানুষ তো আমি নই!

চুপচাপ ভাত খেয়ে জুতো পরছিল দেবকুমার। অনেকদিন পরে ফিতে বাঁধা জুতো। স্ট্যু আর কি! এ পৃথিবীতে শব্দ

করে না হাঁটলে কেউ বিশ্বাসই করবে না—আমি এখনো আছি। আমার এই থাকাটা অনেকের দেখার ওপর। দেখতে পাওয়ার ওপর। আমাকে নিয়ে শব্দ শোনার ওপর। হা হা হাসি। তর্কো। পায়ের বুটের আওয়াজ। তাকানো। এইসব জিনিসের গ. সা. গু-ই হোল ব্যক্তিত্ব। তাতে গলার আওয়াজ—বসার ভঙ্গী—চোখের ভাব—সবই মিশেল দেওয়া থাকে। সেই সঙ্গে মিশে যায় রোদের ভাপ। ঘুম ভেঙে গিয়ে মাঝরাতে শুনতে পাওয়া বৃষ্টি। অঘ্রানের নলেন গন্ধ ছড়ানো উত্তুরে বাতাস। এবার আমাদের দেশশুদ্ধ লোকের পার্সোনালিটিতে বৃষ্টির কোন শব্দ মেশে নি। তার আগেই শহরের কানাতে হিম এসে পড়তে শুরু করে দিল—বরবটি ক্ষেতে দেরিতে বসানো বাঁধাকপির বাঁধুনীতে। এটা একটা ভাববার কথা।

অফিসের পথে ল্যাবরেটারিতে গিয়ে হাজির হোল দেবকুমার। টাইপ করা রিপোর্টের একটা কথা দেখে তার মাথায় আগুন চড়ে গেল। বয়সের জায়গায় লেখা আছে—সেভেনটি ফোর। সে অ্যাংলো রিসেপসনিস্টকে বললো, কি ব্যাপার? আই অ্যাম ফর্টিসেভেন।

অ্যাংলো মেয়েটি ভাল করে দেখে বললো, ভুল হইয়াছে। উই উইল কারেক্ট। কাইণ্ডলি টেক ইওর সিট।

ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো। গায়ে বুক অব্দি ফিতে বাঁধা আপ্রন। দু'চোখ দিয়ে দেবকুমারকে দেখে বললো, কি হয়েছে?

ওই মেমের কাছে কাগজ দিয়েছি। পড়ে দেখুন।

চোখ বুলিয়ে লোকটি আবার তাকালো। এদের ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে—কি হয়েছে?

পড়ে বুঝলেন না কিছু? দেবকুমার নিজেই শুনলো—তার গলার আওয়াজ রীতিমত গমগম করছে।

হ্যাঁ। অকেশনাল—পাশসেল।

কাল্‌চার করেছেন?

দরকার নেই বলেই করা হয় নি। আর কিছু চোখে পড়ছে না আপনার? এজ্‌ লিখেছেন—সেভেন্‌টি ফোর। আমি কি এত বুড়ো?

স্বাস্থ্যটি ভালো। ল্যাবরোটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেসে ফেললো। ওঃ! এই কথা তাই বলুন। সেভেনটি হয়েছে তো। আমি রিটাইপ করিয়ে দিচ্ছি।

দেবকুমার গম্ভীর গলায় বললো, নো। আমি ফট্টিসেভেন।

বলতেই লোকটি অবাক হয়ে তাকালো। তারপর আরও অবাক হয়ে তাকালো—যখন দেখলো—দেবকুমার বসু ভারি পায়ে তারই দিকে তাকিয়ে উঠে আসছে। দেবকুমার সোজা উঠে এসে ইউরিন রিপোর্টটা এক থাবায় কেড়ে নিল। বাইরে তখন পার্ক স্ট্রীটে নানা রঙের মোটরগাড়ি সার দিয়ে খেলছিল। তাদের রঙের সঙ্গে ঝাঁঝালো রোদ্দুর। রাস্তার লোকজনের গায়ে নানা রকমের জামা, ধুতি, প্যাণ্ট, শাড়ি ব্লাউজ। পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ির গায়ে মিনি বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটাতেও উঠতে পারলো না দেবকুমার। অফিসে গিয়ে একটা ক্যাপস্যুল খাবে বলে এই ফাইল পকেটে করে এনেছিল। সেটা পকেট থেকে বের করে পাতাল রেলের গর্তে ফেলে দিল। দুপুর রোদে কাঁচের ফাইলটা ইস্পাতের বিমে ঠোক্কর খেয়ে একটু ঠং করলো শুধু। তখনি দেবকুমার ইস্পাতের এলোপাথাড়ি বিম জয়েস্টে মড়মড়াতের সঙ্গে চুনে হলুদ লোমে ঢাকা আস্ত একটা শরীর নীচের ঠাণ্ডার অন্ধকারে নেমে যেতে দেখলো। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেবকুমার রাস্তা ক্রস করলো। তার জুতোর সুকতলা পিচ টেনে ধরতে চেষ্টা করলো। পারলো না। রাজস্থান এমপোরিয়ামের বারান্দার নীচে চমৎকার ঠাণ্ডা। এইভাবে ছায়া খুঁজে খুঁজে অফিসে গিয়ে হাজির হোল।

লিফ্‌টম্যান নকুড় তো দেবকুমারকে দেখে দরজা আটকাতেই ভুলে গেল। কি হয়েছিল ? নমস্কার করেই জানতে চাইলো।

দেবকুমার একরকম খিঁচিয়েই উঠলো। কি আবার হবে ? নাও নাও—ওপরে ওঠো।

অসময়ের লিফ্‌ট—তাই ফাঁকা। নকুড় এ অফিসের পুরনো ন'জনের একজন। সে কাঁচা বয়সের বাবুদের ঢুকে বুড়ো হয়ে যেতে দেখেছে। তাকে অবাক করে দিয়ে দেবকুমার তেতলায় পা দিল। তাকে ঢুকতে দেখে খোলা কিউবিকলের ভেতর থেকে অসিত এমন করে তাকালো—যার মানে—কোন চেনা লোকের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়—এমন কোন লোকের দিকে ও তাকিয়ে আছে। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলো, একি হয়েছে দেবু ? কি হয়েছে তোর ?

যাতে এগিয়ে এসে আরও বেশি কথা না বলে—সেজন্যে অসিতকে থামাতেই দেবকুমার তার কিউবিকলে ঢুকে পড়লো। কাল আসতে পারি নি

কি হয়েছিল ? মানে কি এমন হোল তোর ?

কিছুই হয় নি। তুই দেখি শেফালীর মত কথাবার্তা বলছিস !

হাল্কা চালে কথাটা বলেও দেখলো, অসিত আদৌ হাল্কা হতে পারছে না। বরং সমান গম্ভীর আর সমান চিন্তিত হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে।

আয়নায় দেখেছিস তোকে ?

দেখবো না কেন। আয়নায় দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াই রোজ।

তাহলে ?

তুইও অসিত ?

যে দেখবে—সে-ই বলবে। কি করে এমন হোলি ? মাথাটা সাদা। গোঁফ সাদা ! নাকের পাশে ভাঁজ পড়েছে। এ দশা তোর হোল কি করে ?

আমাদের বয়সে নাকের পাশে ভাঁজ পড়ে।

পড়ে কিরে! একদম কেটে বসেছে। তাতেই তো তোকে আরও বুড়ো দেখাচ্ছে।

থামবি? বলতে গিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো দেবকুমার। সেই সঙ্গে তার গলার শিরা ফুলে উঠলো। নিজের গলার আওয়াজ তেতলার সিলিংয়ে গিয়ে রিবাউণ্ড করলো। করে বেশ জোরে সারা ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়লো। তুইও শেষে অসিত? এবারে গলা একদম নেমে গেল দেবকুমারের। তুইও শেফালীর মত বলছিস যে—

বলবই তো। আচ্ছা তোকে একটা কথা বলি। ঋতু বলছিল —তোর মত দেখতে—

বলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিল অসিত। মানে— আগেকার তোর মত দেখতে একটা লোক নাকি—

মাঝপথেই অসিতকে থামিয়ে দিল দেবকুমার। তোদের সবার দেখছি একটা রোগ। সবার চোখে কিছু হয়েছে।

রোগ তো তোর দেবু। নয়তো একরাতে এতটা বুড়ো—। যাগ্‌গিয়ে—ঋতু বলছিল, তোর মত দেখতে একটা লোক—মানে আগেকার তুই—তুই নাকি—মানে তোর মত দেখতে—সেই আগেকার—

এবার একদম গুলিয়ে ফেললো অসিত। সেই লোকটা—ঋতু যার কথা বলছিল—সে এখনকার দেবকুমার আর ক'দিন আগের দেবকুমারের ভেতর আগেকার দেবকুমারের মতই দেখতে—সে নাকি—এটসেটরা—এসবের ভেতর থেকে নিজের কথাটা কিছুতেই তুলে আনতে পারছিল না। তাই ঝপ করে বলে দিল—তুই নাকি দেবু আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলি? তুই মানে তোর মত—মানে আগেকার তোর মত—ঋতু বলছিল —দুপুরের দিকে—তোর মাথায় রোদ পড়ছিল বলে ঘর থেকে ঋতুর নাকি—

অসিতের কথাটা ঝপ করে কেটে দিল দেবকুমার। পাগল নাকি! বলেই বললো, যাই—। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বুঝলো, এখন এই তেতলায় তাকে নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে যাবে। হয়তো অলরেডি হয়ে গেছে। তাই বেশ জোরে হেঁটে গিয়ে বাঁয়ের করিডরে পড়লো। তারপর পারচেজে ঢুকতে যাবে—ডিপার্টমেণ্টের শুরুতে কাটা দরজার মুখে তারই চেনা বেয়ারা মুকুন্দ দেবকুমারকে আটকে দিল। কোথায় যাবেন?

তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেবু কড়া গলায় বললো, এক্ষুনি একগ্লাস জল দিয়ে যাও মুকুন্দ।

মুকুন্দ অবাক হয়ে তার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুকে পেছন থেকে দেখতে লাগলো। জল আনতে যেতে যেতেও তার হকচকানো ভাবটা কাটলো না। দেবুবাবুর একি চেহারা?

জলের গ্লাস হাতে ঘরে ঢুকে মুকুন্দের অবস্থা আরও খারাপ হোল। তার হাত থেকে কাঁচের গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল। তার সামনে এ কে বসে আছে? নাকের দু'পাশে মাংস চেপে বয়সের দাগ। মাথার চুলগুলো সাদা। গোঁফ পেকে ভুল-ভুল করছে। ঠোঁট দাগদাগালির চোটে দেবকুমারবাবুকে কত যে বুড়ো করে দিয়েছে—তার ঠিক নেই। কি হয়েছে আপনার বাবু?

ধমকে উঠলো দেবকুমার। কিছু হয় নি। যাও তো—বিল সেকশনের রসিদগুলো আনো। এখনো ডেসপ্যাচে যায় নি।

বেলা বারোটার পর সাপ্লায়ারদের ভিড়। দেবকুমারদের কোম্পানি সারা দেশে নানা জিনিস বানায়। ব্রিজ। বাড়ি। বসায় কল। কারখানা। তৈরি করে শেড্। টেনে আনে ইলেকট্রিক লাইন। এসব জিনিসের সাব্‌কণ্টাক্ট থাকে। তাতে কেউ সাপ্লাই দেয় বিম—কেউ পাঠায় গাড়ি গাড়ি স্টোনচিপ। এসব সাপ্লায়ার ঠিক করার ভার দেবকুমারের। এই ঠিকাদারের দল সারা অফিসে ক্যালেণ্ডার, ডাইরি, টেস্টের টিকিট ছাড়াও আরও

কিছু ছড়িয়ে বকলমে অফিসটাকে কিনে রাখতে চায়। ওরা দেবকুমারকে কিনতে পারে নি বলেই—দেবকুমার ওদের অপছন্দের লোক। অসিত বলেছিল—কোম্পানি যদি ঠকে—তাতেই বা কি! তুই সবার সঙ্গে একটু ভাব-ভালোবাসা করে থাক না।

দেবকুমার বসু এখন একটা ধাঁধায় পড়েছে। তা হোল—আমি না হয় ভাল ব্যবহার করলাম। কিন্তু তাতেও তো সব মুশকিলের আসান হয় না। এদিকে আমি নাকি বুড়ো হয়ে গেছি। কোথায় সাতচল্লিশ—আর কোথায় চুয়াত্তর। কোথাও নিশ্চয় একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে থাকবে। ফিল্টার শেফালীর চোখে পড়েছে? না, আমার চোখে? নয়তো সবাই কেন একরকম দেখবে। এই যেমন মুকুন্দ। ওর হাত থেকে গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল।

মাথার ওপরের আলো পাখা দুই-ই একসঙ্গে বন্ধ হোল। এবার ভ্যাপসা গরম এসে দেবকুমারের গলা টিপে ধরলো। তখনি ব্যাটারি লণ্ঠন হাতে এক মাঝবয়সী সর্দারজী ঘরে ঢুকলো। এ মামুলী সা তোফা আপকে লিয়ে—

অন্য সময় হলে দেবকুমার এই তোফাটি সুদ্ধ ঠিকেদারকে বের করে দিত। কিন্তু এখন লোডশেডিংয়ে অফিস অন্ধকার। ব্যাটারি লণ্ঠনের আলোয় সর্দারজীর চোখের নীচের অন্ধকার একদম সাদা। উঠে গিয়ে যে করিডরে দাঁড়িয়ে কলকাতার তেতালার বারান্দার সামান্য হাওয়াটুকু পাওয়ার চেষ্টা করবে—তারও কোন উপায় নেই। এখন বেরোলে অফিসের লোকজন ভিড় করে তাকে দেখতে আসবে—কিংবা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে তাকে দেখতে থাকবে। সেই সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর। সে নাকি আচমকাই বুড়ো হয়ে গেছে। কী তাজ্জব ব্যাপার!

সে ঠিক করলো, এই সর্দারজী সাপ্লায়ারের সঙ্গে মধুর ব্যবহার

করবে। তাই-ই তো অসিত তাকে করতে বলেছে। তাতে নাকি সুনাম হয়। সেই সুনামের জোরে—কিংবা সাপ্লায়ারদের তোফা বিলোনার সুবাদে সে নিশ্চয় জেনারেলে বদলি হয়ে যেতে পারে। কেন না—কে না উপহারে তুষ্ট হয়।

তাই হেসে বললো, বৈঠিয়ে—।

তাতে সর্দারজী বেশ আটো করে বসলো। তারপর যা বললো, বাংলায় তা অনেকটাই এমন দাঁড়ায়—আপনাদের মত লোক গরমকালটায় কাশ্মীরে থেকে এলে পারেন। সারা বছর মাথার কাজ করতে হয়।

পয়সা কোথায় পাবো? ফ্যামিলি নিয়ে যেতে অনেক লাগে—

সে জন্যে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। ও ভার আমায় দিন। আমি ধন্য বোধ করবো।

দেবকুমার বুঝলো, সে নিজেই ঘুষ নেবার প্রাইমারি কথাবার্তা বলে চলেছে। তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে শোধরানোর জন্যে বললো, কথার কথা বলছিলাম। এ বয়সে কাশ্মীরে গিয়ে শেষে বুকে ঠাণ্ডা লাগাবো।

গরম জামা নিয়ে যাবেন।

বয়সটাও তো আবার দেখতে হবে সর্দারজী।

তা বয়স হয়েছে আপনার।

দেবকুমার বুঝলো, এ ঠিকাদার আগে কখনো তাকে দেখে নি। নয়তো পারচেজের লোককে জেনে শুনেও তো সাপ্লায়াররা বুড়ো বলে না। আর সত্যিই তো এ সর্দারজীকে সে আগে দেখে নি। লোকটা নিজে থেকেই বললো, এ বয়সে আর কোথায় যাবেন? এখন তো মানুষের ঘর-গেরস্থই ভালো লাগে।

কথা হচ্ছিল সবই হিন্দীতে। মাঝে মাঝে ইংরিজি। সর্দারজী হঠাৎ একগ্লাস 'পানী' খেতে চাইলো।

দেবকুমার মুকুন্দ বলে হাঁক দিতেই অচেনা একটি লোক জল

হাতে ঘরে ঢুকলো। ব্যাটারি লণ্ঠনের আলোয় লোকটির মুখে ফিকফিকে হাসি চোখে পড়লো। তুমি কে ?

বদলিতে আছি স্যার—

দেবকুমারের গা জ্বলে গেল। বদলিতে এসে আমায় দেখে ফিকফিক করে হাসা ? মুকুন্দ কোথায় ?

ডেসপ্যাচে পাঠালেন তো। ডাকবো মুকুন্দদাকে ?

না। দরকার নেই। বলেও দেখলো, লোকটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপতে চাইছে। লোকটি গ্লাস নিয়ে চলে যেতে সাপ্লায়ার বললো, পাঞ্জাবের পানী সোনা হ্যায় বাবুজী। খানে সে আনন্দ আতা। বুঢ়াপা দূর রহতা—

বুঢ়াপা কথাটা ঘচাং করে দেবকুমারের ঘাড়ের নরম মাংসে গেঁথে গেল। আচমকাই সে 'আঃ—' বলে উঠলো।

সর্দারজী বলে বসলো, ক্যা হুয়া ?

কুছ নহী।

সর্দারজার মুখটুকুই ব্যাটারি লণ্ঠনে ঝিকমিক করছিল। সে আপনাআপনিই বললো, ইস্ সাল বারিষ তো নেহি আয়া—

সারাটা অফিসে গুমোট। তার ভেতর বাবুদের বসবার জায়গাগুলো এখন একদম ভূতের চেহারা। সাপ্লায়ার বললো, আভি পঞ্জাবমে বহুৎ গরম—

এখানেও কম কিসের সর্দারজী। বলে উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার। এই বেলা অন্ধকারে অফিস থেকে কাটলে কেমন হয়। এই ভেবেই কিউবিকেল থেকে বেরিয়ে পড়লো দেবকুমার। সর্দারজী তখনো তার ব্যাটারি লণ্ঠনের সামনে বসে। খনিমুখে ওয়েলডার তো এমনই বসে থাকে—অ্যাসিটিলিন ফ্লেমের সামনে। শুধু তার মুখখানা দেখা যায় তখন।

তেতলা দিয়ে নেমে ফিরছিল দেবকুমার। দোতলার পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টে আলো যায় নি। অফিসের এ ভাড়া বাড়ির এক

জায়গায় এ সি ! এক জায়গায় ডি সি। এ তলায় তার আসা হয় না বহু বছর। অনেক নতুন ছেলে ঢুকেছে এখানে ক' বছরে। অনেকেই চেনে না তাকে।

দেবকুমার সোজা পার্সোনেলের ফাইল ডিপার্টমেণ্টে গেল। তারাপদ আছে ? তারাপদ দাস ?

এক নতুন ছোকরা বললো, তারাপদদা তো রাঁচি অফিসে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে।

আমার ফাইলটা একটু বের করতো ভাই। পারচেজের দেবকুমার বসু। মানে আমি।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেটের খোপে 'বি' ড্রয়ার-এ হাত গলালো। বাসু ডি কে—বাসু—এই তো। এই ফাইলটাই তো আপনার ?

বলতে বলতে পাতা ওলটাতেই দেবকুমারের ছবি বেরিয়ে পড়লো। দেবু নিজেও ঝুঁকে ছবির দিকে তাকালো।

নতুন ছোকরা ছবির দিকে তাকিয়ে বললো, একদম ফ্রেস ফ্রম দ্যা ইউনিভারসিটি !

দেবকুমার চোখে চোখে সায় দিল। ফাইলটা একটু দেখতে পারি ?

আপনি সিনিয়র লোক একজন—অ্যাট লিস্ট থার্টি ইয়ার্স সারভিস দিয়েছেন এ অফিসে—আপনি দেখলে আর কি হবে ?

দেবকুমার ফাইলটা হাতে নিচ্ছিল। আগেকার বাঁধাই মলাট। বছর আঠারো উনিশ আগের ফাইল। আঠারো উনিশ বছর আগেই সে এখানে ঢুকেছে। ছেলেটা তো বড় বাচাল। ফাইলটা তার হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল। খপ করে ধরবে বলে হাত বাড়িয়েছে—আর অমনি ছেলেটি জানতে চাইলো—ক'বছর হোল এক্সটেনশনে আছেন ?

ফাইলটা হাত ফসকে পড়ে গেল। ছোকরা উবু হয়ে তুলে

দিয়ে দেবকুমারের মুখে তাকালো। তার মানে আমি যে কোশ্চেন করেছি—তার জবাব তো পাই নি। ফাইল দেখাতে গিয়ে আপনাকে যে ফেবারটা করলাম—তার তো একটা জবাব আশা করি। মানে প্রতিদানে—রিটার্নে।

দেবকুমার ফাইলে তার নিজের ছবি দেখতে দেখতে বললো, তুমিই আন্দাজ করো।

ছেলেটি এমন আশা করে নি। তাই সে চুপ করে থাকলো। দেবকুমার তখন তার ছবিতে তন্ময়। উনত্রিশ ত্রিশে কনফার্ম হবার পর এ ছবি তুলে পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টে জমা দিতে হয়েছিল দেবকুমারের। পাশপোর্ট সাইজ। তখনো রুণ্ হয় নি। রুণ্ বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার পর সন্ধ্যে রাতে বাড়িটা এখন হাসপাতালের ওয়ার্ড হয়ে যায়। চুপচাপ। আলো জ্বলছে। দু'একদিন ফিনাইলের গন্ধ পেয়েছে দেবকুমার। একা হয়ে যাবার ভেতর একরকমের হাসপাতাল আছে। বলা যায় খালি ওয়ার্ড। বেডে রুগী নেই। তোষকের সঙ্গে জলের কুঁজোটাও নিয়ে গেছে। অথচ ইস্কুলের সব ক্লাসে আমার বাবার ছেলে থাকতো।

পুরনো ছবি, চাদরের নীচের ন্যাপথালিন
সরস্বতী পুজোর পুষ্পাঞ্জলী সরল জ্যামিতির
পাতার ভাঁজে—জীবনের মানে যদি
রিক্সো সাইকেলের চাকায় মাডগার্ডের
ধুলো সরিয়ে দেখতে হয়—তাহলেই
আমি আছি. আমি আছি, কেন না
ধুলো সরালেই তো এনামেল বেরিয়ে পড়ে
কলাই করা এ শরীরের কর্ম, কাম
ধর্ম, মাখন, জীবন ও যৌবন

নিজের পুরনো ছবিতে চোখ রেখে দেবকুমার আস্ত একটা দগদগে কবিতায় চলে যাচ্ছিল। সে জানে তার কবিতা হয় না।

হবেও না। কিন্তু জীবনের খানিক জায়গা যদি জল হয়ে থাকে তবে সেখানে সে নিজের ছায়া পড়লে দেখতে পায়। জীবনের এই অদৃশ্য জলের নাম কি কবিতা? হবেও বা।

ছবির দেবকুমারের চোখে কোন দাগ নেই। সতেজ কাঁধের ওপর আরও টাটকা একটি মুণ্ডু। তাতে দুই চোখে সকালবেলার রোদ। কোন ময়লা নেই। যাকে বলা যায় আশা—একদম চিকচিক করছে।

কলাই করা এ শরীরের কর্ম ও কাম
ধর্ম ও মাখন এবং জীবন ও যৌবন

ছবির মুখোমুখি শুধু দেবকুমারের চোখই ছিল। তার চোখের ওপিঠে মন ছিল কবিতার জলে। কিংবা জলের কবিতায়। যে জল এবার পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। কারণ বর্ষা আসতে না আসতেই শহরের কানাতে হিম পড়ে গেল। কবিতা হবে কি করে! আমার যে কোন ট্রেনিং নেই।

দিন ফাইলটা। ছেলেটি দেবকুমারের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিল। নিতে নিতে আবার বললো বেশ পরিষ্কার গলায়—পুরনো কথা মনে পড়ছে! কি বিড়বিড় করছেন?

দেবকুমার দেখলো, প্রায় থট রিডার ছোকরাটি তার দিকে পেছন ফিরে ফাইলখানা ক্যাবিনেটে গুঁজে রাখছে। যে কবিতা সে এতক্ষণ মনে মনে কথা পিছলে আওড়ে যাচ্ছিল তারই একটা শেষ লাইন কায়দার কথা তার ঘিলু গুলিয়ে দিতে লাগলো।

লিখে লিখে যাবো একটি গাঁয়ের কথা
একটিই গাঁয়েব কথা এই পৃথিবীর
মানচিত্রের সীমান্ত চিহ্নের পাশে
লিখে লিখে যাবো। অন্ধকার যদি দেয় কিরণ……

আরেকদিন এসে ফাইলটা একটু দেখবো ভাই।

অন্যদিন কি দেখাতে পারবো! আজ কেউ ছিলেন না তাই।

তাহলে উঠি।

আবার আসবেন দেবুবাবু।

পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে সহজ হয়ে এলো দেবকুমার। এখানে জনারণ্যে কেউ বালক দেখে না। অকালবৃদ্ধকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে না। এখানে যে যার মত সেয়ানা। তাই সহজে সবাই এখানে সাবধানে বা অসাবধানে হারায়। ভাদ্রের শেষ। একটি বড় সাইজের মেঘ বৃষ্টির ভান করে আকাশটাকে জাঁক দিয়ে তুলছে। ফলে নীচের পৃথিবীতে চাপ চাপ গরমে মেটাল বডির গাড়ি, ফেরিওয়ালার আইসক্রিম বাক্স, পাতাল রেলের খালে গোঁজা ইস্পাতের খুঁটিগুলো তেতে আছে। শশাঙ্ক ঠিক ডায়গোনোসিস করতে পারে নি। আমার পাইলো নেফ্রাইটিস বলে কিছুই হয় নি। ওরা বলছে বটে—আমি নাকি কি হয়ে গেছি আচমকা—কিন্তু আসলে আমি কিছুই হই নি। আসলে এ শহরে একনাগাড়ে গরম পড়তে থাকায়— বৃষ্টি না হওয়ায়—শেষরাতে হিম এসে দখল নেওয়ায়—ল্যাবরোটারির সেই লোকটি, পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্টের ওই ছোকরাটি আমায় বুড়ো দেখছে। আসলে অতিরিক্ত গরমের দরুন শহরসুদ্ধ লোকের চোখের রেটিনায় কোন গোলমাল বেঁধেছে। কোনরকমের গণ্ডগোল। যা হয়তো আর ক'দিনের ভেতরই খবরের কাগজের খবর হয়ে দাঁড়াবে। আমারও হয়েছে নিশ্চয়। নয়তো আমিই বা—কোন কিছু নেই—প্রায়ই ইদানীং কবিতা পেয়ে যাই কেন? আমার তো পদ্য আসার কথা নয়। অথচ দিব্যি আসছে। লিখেও রাখছি। আবার ভুলেও যাচ্ছি।

কলাই করা এ জীবনের নীচেই লোহা
সেখানে মরা ভাতের পেস্ট
কলতলায় অনন্ত নোলা
শুধু খাই খাই। মাল্টিস্টোরিডে

মাল্টিন্যাশানাল ক্ষুদ্র শিল্প খায়
প্রত্নতত্ত্ব মানেই তো বাঁশবাগানে
একাকী মাকুর একলা চলো

এর কোনটাই কবিতা নয়—আমি জানি। কেননা কোন লাইনই সে-জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না। অন্যদের যেমন চোখে ফিল্টার পড়েছে—আমার কেসটা আরেকটু অ্যাকিউট। তাই কবিতা বেরিয়ে পড়ছে। এ অসুখ হয়তো অনেকদিন ধরেই। সিমটম অনেকদিন ধরেই রয়েছে। লক্ষ্য করা হয়নি। আসলে সুকুমার দে সরকার সবই জানেন। আমি তাঁর কথা আজ তিরিশ বছর ধরে ভেবে আসছি। আমার ভাবনা তিনি যেখানেই থাকুন—তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। শুধু স্বপ্নে সেদিন আমরা মুখোমুখি হই। তাঁরই লেখা থেকে সেদিন হারণটি উঠে এসেছিল। এই যে আমায় কেউ পছন্দ করে না—সেজন্যে কারও কোন দায়িত্ব নেই। ওদেরও নয়। আমরাও না! বেনাচিতির শিশির অনেকদিন আগে বলেছিল, দেবু, একসঙ্গে তুই অ্যাতো লোককে চটিয়ে বসে আছিস। কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে হলে—রেকগনিশন পেতে হলে তোর তো কিছু বাছাই লোকের স্যাংশন চাই। সেই স্যাংশন তুই পাবি কোথায়? আমি সেবারে শিশিরের কথায় আপত্তি করি নি। কারণ ও আমার কাছে কেউ নয়। শিশির হাসির কথা বলতে বলতে স্নেহ-মাখানো গলায় লোকের নামে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে। লক্ষ্য একটাই। চরিত্রহনন।

পাতাল রেলের খালে অন্ধকার নীচে নেমে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সেখানে কলকাতার জন্যে ঘোড়া ছুটবে। সেদিকে দেবকুমার বসু তার সুকুমার দে সরকারের নামে কিরে কাটলো। সুকুমারদা। আমি কথা দিচ্ছি। আমি সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো। কারও বদনাম না করার মানে—পৃথিবীতে সত্যযুগ এসে গেছে। বদনাম না করাটাই এক ধরনের বদনামো। তবু আমি

এঁখন এই বদামোকেই প্রশ্রয় দিতে চাই। আমি চোখ বুজে একটা মিথ্যে কথা বলতে পারি যে—আমার কোন অ্যামবিশন নেই। এটা হোল গিয়ে বেনাচিতির কাঁপা মোড়ের ঠিকেদার—আমাদের পূর্ব-পরিচিত শিশির নাগের বোকা বদমাইসির উল্টো পিঠ। অর্থাৎ ধূর্ত ফিচকেমি। কি? ঠিক কিনা সুকুমারদা?

বাড়ি ফিরেও সেই একই লোড্‌শেডিং। অফিসেরটা ছিল এ সি। বাড়িতে ডি সি। এমন অসময়ে সাধারণত দেবকুমার বাড়ি ফেরে না। সদর খুলতেই বস্তুজ ইটিং লজের টানা বারান্দা। সেখানে একটা বন্ধ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শেফালী বসেছিল। দেওয়ালটা বেঁটে। তাই আকাশ এক খাবলা চোখে পড়বেই। পড়ন্তি বেলাতেও রোদ রীতিমত চড়া। দেবকুমারকে দেখেই শেফালীর চোখ কপালে আটকে গেল। রিপোর্ট নিয়েছিলে?

হুঁ। কিছু নেই। কে বললে নেফ্রাইটিস?

তোমারই বন্ধু শশাঙ্কবাবু। অত বড় ডাক্তার—

কিচ্ছু পাওয়া যায় নি ইউরিনে। আমার কিচ্ছু হয় নি। বলেও দেবকুমার দেখলো, শেফালী চুপচাপ তাকেই দেখছে। সেই তাকানোতে কোন সুখ নেই। চোখ দুটো শেফালীর ক্লান্ত। ঠিক এমন সময় একতলার বারান্দার পাশে জমাদার যাতায়াতের খালি পথে একটা ছায়া পড়লো। ছায়াগুলো দেখে বোঝা যায়—পুরুষ না নারী। মানে বাড়িওয়ালার ভাদ্দরবউ না ভাইপো—কিংবা ছোট ভাই ঝুঁকে পড়ে নীচের কথা শুনতে চেষ্টা করছে কিনা। দেবকুমার এগিয়ে গিয়ে ওপরে কে—তাই দেখতে গেল। আর অমনি ছায়াটা সরে গেল! কি হয়েছে বল তো শেফালী?

আমি আর পারছি না—বলে শেফালী চোখে আঁচল চাপলো। সবাই জানতে চায়—তোমার কি হয়েছে? আমি কি জানি—যে বলবো।

জানবে কি? আমার তো কিছুই হয় নি। কিছু না হলে—বলবেটা কি?

সবাই দেখছে তোমায় এতদিন। এর পরও বলবে না?

কি বলবে শেফালা?

তুমি আর সে তুমি নেই তো। শেফালীর এ ক'টা কথা প্রায় কড়াক্-পিন করে বেরিয়ে এলো ওর বুকের ভেতর থেকে।

হো হো করে হেসে উঠলো দেবকুমার। তোমাদের চোখের ভুল শেফালী। ঘরে এসো। রোদে কষ্ট হচ্ছে না? এই তো পাখা এসে গেছে। হাওয়ায় বসবে এসো।

শেফালী যেন কতকাল পরে তার স্বামীর খাটে বসলো। এই খাটে বসে দেবকুমার বসু সামনের ডাইনিং টেবিলে কনুই চেপে অফিস যাওয়ার আগে ভাতের জন্যে ওয়েট করে। এটাই শোবার ঘর। এটাই খাবার ঘর। একটা ধ্যাড়ধেড়ে ফ্রিজ খানিকক্ষণ অন্তর ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠছিল। রুণুর বিয়ের টোপর অয়ারড্রোবের ছাদের ওপর। জামাকাপড় রাখতে ওই কাঠের বাক্স বাবদ মাসকাবারে বারোটি টাকা ভাড়া দেয় দেবকুমার। শেফালী দেখলো—টোপর জোড়া এবার আদি গঙ্গায় ভাসানো যায়। এক বছর তো হয়ে গেল।

আলমারির কপাটের আয়নায় এখন দেবকুমার। শেফালী দেখলো—এ তুমি আর সে তুমি নেই। দেবকুমারও নিজেকে দেখতে পেল। সে পরিষ্কার বুঝলো, আমি তো সেরকমই আছি। কিছুই তো হয় নি। নিশ্চয় কোথাও সবার একই গণ্ডগোল হচ্ছে। আমাদের অ্যালবামটা কোথায় শেফালী? অনেকদিন দেখি না।

আছে কোথাও। আগে তো খেয়ে নেবে কিছু। দুপুরে তোমার খাওয়াই হয় নি।

দাও না উঠে। ছবিগুলো দেখি নি অনেকদিন।

পুরনো অগোছালো অ্যালবামটা খাটের ওপর দিয়ে দেবকুমারকে

এক জায়গায় থিতু করে ফেললো শেফালী। তারপর বললো, ডবল রিফাইনড্‌ বাদাম তেল আছে। লুচি খাবে?

দাও। বলেই দেবকুমার পুরনো কিছু ছবির জালে জড়িয়ে পডলো। রুণুকে কোলে নিয়ে। রাজু পুরী বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের জল ঘেঁষে বালি ঘাঁটছে। শেফালীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি। বিয়ের আগের। এখানাই বোধহয় বিয়ের কথাবার্তার কাজে লেগেছিল। এই তো আমি। স্প্রাইটলি ইয়ং ম্যান। যাদের সম্পর্কে ক্যারেকটার সার্টিফিকেটে লেখা হয়—হি ইজ অ্যান আনগ্রাজিং ইয়ং ম্যান। ঠিক সেই সময়কার ছবি দেবকুমারের। ওই সময় বর্ষাকালে বর্ষণ হোত—শীতে পড়তো শীত।

চারদিক পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বলে পথভোলা এক পথিক কাক দেবকুমারদের বারান্দায় এসে বসলো। খুব সফিসটিকেটেড্‌। ঘাড় কাত করে সারা বাড়ির আওয়াজ পরীক্ষা করছিল। দেবকুমার যে ওকে দেখতে পাচ্ছিল—কাকটা তা জানতে পারে নি। পাশেই রান্নাঘর। শেফালী সেখানে।

ঠিক এমন সময়—সারা বাড়ির শুনশান অবস্থা একদম ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে রাজুর গলা উঠলো। রাজু প্রাকৃতিক ভূগোল মুখস্থ করছে। দেবকুমার শুনেই বুঝলো, এশিয়ার জলবায়ু। কী তারস্বরে মুখস্থ করছে! পরীক্ষা তো অনেক দেরিতে। আর এই অবেলায় পড়াপড়ি। এটা কোন খেলা নয়তো রাজুর! কখন ইস্কুল থেকে ফিরলো? ফিরে তো চুপচাপ দাবার কোট নিয়ে বসে পড়ে। আজ যে ভূগোল! কি ব্যাপার? ও শেফালী। শেফালী শুনছো?

॥ চার ॥

বাড়ি থেকে টুপ করে বেরিয়ে পড়লো দেবকুমার। এভাবে ছাড়া বেরোবার উপায় নেই তার। সবাই তাকিয়ে থাকে। আশ্বিন চলছে। ক'দিন পরেই পুজো। পাড়ার ছেলেরা পরশু সকালে চাঁদা চাইতে এসে ফিসফিস করে হেসেও হাসি চাপছিল প্রাণপণে। দেবকুমার আজকাল আর রাগে না। রেগে লাভ নেই। এক একসময় সারা দেশসুদ্ধ তো একই অসুখ হয়। রুগীর ওপর কে রাগ করে! পাড়ার চেনা লোকজন পেরিয়ে যেতে পারলে কেউ তার তাকায় না। তখন দেবকুমারও সহজ হয়ে যায়।

চেনা ভিড় চেনা মানুষ একদিন চলে যায়
সঙ্গে যায় হিংসুটে ভাব ভালবাসা
পড়ে থাকে অচেনা মুখ অচেনা সুখ
একদিন চেনা হয়ে যাবে বলে
চিরকাল এই পথে অ্যান্নুয়াল হয়

এরকম কিছু লাইন আওড়াতে আওড়াতে ফুটপাথ ফুরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে দেবকুমার। আজকাল আর পদ্যর লাইন মনে রেখে টুকে রাখার চেষ্টাই করে না সে। কারণ এইভাবেই তো পৃথিবীর সব জিনিস হারিয়ে যায়। এখানকার কোলাহল সময়ের বিরাট সামিয়ানার নীচে চাপা পড়ে যাবেই। কিছু করার নেই। আমি যে আগে কত সামান্য জিনিস নিয়ে মাতামাতি করেছি। এখন ভাবলে হাসি পায়। এই হাসবার ক্ষমতা পেয়েছি—নতুন করে চাদ্দিক দেখতে পাওয়ার সুবাদে। কেননা অন্ধকারেরও কিরণ আছে। অনেক ভেবেচিন্তেই মাইকেল 'যেমতি' কথাটা বসাতেন।

হাঁটতে হাঁটতেই অসিতের বাড়ি গিয়ে হাজির হোল দেবকুমার। শ্বশুরের কাছ থেকে পাওয়া বাড়ি। পুরনো কায়দার বড় বাড়ি। একতলায় ঋতুর স্পোকেন ইংলিশ স্কুলে বেলা দশটাতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। সাত আটখানা গাড়ি দাঁড়ানো। বড় ঘরখানা রাস্তার ওপরই। বড় বড় জানলা খোলা। সম্পন্ন বাড়ির বউরা সবাই ইংরাজীতে কথা বলছে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়। ক্যাঁচরম্যাচর শোনাও যায়। তার ভেতর ঋতুর গলার দাবড়িই খানিকক্ষণ অন্তর বড় হয়ে উঠছে। ইংরাজীতে। কোয়ায়েট ! কোয়ায়েট !!

সদর বন্ধ বলেই ফুটপাথ থেকেই এগিয়ে সেই জানলায় দেবকুমার দাঁড়ালো। পুরোপুরি মেয়েদের স্পোকেন ইংলিশ জানলায় একখানা পুরুষ মুখ দেখে একদম থেমে গেল। ঋতু এগিয়ে এসে কড়া গলায় বললো, কাকে চাই ?

অসিত আছে ঋতু ?

ঋতু দত্ত চমকালো না একটুও। এখন কি থাকে ? অফিসে গেছে। অফিসে গিয়ে দেখা করবেন।

দেবকুমার জানলা থেকে সরে গেল। অফিসে গিয়ে দেখা করবো কি ! এক অফিসেই তো কাজ করি দু'জনে। আমাকে তো ছাড়িয়ে দেয় নি। এইসব কথা বিড়বিড় করতে করতে আবার ফুটপাথে ফিরে এলো দেবকুমার। অমনি ফুলস্পীডে স্পোকেন ইংলিশ শুরু হয়ে গেল। সেই সব ইংরাজী শব্দ জানলা গলে ফুটপাথে পড়েই দেবকুমারের মগজে বিঁধে যেতে লাগলো। আমি জানি—অসিত এখনো অফিসে যায় নি। আসলে ঋতু চায় না—আমি অসিতের সঙ্গে মিশি। বা অসিতই চায় না। কিংবা দু'জনের কেউই চায় না আমি ওদের কাছাকাছি যাই। অথচ আমরা একই অফিসের কলিগ। দু'বছর আগেও আমাদের ফ্যামিলি ওদের ফ্যামিলি একসঙ্গে পলতায় বনভোজনে গেছি। তখনো রুণুর বিয়ে হয় নি। ঋতু আর রুণু মাংসের আলু কাটছিল ঘাসে

পাতা শতরঞ্চিতে বসে। আর এখন ঋতুর চোখে আমার দিকে তাকানোর ভেতর কতখানি ঘেন্না।

দেবকুমারের মনে হোল—সে কি তাহলে পরিচিত সংসারধর্ম থেকে পা হড়কে নীচের ধাপে পড়ে যাচ্ছে?

ছিলাম তো এখানেই
এখন কি চিনিতে কষ্ট হয়
পাতাবাহারের পাতায় টোকা দিলে ধুলো
আলো পেলে সে-ধুলোও
পাতার কারুকাজে কাজ হয়
এখনো তো আছি এখানেই
এখনো তো আমি তোমাদেরই
তবে কেন চাও দূর হয়ে যাই
বালাই সাট! বালাই! বালাই!

এক একটা পদ্য এমন করেই দেবকুমারকে রাস্তা দিয়ে ঠেলে নিয়ে যায়—অনেক রাস্তা সে পদ্যর লাইন চুষতে চুষতে পার করে ফেলে। এই কবিতাটাও তেমনই ছিল। ক'দিনই অফিসে কেউ তার কাছে ঘেঁষছে না। আমি কি রবিঠাকুর হয়ে যাচ্ছি? পাঠানো ফাইলগুলো সই হয়ে ফিরেও আসছে না। ডি. জি. এমের সইসাবুদ না থাকলে তো কোন অর্ডারই পাকাপাকি পাস হয় না। ফাইল আসছে না কেন? আজই অফিসে গিয়ে এর একটা বিহিত করা দরকার। অফিসে ঢুকে সোজা এম. ডি-র ঘরে যাবে। স্লিপ না দিয়েই ঢুকবে দেবকুমার। এতদিনকার কর্মচারী সে। সে তো আর বাইরের লোক নয় যে স্লিপ দেবে। কিংবা ফোনে পি. এ-র সঙ্গে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবে।

ঘরে ঢুকেই বলবে, স্যার, আজ তিন হপ্তা কোন ফাইল কপিটি গিয়ে ফিরে আসছে না। বহরাগোড়ায় যে বাইশ হাজার সি. এফ. টি. স্টোনচিপ যাবার ছিল—তা কিন্তু আটকে গেল স্যার।

মাথা তুলেই এম. ডি.—একি ? এ আপনার কি—

দেবকুমার—স্টোনচিপ যাবার কথা ছিল কিন্তু দশ তারিখের ভেতরে।

স্টোনচিপ পরে হচ্ছে মিস্টার বাসু। আপনি তো আমাদের চেয়ে ছোট। এই তো সেদিন কাজে ঢুকলেন। আমি তখন জেনারেল অ্যাড্‌মিনস্ট্রেশনে। এরই ভেতর—

তা স্যার বিশ বছর হতে চললো।

তাই বলে এমন অবস্থা হবে ! বয়স কত হলো ? পঞ্চাশ তো হয় নি এখনো আপনার ?

তিন বছর বাকী স্যার।

তবে ! আমি তো জানি আপনার বয়স।

দেবকুমার একদম গলে গেল। এম. ডি. এত কাজেও আমার কথা মনে রেখেছেন। আশ্চর্য ! এমন না হলে কি ওপরে ওঠা যায়। শিবতুল্য মানুষ।

দেখে হাঁটবেন তো। বলে পাশের একজন লোক—তারই বয়সী হবে—দেবকুমারকে খিঁচিয়ে উঠলো।

সরি। লেগেছে ? দেখতে পাই নি।

এখন তো একটু দেখেশুনে হাঁটবেন ! বলতে বলতে লোকটি চলে গেল।

দেবকুমার বুঝলো, 'এখন' মানে তার 'এই বয়েস।' 'এই বয়সে' মানে এখন তার যা যাচ্ছে। তৃপ্তি যে জন্যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেছে—দেবকুমারের নাকি গুপ্ত রোগ আছে।

একটা লম্বা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের গা দিয়ে কড়কড়ে রোদ্দুর পিছলে পড়ছিল। সেদিকে তাকানো যায় না। রাস্তার জামা-কাপড়ের দোকানে দুর্গা পূজার স্টক। আমার কি সত্যিই কোন গুপ্ত রোগ হোল তাহলে ? নয়তো ঋতুর ব্যাভার এমন হয়ে যাবে

কেন ? ঋতু সেবারে বনভোজনে শুধু আমার কথায় গান গেয়েছিল। তোমায় চিনি গো চিনি—ওগো বিদেশিনী। তখনো ঋতুদের মাথায় স্পোকেন ইংলিশ ছিল না।

একটা মিনিবাস আট মিনিটে দেবকুমারকে ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসে নিয়ে এলো। দু'ধারে ব্যাঙ্ক বাড়ি। মার্চেন্ট অফিস। পেতলের ওপরে কোম্পানির কালো কালো নাম। সে-সবই দেবকুমারের চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেব সাহিত্য কুটীরের পূজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রঙের পাতার আভাস বাতাসে। আকাশেও। অবিশ্যি যেটুকু আকাশ দু'ধারের বাড়ির সারির ভেতর দিয়ে দেখা যায়। বাড়িগুলো ততক্ষণে তার চোখে আবছা হয়ে আসছিল।

লতাপাতায় ঢেকে আসা উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে প্যাসনের চোখে তাকে হাতছানি দিয়ে যে ডাকলো—সে আসলে সুকুমার দে সরকার। তখনো দেবকুমারের মনে পড়ছিল—ও জায়গাটায় তো ব্যাঙ্ক অব টোকিওর অফিস ছিল। এখন সেখানে দিব্যি বড় বড় গাছ। উঁচু ঢিবিতে হরিণটি সোজা হয়ে দাঁড়ানো। সুকুমার দে সরকারের হাতের রাজা ফাউন্টেন পেন থেকে লাল কালি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। দেবকুমার ছুটে সেদিকে যেতেই একখানা বেগুনী রংয়ের অ্যামবাসাডর খচ্ করে ব্রেক কষলো। বিকট আওয়াজে আবার ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ফিরে এলো। দেবকুমার বড্ড লজ্জায় পড়ে ছুটে তার নিজের অফিসের লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেকেণ্ড ফ্লোরে পা দিতেই অফিসের গুলতানী পরিষ্কার তার কানে ভেসে এলো। পারচেজের জনা বারো চোদ্দর খোলামেলা টেবিল চেয়ার। ফাইল। সেখান থেকে একসঙ্গে অনেক জনের গলা। তার ভেতর সেকশন ক্লার্ক অমিয় সাঁতরার গলা—এও এক রকমের ক্ষয়রোগ বিনয়দা। আপনাআপনি এর কাজ চলে।

দেবকুমারের আর পিছোবার উপায় নেই। সে ওদের চোখের সামনে এসে পড়েছে। তাই গটগট করে হেঁটে নিজের কিউবিকেলে সেঁধিয়ে গেল। কাটা দরজার খোলা কিউবিকেল। চেয়ারে বসতে বসতেও আচমকা চোপসানো গুলতানী থেকে ছিটকে আসা একটা কথা দেবকুমারের কানে এলো। এ হোল সাঙ্ঘাতিক। যাকে বলে হাড়ে ঘুণ ধরা—ভেতর থেকে অনেকদিন ধরে—তারপর একদম আচমকা। বুঝলে……। তারপর আর শোনা গেল না। এই এক ধরনের গুজগুজ অনবরত চলছে—পেছন ফিরলেই কানে আসে ;

দেবকুমারের এ গলা চেনা। অমিয় সাঁতরা। ছেলেটি ব্রাইট। রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ে। বছর দুই আগে দেবকুমারকে যোগ ব্যায়াম করতে বলেছিল। বলেছিল, জানেন বোসবাবু—শরীরটা কন্ট্রোল করে বায়ু। তাকে কন্ট্রোল করলেই শরীর। শরীরের অনেক কিছুই জানে ছোকরা। কলকাতার বাতাস নাকি বিষাক্ত। তাতে নিঃশ্বাস টেনে টেনে আমাদের নাকি এখন শেষ অবস্থা যাচ্ছে। নয়তো এত অসুখ করবে কেন? কত সব অজানা অসুখ বেরোচ্ছে আজকাল। বলেছিল, জানেন বোসবাবু—একদিন লাস্ট ডেজ্ অব পমপাইয়ের মত লাস্ট ডেজ অব ক্যালকাটাও লিখতে হবে। সেদিন আর খুব দূরে নয়।

দেবকুমার তার ফাঁকা ম্যালাকোভে বসেই ভেবে নিতে পারছিল—সাঁতরা গুজগুজ করে এখন কি বলতে পারে—আর আশপাশের টেবিল থেকে বাকীরা কি কি জ্ঞান তাতে যোগ দিতে পারে। আজ কারেন্ট যায় নি, তাই বাঁচোয়া। জ্ঞানযোগের ফুলকিগুলো এখন পরিষ্কার আমার কানে এসে পড়ছে।

পূর্বপুরুষের কোন পাপ থেকেও অনেক সময় এমন হয়। আচমকা পারা ফুটে বেরোনোর মত।

এটা ধরা যাক অমিয় সাঁতরার ডায়লগ। রীতিমত গবেষক গলায়।

আবার এও হতে পারে—কোন গুপ্ত রোগ বোসবাবু এতকাল চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আর পারলেন না এখন।

ব্রাভো অমিয়! তুমি ঠিক তৃপ্তির পরেই।

অথবা ধরো—সারাদিন ডিজেল পোড়া কত ধোঁয়া তো আমরা ইনহেল করি—তার কালি গিয়ে ব্রেন সেলে সেডিমেন্ট ফেলছে। একদিন ব্রেনের সিলিং থেকে—

অমিয় নিজেই নিজের কল্পনাকে ভেঙিয়ে বললো, তার চেয়ে ভাই বল্লো না—ব্রেনের ফার্স্ট ফ্লোর থেকে!

এই তো এসে গেছিস দেখছি। বলতে বলতে ঝড় হয়ে ঘরে ঢুকলো অসিত। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

বোসো। কি কথা?

টেবিলের ওপারে গম্ভীর মুখে অসিত বসে। তুই আমার মানসম্মান ডোবালি।

কি হোল?

আজ ঋতুর ক্লাসঘরের জানলায় হাভাতের মত দাঁড়িয়েছিলি?

দাঁড়িয়েছিলাম? না তো। কে বললো?

ঋতুই বললো।

বলতেই পারে না। আমি তো দাঁড়িয়েই চলে এসেছি। মানে একটা কথা বলেই আবার ফুটপাতে নেমে এসেছি। দাঁড়িয়েছি—কিন্তু সেখানে তো ছিলাম না।

আলবত ছিলি। নয়তো ঋতু বলবে কেন? রাস্তার হাভাতে পাগল হয়ে তুই জানলার শিকে মুখ ঠেকিয়ে মেয়ে দেখছিলি। কেমন কিনা? আচ্ছা—এখনো তোর ও বাই সারলো না।

তোমার বউ একটি আস্ত লায়ার। আমি পাগল নই। হাভাতে নই। জানলায় দাঁড়াই নি। দাঁড়িয়েই সরে এসেছি।

মুখ সামলে কথা বলবি দেব্‌। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেদের সম্পর্কে কিভাবে কথা বলতে হয় শিখিস নি।

ঠিক বলেছি। আমি যখন জানলায়—তখন তুই বাড়িতে। অথচ ঋতু বলে দিল তুই অফিসে! আমাকে বলে কিনা অফিসে গিয়ে দেখা করতে। আমি তোর কলিগ নই?

ভারি আমার অফিস! লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমাদের। কত বড় ঘরের মেয়েরা গাড়ি চালিয়ে ইংরেজী শিখতে আসে জানিস?

মিথ্যে কথা শিখতে আসে। তোর বউ আবার ইংরিজী জানে নাকি? আস্ত লায়ার।

ছোট্ট টেবিলের ত্ব'পিঠে বসে ত্ব'জন হুলো বেড়াল হয়ে গেল। হাত বাড়ালেই এ ওকে ধরতে পারে। তবু ধরলো না। কারণ এটা অফিস। শেষে কেলেঙ্কারির একশেষ না হয়।

ইংরিজী শেখায় তো মাইনে করা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েছেলে। তোর নিজের চেহারাটা ছাখ না আয়নায় গিয়ে। পাকা চুলের বাবরি। চোখের নীচে কেলে হাঁড়ির কালি। গোঁফটা ফকফক করছে সাদা। কামিয়ে ফেললে পারিস দেবু। এমনিতেই তো তোকে কেউ লাইক করে না। তারপর এই স্বভাব—

ত্ব'জনে ত্ব'জনের শরীরের সব গ্ল্যাণ্ড নিংড়ে যত পারে বিষ কথায় মিশিয়ে দিচ্ছিল। তেতো বিষ। অনেকদিন ধরে একই অফিসে কাছাকাছি কাজ করে যে যার গায়ের গন্ধ অব্দি জানে। এই বেশি করে জানায় গা বিড়োনো এক রকমের বিরক্তি থাকে। তাই জমে জমে এতদিন বিষ হয়ে ছিল।

লাইক করবে কি করে আমাকে বল? এই চাকরি করে তো আমি আমাদের বাড়ির মেঝে হোয়াইট সিমেণ্ট দিয়ে ফিরে বানাই নি। ক'টা পয়সা বা মাইনে পাই বল? শ্বশুরও কোন বাড়ি দিয়ে যান নি। টি. ভি.ও কিনতে পারি নি। থাকি তো ভাড়া বাড়িতে।

এ কথায় ছিল মোক্ষম খোঁচা। শ্বশুরের বাড়িখানা হাতে

আসার সঙ্গে সঙ্গে অফিসেও টু পাইস আসে অসিতের। তাই দিয়ে অসিত পুরনো মেঝে খুঁড়ে ফেলে হোয়াইট সিমেণ্ট দিয়ে মোজাইক করেছিল দু'বছর আগে। তখনই একটা টি. ভি. কেনে অসিত। আসলে ওরা তখন স্পোকেন ইংলিশের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। একটা অ্যাপিয়ারেন্স চাই তো।

দাঁতে দাঁত ঘষে অসিত উঠে দাঁড়ালো। যাবার সময় শুধু বললো, আচ্ছা—আমিও অসিত দত্ত।

চাপা হেসে দেবকুমার বললো, সন-ইন-ল অব মুরারী ঘোষ!

খানিক বাদে কারেন্ট চলে গেল। ভেতরে বসে মাছি তাড়াতে হচ্ছিল। আমার ভেতর শরীরটা কুলকুল করে ঘামছিল। তবু উঠলো না দেবকুমার। আজ কোন সাপ্লায়ারই এলো না। দেবকুমারও চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। উঠলেই সেই হাড়ের ভেতরকার ক্ষয়রোগ নিয়ে গবেষকদের মুখোমুখি হতে হবে। পয়লা গবেষক অমিয় সাঁতরা।

স্কাই গ্লাসের আলোয় মাথা তুলে দেখলো, বীমের লোহায় পরিষ্কার লেখা—লিভারপুর ১৮৬৯।

তখন এ পাড়ায় ইলেকট্রিক, ফোন, পাখা, ডুম কিছুই আসে নি। তবু কোন ক্ষয় নাই। যত ক্ষয় আমারই। যত গুপ্ত—আমারই! হবেও বা। সত্যিই তো আমায় কেউ লাইক করে না। সবার প্রিয় কিংবা লোকপ্রিয় একজন দেবকুমার বসু হওয়া যে কী কঠিন! রাস্তাটাই জানি না।

আচ্ছা আমাকে অপছন্দ করার কারণ কি? কারও কোন ক্ষতি করি নি। চুরি করি নি। পাপ করি নি। নিন্দে করি নি। অফিসের আগে নিয়মিত দাড়ি কামাই। রোজকার কাজ রোজ তুলে দিয়ে যাই। আমি আগে মরলে শেফালী যাতে উইডো পেনসনের মত কিছু পায় তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। রাজু খেলতে চাইলে খেলবে—পড়তে চাইলে পড়বে। রুণু তো হ্যাপিলি

ম্যারেড্। আমি তাহলে কোথায় কার পাকা ধানে মই দিলাম—যাতে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে আমাকে লাইক নাও করতে পারে। আমি যে আমার সাতে পাঁচেই থাকি না—তো অন্যের সাত পাঁচের কি খবর রাখবো ?

এই যে একরাতে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম—যদিও আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি মেনে নিই নি—আমি জানি এটা ওদেরই কোন মতিভ্রম—এরকম একটা ব্যাপার তো আমারই জীবনের সাত পাঁচ। কিন্তু কোথায় ? আমি নিজেই বা তাতে কতটুকু আছি ? যদি সত্যি সত্যিই হাড়ে ঘুণ ধরে থাকে—ভেতর থেকে অনেকদিন ধরে—যা কিনা পূর্বপুরুষের কোন পাপ থেকেও অনেক সময় হয়—আচমকা পারা ফুটে বেরোনোর মত—কারণ পারা তো কিছুতেই চাপা দিয়ে রাখা যায় না—একদিন ব্রেনের সিলিং থেকে—

কাটা দরজার ওপাশের সাঁতরা ইত্যাদির পরোয়া না করেই দেবকুমার গটগট করে বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য ! কেউ তো নেই এখানে। লোড্শেডিং। অন্ধকার। ভ্যাপসা গরম। যে যার মত ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে কেটে পড়েছে। আর এদেরই ভয়ে আমি একা একা ঘরে বসে সেদ্ধ হচ্ছিলাম ! ভয়, আসলে আমাকে নিয়ে একটা আলোচনার আবেশ—সেইটেকেই।

রাস্তায় পড়ে বুঝলো, আজ বেরোতে সত্যিই দেরি করে ফেলেছে। এখন কোন বাস, মিনিবাস, শেয়ার ট্যাকসি—কিছুতেই উঠতে পারবে না। অন্ততঃ আড়াই ঘণ্টার আগে এ ভিড় ফুরোবে না। এখন যদি হেঁটে গিয়ে উল্টোদিকের ট্রামে লাফিয়ে ওঠা যায়, তাহলে হয়তো ফিরতি রুটে ভবানীপুরের কাছাকাছি একটা বসার জায়গা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এত অঙ্ক কষতে ভাল লাগলো না দেবকুমারের।

সে আসলে মনে মনে অসিতদের কোথায় যেন ঘেন্না করে।

হোয়াইট সিমেণ্ট, পর্দা, পেলমেট, টি. ভি. দিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা— তারপর স্পোকেন ইংলিশের জাল পেতে অবস্থাপন্নদের নিজের ঘরে টেনে আনা—জিনিসটা একদম হতকুচ্ছিত। এই ঘেন্নাই কি ভেতরে ভেতরে আমার হাড়ে ঘুণ ধরাচ্ছিল? কে জানে? আসলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম—অসিতেরা কিরকম করুণভাবে বড়লোক হয়ে ওঠার চেষ্টায় চেষ্টায় নেমে যাচ্ছিল। এখানে যেমন একটা সত্যি আছে তেমনি একটা দুঃখ আছে। আমরা যা আছি—তা থেকে উঠতে চাই। কিন্তু উঠতে গিয়ে যদি ভেতরে ভেতরে নামা শুরু হয়ে যায়—সে যে কী দুঃখের। অনেকটা অমিয় সাঁতরা আজই দুপুরে যেমন বলছিল—ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরা শুরু হয়ে যায়।

লোকে বিয়ে করে বেড়ায়। গেরস্থ হলে ছেলেমেয়ের জন্যে জিনিসপত্র কেনে। ইনসিওর করে। পঞ্চাশ পার হওয়ার মুখে সদ্য প্রবীণ হতে হতে দীক্ষা নিয়ে ফেলে। আমার কোনোটাই করা হোল না। একথা ভাবতে ভাবতে রাজুর জন্যে মনটা টনটন করে উঠলো। আমি রুণুকে নিয়ে যতটা মেতেছি—রুণুর এটা চাই, ওটা চাই—সব যেমন যুগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি—রাজুর বেলায় তো ততটা করি নি। আমি শেফালীর জন্যেই বা কি করেছি। হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে যায়—ওরা তো ভেসে যাবে।

অফিস পাড়া ছাড়িয়ে দেবকুমার বিকেলের ভেতর দিয়ে এমন সব এরিয়ায় ঢুকে পড়তে লাগলো—যেখানে এখনো কিছু কিছু লোক সংসার পাতার সাহস রাখে। নইলে তেলের পিপে, কেরোসিন, কাঠের পাহাড়, ভাঙা দেওয়াল বেয়ে নর্দমার জলের পড়ন্ত ধারার তোয়াক্কা না করেই বিশাল কলকাতায় একখানা পিঁড়ি পেতে— তাতে বাচ্চা শুইয়ে দিয়ে কচি মা কি করে পা ছড়িয়ে অফিস ভাঙা ভিড় দেখে—নিরুদ্বেগে—অপরিচিত কারও হাঁটার ভঙ্গী দেখে বুঝি বা হেসে ফেলে? লালবাজার ছাড়িয়ে ছাতাওয়ালা গলি, ফার্ণিচার

পাড়া, মুচিপট্টি—সব জায়গাতেই লোকজন এমন করে ঘর-গেরস্থালী করতে চাইছে—তাকালেই চোখে পড়ে।

একদিন মানবী ছিল মানবের আহার
একসঙ্গে থাকা খাওয়া শেষে
মানব নিজেই সেই আদি ঘাতক
খিদের দরকারে
সে মাংস রাঁধিবার নতুন ঘরণী
তখনই প্রস্তুত
আজও কি এ প্রথার পায়ে
পেরেছে ধরাতে কেউ ঘুণ
একদিন মানবী ছিল মানবের আহার
মানব নিজেই সেই আদি ঘাতক।

আমি নিজেও হয়তো একজন আদি ঘাতক। সাহসের অভাব, সভ্যতার দরুণ শেফালী হয়তো বেঁচে গেল। নয়তো ও যে কেন অসিতের বউ ঋতুকে ইদানীং দিদি দিদি করে তা তো আমি জানি। ওদের অবস্থা ফিরে যেতেই শেফালার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ও আপনাআপনিই নিজেকে ঋতুর এক ধাপ নীচে প্লেস করে নিয়েছে। ব্যাপারটা কী মিথ্যে। কী করুণ। কত অশিক্ষিত। অথচ এখানে আমার করার কিছুই নেই।

আমাকে যদি সবাই লাইক করতো—তাহলে নাকি চাকা একদম ঘুরে যেতো। আমি যদি একটু কম মজবুত হতাম—বা কম জেদী আর সহজেই হাওয়ায় ভাসতে রাজী থাকতাম—তাহলে কি আমাদের সংসারেরও হাল ফিরে যেতো না? যেমন কিনা—গোড়ায় গোড়ায় দেখা যেতো—অসিতদের বাড়ির ছাইদানী, ফুলদানী, নুনদানী—এমন কি পিকদানীও লোকে নাকি জোর করে প্রেজেন্ট করে গেছে। তারপরে অবশ্য আরও বড় বড় দরকারী জিনিস উপহার আসতে থাকে। শেষে অসিত কিনা উপহারেই শ্বশুরের বাড়ির মেঝে খুঁড়ে ফেলে হোয়াইট সিমেণ্ট করে ফেললো।

আমি সে তুলনায় কিছুই পারি নি। বসুজ ইটিং লজ ভাড়া বাড়িতেই। উপরন্তু ভেতরে ঘুণ ধরায় ক'দিন হোল আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তাই তো বলছে লোকে। ঘুণটা যদি আগে থেকে ধরা যেতো—তাহলে বাইরে থেকে অ্যারেস্ট করে আমার এ দশা আটকানো যেতো। কিন্তু ঘুণ যে অনেক আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

বউবাজারে পড়ে দেবকুমারের ইচ্ছে হোল—আজ সে মনোমত বাজার করবে। যেসব জিনিস খেতে ভালবাসে তাই কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, তৃপ্তি তো নেই। রান্না করবে কে? শেফালী আজকাল রাঁধতে একদম ভালবাসে না। তিন চার কেজি সাইজের রুইয়ের পেটি দিয়ে হালকা ঝোল—ডালের সঙ্গে গন্ধ লেবু। ব্যস্। কিন্তু আমি বাজার করে নিয়ে গেলেও কি শেফালী নরমাল চোখে আমার দিকে তাকাবে? যেন আমার কি হয়ে গেছে—এই ভঙ্গীতে আমাকে দেখবে। আর তখনি—ঠিক তখনি আমি মাথা থেকে পা অব্দি রেগে যাবো। আমার ভেতরে তখন সেই আদি ঘাতক। শেফালী কেন ঋতুকে দিদি বলে ডাকবে? এটা কি শেফালীর একটা ক্ষয় নয়? এটা অমিয় সাঁতরাদের কেন চোখে পড়ে না বুঝি না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে শহর কলকাতায় দেবকুমার বসু একজন ভ্রমণকারী। তবে সে তো গ্রীস থেকে এক সন্ধ্যের জন্যে এখানে বেড়াতে আসে নি। এখানকার এই ধুলো, গরম, সন্ধেরাতের কাঁচা আলো দিয়েই তার শরীর, সংস্কার তৈরি। কেননা সে তো মেড্ ইন ক্যালকাটা। তাই শহর কলকাতার শরীরে যে ক্ষয়—সে-রকম কোন ক্ষয় দেবকুমার মেনে নিতে পারে। কিন্তু বুড়িয়ে যাওয়া মানে কি করে? আর লোকগুলোও যা হয়েছে। সবাই যেন মরীচিকা দেখতে তৈরি। দৃশ্য, মানুষ বলতে শুধু যেন মরীচিকাই বোঝে।

এ ক'দিন হোল রাজুর পড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। গতকালই খুব ভোরে রাজুর পড়া মুখস্থ দেবকুমারের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সে অবাক হয়ে শুনছিল। তার স্বরে সেই এশিয়ার জলবায়ু। মধ্য এশিয়ায় গোবি। বালুঝড়। সবই গিলে ফেলছিল রাজু। হঠাৎ পড়াশুনোর এত চাপ কিসের?

বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখে রাজু পাশের ঘরের বিছানায় বসে দুলে দুলে মুখস্থ করছে। কাছেপিঠে কোথাও দাবার কোট নেই। শেফালী চায়ের জল চাপাচ্ছে।

এত কিসের পড়া রাজু?

কোন কথাই বললো না। দেবকুমারকে চোখ তুলে দেখলো না পর্যন্ত।

আমি তোর বাবা—এ কথা জানিস নিশ্চয়?

মাথা তুলে রাজু এবার চুপচাপ সায় দিল।

এত পড়াশুনো কিসের?

পরীক্ষা আছে। স্কুল খুললেই শুরু হবে।

আগেও তো এগ্‌জামিন থাকতো। তখন তো পড়িস নি রাজু।

তখন কোশ্চেন কত সহজ হোত।

খুব পেকেছিস। আসল ব্যাপারটা কি বল তো? তোর মা কিছু বলেছে?

রাজু মাথা নীচু করেই বললো, এখন আমাদের সংসার আমাদেরই চালাতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না আমাকে?

তাই বলে তুই দাবা খেলা ছেড়ে দিবি?

দাবা খেললে তো আর চাকরি দেবে না কেউ।

ও বুদ্ধিমান! এসব শেখালো কে?

শেফালী এসে পড়ায় কথা আর এগোয় নি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দেবকুমার চুপ করেছিল।

এখন সন্ধেবেলায় কলকাতায় পুজোর ছোঁয়াচ। রাজুও হয়তো মনে মনে এই পুজোর ছোঁয়াচ টের পাচ্ছে। কিন্তু পড়া ফেলে ওঠার উপায় নেই। কারণ শেফালী ওকে নিশ্চয় বলে রেখেছে—তোমার বাবাটি অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গিরি আর সারছে না। বরং নিজেকে তৈরি করো। চাকরি বাগাও। এ সংসার তোমাকেই চালাতে হবে। দাবা মাথায় রাখো এখন। রুণু তো বিয়ে হয়ে পর হয়ে গেল।

মির্জাপুরের মুখে নতুন এয়ার-কণ্ডিশনড্‌ সেলুন। বাতাসে শুধু আলো মাখানো গরম। দেবকুমার ভারি দরজা ঠেলে খুব আরামের ঠাণ্ডায় ঢুকে পড়লো। গরমকাল চলে যাবে বলে প্রত্যেকটা বাতাসে গরমের একটা করে বিদায়। সে জায়গায় আর দু'মাসের ভেতর শীত এসে ঢুকবে। এরকম ফাঁকা জায়গা ভর্তির ভেতর একটা ক্ষয় ক্ষয় ভাব আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তা বোঝা যায় না। এক সময় আমি খুব মাংসাশী ছিলাম। পাঁঠার হাড় ভাতের পাতে খুব চিবিয়ে খাচ্ছি। একখানা পাঁজরের হাড় মনে হলো, কোনরকম স্বাদ না দিয়েই গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। একদম হাড়ের মিছরি। চিবোনো বন্ধ করে ভাবলাম। বুঝলাম, পাঁঠার নিশ্চয় টি. বি. ছিল। মানে যার হাড়-মাংস খাচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা শুকনো দুপুর দেখতে পেলাম। ঘাসগুলো রোদে পুড়ে সবুজ জেল্লা হারিয়ে বসে আছে। কোন লোক নেই। সেই কাল্পনিক পাঁঠাটি জ্বলন্ত দুপুরের ভেতর খক্‌ খক্‌ করে কাসলো।

বসুন। বলে সেলুনের কেতাদুরস্ত নাপিত এগিয়ে এলো। পায়ে স্যু। সাদা উর্দি। স্পটলেশ। দেওয়ালে আলো। আয়নায় আলো। এমন করে বসানো—চারদিকে কোথাও কোন দাগ নেই। সুবেশ লোকজন সুবেশ লোকজনের চুলদাড়ি জুলফি কাটছে। মাথা ডলাই হচ্ছে কোথাও। তিনটি মেয়ে বয়েজ কাট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেবকুমারকে একখানা দামী ম্যাগাজিন নিতে হোল

নরসুন্দরের হাত থেকে। পাতায় পাতায় গম্ভীর প্রবন্ধ। মানুষকে সুন্দর করার এই কারখানায় এখন স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব।

দেবকুমার একটা ঘুরন্ত চেয়ারে জায়গা পেয়ে গেল। অনেকটা ডেন্টিস্টের দাঁত তোলার চেয়ার। হয়তো এখানটা রাত ন'টা অব্দি সেলুন—বিউটি পারলার! তারপর থেকে ভোর অব্দি হয়তো ডেন্টাল হসপিটাল হয়ে যায়। এত লোশন। এত আয়না। এত নীচুগলায় কথাবার্তা। আর এই ঘুরন্ত চেয়ার।

চেয়ারে বসেই তার মনে হোল, কেউ যেন বাতাসের ভেতর শরীর নিয়ে ফুটে উঠছে। দেবকুমার তার নামানো চোখ দিয়ে ফুটন্ত মানুষটাকে দেখতে চাইলো। চারদিকে কাস্টমার। মারকারি ল্যাম্পের আলোয় এয়ার-কণ্ডিশন ভেতরটা একদম দিন। সেই নকল দিনের ভেতর যিনি ফুটে উঠতে চাইছিলেন—তিনি আসলে সুকুমার দে সরকার।

আয়নার সামনে বসে দেবকুমার আড়ে আড়ে ফাঁকা বাতাসে তাকাচ্ছিল। অন্যরা যাতে টের না পায়—এমনি করে সুকুমার দে সরকার ফুটছিলেন। আগে জুতোর ব্রাস প্যাটার্নে মাথার এক পোচড়া চুল। কমাণ্ডার গোঁফ তারপর, দরকারী দূরত্ব ঠিক রেখে শেষে মাথা নীচু রাজা ফাউন্টেন পেনের ডগা। সমগ্র সুকুমার দে সরকারের তিন জায়গা থেকে তিনটি বাছাই স্পট। যারা আসলে সুকুমার দে সরকারেরই আভাস দেবে।

একবার দেবকুমারের এমনও মনে হোল—ওই বুঝিবা আত্মঘাতী হরিণের অভিমান এয়ারকণ্ডিশন সেলুনের দেওয়ালে চোখ হয়ে ফুটে ওঠে। শাখা প্রশাখায় ছড়ানো হরিণের একজোড়া সিং। খদ্দেরদের ভেতর খানিক জায়গায় অদৃশ্য ফাঁকা। সেখানকার বাতাসে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না দেবকুমার। কেন না, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল—সুকুমার দে সরকার সেখানে অনেকটা ফুটে উঠেছেন। তিনি যেন সবাইকেই সাক্ষী রেখে ফুটতে চান। আর

সেটাই কেন যে দেবকুমারের সংকোচের কারণ হয়ে উঠেছিল। তার যা কিছু কাজকর্ম এই লোকটি সঙ্গে, সে তা নিভৃতেই রাখতে চায়।

গরম জল দেবো ?

কেন ? খামোকা এই গরমে গরম জল দিয়ে কেন?

সেলুনের ছোকরা দেবকুমারকে বললো, আপনাদের অনেকের তো এ বয়সে দাঁতে ব্যথা থাকে—তাই জেনে নিই আমরা—গরম জল দিয়ে ফেনা করবো—না এমনি জলের ফেনা করেই দাড়ি কামাবো ?

দেবকুমার চেয়ারে ভালো করে উঠে বসে ছোকরার গলা নকল করে বললো, এমনি জলেই দাড়ি কামাবো।

দাড়ি কামাবার শেষে ছেলেটি জানতে চাইলো, চুল কাটবেন তো ?

দাও কেটে।

কলপ নেবেন ?

সিঁথিতে তো ক'টা পেকেছে। কলপ কি জন্যে ?

ক'টা কী বলছেন ? ভালো করে আয়নায় দেখুন।

দেবকুমার ভালো করেই দেখলো। সিঁথিতে কয়েকটা অবাধ্য রূপোলী তার। কিন্তু বাকী মাথা তো পাকে নি। আচমকা নিজের মাথা দেখা বন্ধ হয়ে গেল দেবকুমারের। কোন রকম আভাসের তোয়াক্কা না রেখেই আস্ত সুকুমার দে সরকার ফুটে উঠেছিল। কমাণ্ডার গোঁফের নীচেই খরখরে তুখোড় হাসি ফুটিয়ে আয়নায় সবে ছায়া ফেলেছেন—আর তখনই দেবকুমার ছোকরাকে বললো, এবার থাক। সামনের বার থেকে কলপ দিও।

এমন গপ্পে খদ্দেররাই ভালো বকশিস করে। ছোকরা মোলায়েম করে দেবকুমারের বাঁ জুলফির নীচে ঘন ফেনা থক্ করে লাগালো। এবার ক্ষুর টানবে। মুখখানা দেবকুমারের মাথায় তাকানো। আর

অমনি সুকুমার দে সরকার বেবাক ফুটে উঠলেন। আয়না জুড়ে। একদম যেন জ্যান্ত।

দু' তিন দিন কি হয়েছে বুঝতে পারছে না দেবকুমার। যখনি মাথা নীচু করে সে কিছু কাজ করে—তখনই লক্ষ্য করেছে—কে যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকেই লক্ষ্য করে। এখন ধরতে পেরেছে—সেই লোকটি আর কেউ নয়—খোদ সুকুমার দে সরকার। তাহলে কি সরকার মশায় বেঁচে আছেন? নয়তো এমন বাতাসে মিশে গিয়ে উদয় হন কেন? এই তো এখন একঘর সেলুনের ভেতর আভাসে ইঙ্গিতে ফুটে ফুটে উঠছেন। আবার আয়নাতেও দেখা দিতে চাইছেন। ভাঙা ভাঙা টুকরো হয়ে। একটু জুড়ে ফেলতে পারলেই সমগ্র সুকুমার দে সরকার। অথবা আস্ত সুকুমার দে সরকার। কিন্তু কিছুতেই পুরোটা ভেসে ওঠেন না—বা ভেসে উঠতে পারেন না। পারলে একদম পূর্ণাঙ্গ—অক্ষুণ্ণ—অক্ষত সুকুমার দে সরকার হয়ে যেতে পারতেন। যেমন ওঁকে দেখেছিলাম—দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতার আলোয় —প্রথমবার—হাতে রাজা ফাউন্টেন পেন। সামনেই উঁচু ঢিবির ওপর চুনে হলুদ রংয়ের আত্মঘাতী হরিণ। ওঁর গল্পের হরিণ আসলে। একটা স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবের ভেতর।

পাকা রং দেবেন তো চুলে?

আজ থাক ভাই। আবার তো আসছি।

তবে আসুন ঘাড় মাথা ডলে দি। ফ্রেশ লাগবে। একদম ইয়ং হয়ে যাবেন—

দেবকুমার বাধা দিল না। বুঝলো খদ্দেরদের মুখে শোনা ইংরিজী কথাবার্তা এলোমেলো কুড়িয়ে রাখা ছিল ছেলেটির। এখন তা উগরে দিচ্ছে।

ডলাই মালাইতে মাথাটা হাল্কা লাগছিল। সন্ধেরাতের কলকাতায় হাঁটতে মন্দ লাগে না। ভাল ভাল পাড়ায় ইলেকট্রিক

নেই বলেই সাময়িকভাবে মোম জ্বলছে। ভালো ডাক্তারের চেম্বারেও মোমের আলো। এ আলোয় একটা অন্ধকার আন্তরিকতা থাকে। সেলুনের ছোকরাটি কলপ দেবেই বলে ক্ষেপেছিল। কত আপনজন হয়ে জানতে চাইছিল—কোন্ কলপ দেব? এ কি শুধু পয়সায় হয়?

মনে মনে 'অন্ধকার আন্তরিক' কথা দু'টি আউড়ে আউড়ে একসময় থেমে গেল দেবকুমার। সে টেরও পেল না—একা একা একটি শরীর নিয়ে দেবকুমার বসু চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। সেই শরীরে এখন কবিতা। যে-কবিতা কিছুতেই কোন ভাষা হয়ে গুনগুন করে মনে মনে ঘুরে বেড়ায় না। শুধু অন্ধকার আন্তরিক। একসময় টের পেল—তার নিজের চোখ দিয়ে জল নামছে গালে। তখন মনে মনে একটি কথাই ফিরে যেতে থাকলো।

জীবন ফুরায়ে যায়
অন্ধকার আন্তরিক
এক টাকার একশো পয়সায়
জীবন ফুরায়ে যায়…

জ্যোতি সিনেমার পাশাপাশি কয়েকটা সাইকেলের দোকান। সেখান দিয়ে হাঁটা কঠিন। হুড়দাড় ভিড়। পেরিয়েই দেবকুমার একটা ফটোর দোকানের সামনে পড়ে গেল। কালো ঘেরটোপের বাইরে ইলেকট্রিকের ঝকঝকে আলো। কী নেশায় দেবকুমার ঢুকে পড়লো। একজন মোটাসোটা লোক এগিয়ে এসে বললো, পাসপোর্ট ছবি?

উঁহু। শুধু ছবি।

লোকটি একবার কি ভাবলো। তারপর বললো, পাউডার মেখে নিন গালে।

মুখটা যদি মুছে নিই শুধু। তাতে হয় না?

হবে না কেন! তবে কিনা বয়সের দাগদাগালী ঢাকতে একটু আধটু পাউডার তো দেয়ই লোকে।

এখানেও আয়না! তাতে তাকালো দেবকুমার। সে তার নিজের মুখে কোন দাগ দেখতে পেলো না। তবু বিশ্বাস করতে চাইলো—নিশ্চয় কোন দাগ আছে। নয়তো ফটোর দোকানের লোক বলবে কেন?

কয়েক ছটাকের ওপর ফোটো তোলার দোকান। সাউণ্ড প্রুফ লাইটপ্রুফ দরজা উপচে বাইরের আওয়াজ আসছিল। রাস্তার জটলার গোলমাল। ট্রামের ঘণ্টা। কত কি! আমি কি কোনদিন এ ঘর থেকে বেরোতে পারবো, না এই আমার শেষ?

পাউডারটা মেখেছেন? ব্যস। এবার রোমাল দিয়ে মুখটা মুছে ফেলুন। অ্যাই তো—বলতে বলতে মোটা লোকটি স্ট্যাণ্ডে খাটানো বড় ক্যামেরাটার স্থঁড় ধরে কি যেন ঠিক করতে লাগলো।

ক্যামেরার স্থঁড়ের ভেতর লেনস্ গোঁজা থাকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেবকুমারের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। একটা ইংরিজী কথা তার মনে পড়েছে। ক্যামেরা ক্যান নট বিট্রে। ক্যামেরার চোখে কিছুই এড়ায় না। সত্যি সত্যিই যদি আমি রাতারাতি বুড়িয়ে গিয়ে থাকি তো ক্যামেরা ঠিক ধরে ফেলবেই। আর যদি না-ই হয়ে থাকি—তাহলেও ক্যামেরা তার কাজ করে যাবে।

অতএব আমি এখন অগ্নিপরীক্ষায়। ক্যামেরার স্থঁড়ের ভেতর শুকনো চোখটা আমার দিকে তাকিয়ে। এবার ঠিক হয়ে যাবে— আমি ঠিক? না, যারা আমায় বুড়ো বলছে— তারা ঠিক। শরীরের যেখানে যে ভাঁজটি—আলোছায়ায় ক্যামেরা ঠিক তা তুলে ফেলবে।

একটু হাসুন। আরেকটু। বাঁ দিকে মাথাটা হেলে যাচ্ছে। উঁহু। ও ভাবে হবে না—বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে এসে দু'হাতে দেবকুমারের মাথা ঠিক করে দিল। মানে তার ক্যামেরার উপযুক্ত করে তুললো। এই তো। এবারে বেশ আলো পড়বে মুখে।

আলো ফেলার কায়দা খুব সাধারণ। একখানা রাংতা মোড়া স্লেট মুখের সামনে ধরে দেবকুমারের চোখে, কপালে আলো রিফ্লেক্ট করার আয়োজন। সেজন্যে ভিখিরী টাইপের এক বাচ্চা সব সময় রাংতার স্লেট হাতে ধরে বসে আছে। আবার ঘুমে ঢুলেও পড়ছে। এটাই বোধহয় পৃথিবীর শেষ ঘেরা জায়গা।

মোটাসোটা লোকটি ক্যামেরায় চলে গিয়ে কি কল টিপলে—এমন সময় আলো নিভে গেল। সেই সঙ্গে বন্ধ দরজার বাইরে আকাশে ঠেলে ওঠা হুল্লোড়। লোড্‌শেডিং হলেই লোকে আজকাল এভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। এটা শোক না আনন্দ—দেবকুমার বুঝতে পারে না।

বাইরে বেরিয়ে এবার তার সত্যিই মনে হোল—

জীবন ফুরায়ে যায়
আন্তরিক অন্ধকারে একশো টাকার
দশ হাজার পয়সায়
জীবন ফুরায়ে যায়

সত্যিই চলে যাচ্ছে জীবন। আমি টের পাচ্ছি সুকুমার-বাবু। অন্ধকারে ফুটপাতে এ কথা ক'টি বলে সে কোথাও রাজা ফাউন্টেন পেনের ডগা ভেসে উঠছে বলে দেখতে পেল না। মোক্ষম সময়ে আলো চলে গেল। এখন তো আমি জানি—সব সময় জুড়ে এই জীবন খরচা হয়ে যাচ্ছে। ট্যাকসির মিটারের মত। দাঁড় করিয়ে রাখলেও মিটার ওঠে। চলে যাওয়া জীবন চাকা ঘুরিয়ে যায় না। আর এই খরচা—শেষ খরচা। ভাবতেই দেবকুমারের মাথার ভেতর চাঁদের আলোয় মরা কলকাতা চলকে গেল। হাত থেকে তেলের বাটি এইভাবে খসে পড়ে।

আর আসা হবে না
কোন পথ নেই বলেই হবে না
চিঠি দিলেও পাবো না

যে ফেরে তার হয়ে বিলাপ মানায়
না ফেরার দলে অশ্রুপাত
সেও তো কোনক্রমে ফেরারী প্রপাত
কোনদিন আর হবে না সে জলধারা
হিমানী খণ্ডেও তার নতুন ঠিকানা বেমানান।

দেবকুমার বসু ঠিক করলো—আজ যে কোন উপায়ে বাড়ি ফিরেই সে এসব কথা—কবিতা না পারুক—প্রবন্ধ করে লিখে রাখবে। হিমানী খণ্ডে অশ্রুপাত। যদি সে অশ্রু হয় রক্তপাত। শ্বেত শীলায় লাল রক্ত। একটি রংয়ের পদ-প্রান্তে আরেকটি রংয়ের পতন।

দেবকুমার বেলতলা রোডে একটা অন্ধকার গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে বড় একটা কদম গাছের ছায়ায় পাতা সব সময় ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

লোকজন তেলকালি মেখে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন খোলে—লাগায় —স্টার্ট করে—আবার বেচেও দেয়। এখন অবিশ্যি ঝাঁপ বন্ধ। দেবকুমার কেঁপে উঠলো। আমি কি আজ বাড়ি ফিরতে পারবো না? আমার বাড়ি। আমার বিছানা। আমাদের খাবার টেবিল। আমাদের সংসার। মানে—আমি—শেফালী।

সন্দেহটা এবার দেবকুমারের বুকে বিঁধে বসে গেল একদম। আর অমনি দেবকুমার এলোপাথাড়ি পা ফেলে বাড়ির দিককার রাস্তাটা খরচা করে দিতে লাগলো। তার আগে আগে যে যাচ্ছিল —তাকে কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় পৌঁছে সেখানকার আলোয় পেছন দিক থেকেও চিনতে পারলো। সরকার মশায়। হাতে সেই খোলা পেন। 'একই রকমের আছেন। শুধু গায়ের শার্টটা কিছু ময়লা হয়েছে। হঠাৎ সুকুমারবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—দেবকুমার, এই দেবকুমার—

॥ পাঁচ ॥

আজ সপ্তমী। প্রতিমার মুখের আবরণ উন্মোচন করবেন যিনি—তাঁকে পাওয়া গেল না। পাড়ার মণ্ডপ থেকে বার বার মাইকে ঘোষণা হচ্ছে—নির্ধারিত প্রধান অতিথির অনুপস্থিতিতে পল্লীর মাননীয় বাসিন্দা দেবকুমার বসু প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করবেন।

ঘরে বসে মাইকে নিজের নাম শুনে দেবকুমার বসু অবাক হোল। উত্তেজিতও হোল। আমি জানি না—অথচ আমিই আবরণ উন্মোচন করছি। আশ্চর্য! ও শেফালী, শেফালী—

চেঁচাচ্ছো কেন? বল।

তুমি কাছেই ছিলে। সাড়া দাও নি তো আগে?

দেবার কি আছে বলো।

যে উৎসাহটুকু উঠে এসেছিলো—তা একদম মিইয়ে গেল। দেবকুমার বুঝতে পারছিল—এখুনি ‘পল্লীর’ ছেলেরা এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। আদর, সম্ভ্রমের নামে তাকে এখুনি পাড়ার পুজো কমিটি প্রায় চ্যাংদোলা করে স্পটে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। আমি ডাকলে তোমার ভালো লাগে না শেফালী?

না। লাগে না!

শেফালীর মুখখানা থমথমে। সে একদম অন্য জায়গা দিয়ে বললো, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

কেন যাবো?

তোমার যাওয়া দরকার। বলে শেফালী দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, ঋতুদি বলছিলো—

চেঁচিয়ে উঠলো দেবকুমার। আবার ঋতুদি ?

কি হয়েছে ? তুমি না কি ওদের স্কুলের জানলায় গিয়ে পাগলের মতো দাঁড়িয়েছিলে ?

কি হয় নি! দাঁড়িয়েছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে তো ছিলাম না শেফালী।

ওই একই কথা! ঋতুদি বলছিলো।

ধমকে উঠলো দেবকুমার। আবার ঋতুদি! লজ্জা করে না তোমার ?

সকালবেলা অমন চেঁচাবে না বলে দিলাম। ডাক্তার দেখাও। একরাতে কেউ বুড়ো হয় ? নিশ্চয় তোমার কোন গুপ্ত—

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়া গলায় দেবকুমার বলে বসলো, জানি। কেন তুমি ঋতুকে দিদি ডাকো। ওদের অবস্থা ফিরে গেছে বলেই তো! ওরা বড়লোক হয়ে গেল বলেই তো—

মোটেও না। এমনিতেই দিদি ডাকার উপযুক্ত মানুষ তিনি। ত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। সবাই দিদি বলে ডাকে -আমিও ডাকি।

দু'বছর আগে তো ডাকতে না শেফালী।

মানুষকে আস্তে আস্তে জানা যায়। আমার জন্যে ওঁর ওখানে একটা কাজ ঠিক করেছেন ঋতুদি।

ইজি চেয়ারে উঠে বসলো দেবকুমার। কাজ? তোমার ন্যে?

একটা কিছু তো খুঁজে নিতে হবে। তোমার যা শরীর—

শরীর কথাটায় চুপসে গেল দেবকুমার। সে তো এই ক'মাস রীরের কথায় অন্যদের আমল দেয় নি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে—াকে একটু একটু করে আমল দিতে হচ্ছে। কাঁহাতক পারা যায়। যখানেই যাচ্ছে—সেখানেই তাকে একই কথা শুনতে হচ্ছে। তাকে দখে গোড়ার দিক-কার সেই গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর বন্ধ হয়েছে

ঠিকই। কিন্তু এখন তার বদলে লোকে কপালে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তাকে।

পুজো মণ্ডপে পৌঁছে দেবকুমার বস্ত্র আবরণ উন্মোচন করলো ঠিকই। কিন্তু একটু পরে দেখলো—তার 'পল্লীর' ভলান্টিয়াররা খুব মন দিয়ে তাকেই দেখছে। প্রতিমাকে নয়।

হাটবাজারে পথে দেবকুমারকে দেখে দেখে যাদের চোখ পচে গেছে—তারা বিশেষ কেউ তাকাচ্ছিল না। শুধু পুজো কমিটির একজন পুরনো ভাইস প্রেসিডেন্ট একবার বললো, এই শীতে কোথাও ঘুরে এসো না দেবু। কলকাতার একঘেয়ে লাইফ থেকে মাঝে মধ্যে একটু চেঞ্জে যাওয়া উচিত।

দেবু সামান্য হেসে মাথা নাড়লো। কারণ, তখন পায়ের কাছে টুলের নীচে ভিজে ঘাসে দাঁড়িয়ে 'পল্লীর' অন্য সব ভলাণ্টিয়ার। যারা তাকে রোজ দেখে—তারাই তাকাচ্ছে। একজন উঠতি যুবা হাসি চাপতে না পেরে পেছনে চলে গেল—ভিড়ের পেছনে। উরি বাস্! কী বুড়োপানা মেরে গেছে লোকটা! দেকেচিস্—

যারা দেবকুমারকে চেনে তারা ইদানীং নিজেরা বলাবলি করে—দেবুর শরীরটা কী হোল বল তো ভাই? ওকে তো আমরা অনেককাল দেখে আসছি। এসব কথা দেবকুমারের কানেও এসেছে।

দেবকুমার প্রতিমাকে দু'হাত তুলে নমস্কার করে উঁচু টুল থেকে নামছিল। একটু হলে ঘুরে পড়তো। প্রায় তারই বয়সী এক ভদ্রলোক—বোধহয় অল্পদিন এ পাড়ায়—দেবকুমারকে ধরে ফেললো, আরেকটু হলেই হয়েছিল।

থ্যাংক্ ইউ, বলে পায়ে পাম্পস্যু গলাচ্ছিল দেবকুমার।

ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে আবার এতটা তুললো কেন? আপনি তো মাটিতে দাঁড়িয়েই এসব কাজ করবেন।

যাকে বলে গুড্ ফেইথে কথা বলে যাচ্ছিল লোকটি। এ পাড়ায় নতুন আমদানী। কোন খুব বয়স্ক লোককে এভাবেই তো কথা বলে

লোকে। এখন তো মানতেই হয়—আমি নিশ্চয় বুড়ো হয়ে গেছি। নয়তো অজানা আনকোরা লোকজন এভাবে বলবে কেন? তাহলে—

দেবকুমার নিজের দু'খানা পা টানতে টানতে পুজো মণ্ডপ থেকে বড় রাস্তায় এলো। সামান্য ক'খানা বাড়ি। লণ্ড্রী। গেরস্থদের ছাইগাদা। শারদীয়া লাল সালু রাস্তার ওপর ঝুলছে। পাড়ার সব ক'টা ঘরবাড়ি থেকেই কি লোকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে? এরকম একটা মন নিয়ে দেবকুমার বাড়ি ফিরে এলো।

তার উল্টোদিক দিয়ে চিরকালের উৎসব পাগল ছেলেমেয়েরা মণ্ডপের দিকে চলেছে। দেবকুমারের মনে হচ্ছিল, সে তার ছেলেবেলার ভেতর দিয়ে মধ্য জীবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদিকে আর তার ফেরা হবে না। এমন কি যাকে সে তার এখনকার বয়সকে মধ্য জীবন বলে দাগ দিতে চাইছে—তাতে অনেকেরই আপত্তি হবে। কেন না, সবাই তো বলতে চাইছে—মধ্য জীবনটা টপকে সে একদম বুড়ো হয়ে গেছে। এই তো মাসখানেক—মাস দেড়েক আগে। তবে কি মধ্য জীবন আর তার আসবে না? এরকম করে জীবনের একটা সময় মুছে যায় কি করে? কলকাতার বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন অবুঝ পাগল যে ভাবে হাতের লাঠি ঘোরায়—অবুঝ আনন্দে সে-লাঠি ফুটপাতে ছুড়ে দেয়—ঠিক সেইভাবেই আমাদের জীবন নিয়ে—বয়স নিয়ে—স্মৃতি নিয়ে কোন অবুঝ পাগলের ক্রিয়াকাণ্ড অনর্গল ঘটে যাচ্ছে। ভাগ্যিস আমরা তা টের পাই না।

পুজোর দিন সকালেই মনটা ভারি হয়ে যাচ্ছে দেখে খুব খারাপ লাগলো দেবকুমারের। সপ্তমী বলে কথা! ছেলেবেলায় প্রথম দিনে ঢাকে কাঠি পড়লে—সে শব্দ বিলের জলে পিছলে গিয়ে ওপারের গাব বনে ঢুকে পড়তো। বাড়ি ফিরে আরও অবাক হোল। সপ্তমীর দিন রাজু খুব মন দিয়ে সেই একই ভূগোল পড়ে যাচ্ছে।

এশিয়ার জলবায়ু। কি ব্যাপার? জলবায়ু তো মানে আসলে মেঘের ট্যুর প্রোগ্রাম। কিংবা রোদ্দুরের ঘোরাঘুরি। নানা রকমের বায়ু। সেই সুবাদে ঘাস, মাটি, পাহাড়, সমুদ্রের জীবনযাপন।

কি রাজু? আজ আবার ভূগোল কিসের?

রাজু মুখ তুলে তার বাবার মুখখানা দেখতে লাগলো। সেই তাকানো মুখে দেবকুমার একই সঙ্গে বিস্ময় আর দুঃখকে দেখতে পেয়ে ছেলের জন্যে মনের ভেতরে অদৃশ্য কাঁটায় ঘষা খেল। আজ শহর কলকাতায় অনেক জায়গায় ঢাকে কাঠি। মাইকে গান। মা দুর্গার মুখে সেই চিরকালের বিস্ফারিত হাসি। এই আমার বংশধর।

বাবা, তুমি ডাক্তার দেখাবে না?

দেখাবো। সময় হলেই দেখাবো। ছুটির দিন কিসের পড়া? দাবা খেলা ছেড়ে দিলি?

আমার রেজাল্ট ভালো করতে হবে। চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি আমরা। তুমিও সেরে যাবে—

দূর বোকা! আমার কি হয়েছে যে আমি সারবো? রেজাল্ট তোর ভালো করতেই হবে?

হ্যাঁ বাবা।

কেন রাজু? না করলেই না!

আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো একদিন।

সে তো তুই দাবা খেলেও অনেক টাকা আনতে পারিস।

তার চেয়ে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে তারপর আবার চুটিয়ে দাবা খেলবো।

মনে মনে শেফালীর ওপর খুব রাগ হোল দেবকুমারের। এতটুকু ছেলের মনটাও খারাপ করে দিল। সবই তো মায়ের মুখে শেখা কথা বলে যাচ্ছে। তখন আর খেলতে পারবি না রাজু।

অনেক সময় পাবো তখন। অনেক খেলবো বাবা।

তা হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে দাবা ভুলে যাবি। আজ তো সপ্তমী। বেরিয়ে পড় কোথাও।

বেরোবো ?

নিশ্চয় বেরোবি। নয়তো পরে আর সপ্তমী চিনতে পারবি নে।

এশিয়ার জলবায়ু ফেলে রেখে আলনা থাকে ট্রাউজার পরে নিচ্ছিল রাজু। দ্যাখোগে বাবা—ও ঘরে তোমার জন্যে কে বসে আছে !

কে ?

দ্যাখো না গিয়ে।

দেবকুমার বসুর জন্যে আজকাল অবাক হওয়ার বিশেষ কিছু পড়ে থাকে না। অফিসে সে এই একমাস দেড় মাসে দেখার বস্তু হয়ে ওঠায় অফিসটা তার কাছে হাসপাতালের আউটডোর লাগে। সে-ই যেন ডাক্তার। নানা ডিপার্টমেণ্টের লোকরা তাকে দেখতে এসে যেন নিজেদেরই দেখিয়ে যায়। দেবকুমার দাঁতে দাঁত চেপে হাসে—কথা বলে—কেমন আছেন বলে। একখানা হ্যাণ্ডি গীতা সব সময় তাই কাছে রাখে দেবকুমার। পাতা উল্টে উল্টে দেখে।

কে এসেছে রাজু ? বলতে বলতে বসুজ ইটিং লজের এক নম্বর ঘরে এসে ঢুকলো। এ কি ! রুণু ? কখন এলি ?

রুণু তার বাবার খাটে বসে। এসব কি হয়েছে তোমার বাবা ?

একা এলি ?

ওসব কথায় কানই দিল না রুণু। তোমার কি অসুখ করেছে বাবা ?

চুপ কর তো। আমার কোন অসুখই করে নি। তোদের মা কোথায় ?

মা বাজারে গেল এইমাত্র। তুমি ডাক্তার দেখিয়েছো কোন ? যদি একা যেতে ভয় পাও তো আমি তোমার সঙ্গে যাবো বলে এসেছি।

তোকে খবর দিলো কে ?

তোমার জামাই। সে নাকি তোমায় বাস স্টপে দেখে চিনতেই পারে নি গোড়ায়। আমি বিশ্বাস করি নি।

এখন বিশ্বাস হচ্ছে ?

হ্যাঁ বাবা। তুমি এতখানি বুড়িয়ে গেলে কি করে ? মাত্র দেড় দু'মাসে। রাস্তায় দেখা হলে আমিও চিনতে পারতুম না।

দেবকুমার কোন জবাব না দিয়ে তার প্রথম সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকলো। বিয়ের পর রুণু পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠছে। আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। পুরোপুরি। ক'দিন ধরেই অফিসের পর আদি গঙ্গার গায়ে কথকতা শোনে দেবকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কানা গয়লার মোষের খাটালের গায়ে। ট্রামবাসের শব্দের ভেতর বেশ কথকতা। আত্মা অবিনাশী। মন ভর করে থাকে শরীরে। শরীরের লোভে লোভে মন আবার বৃষ্টি হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পিতৃশরীরে প্রবেশ করে। ধানের অঙ্কুরের ভেতর দিয়ে চালের দানায় ভাত হয়ে সে মন আবার পিতৃজঠরে প্রবেশ করে। পিতৃইচ্ছায় সে মন তখন মায়ের শরীরে গিয়ে নতুন শরীর পায়। ভূমিষ্ঠ নতুন শরীর তারপর নিজের কর্মফল মত জীবন শুরু করে। এই তো জীবনের চাকা! চাকা কথাটা বলে কথক ঠাকুর ঠা ঠা করে হেসে পড়েন।

তোর বর কোথায় ?

আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। দুপুরে আসবে।

তোরা আজ খাবি এখানে।

তুমি ডাক্তারের কাছে চলো আমার সঙ্গে।

যাবো। বলে দেবকুমার বসু আবার ভালো করে দেখলো তার মেয়েকে। ওর আগের জন্মে ও তো আমার মেয়ে ছিল না। এ জন্মে ওর আগেকার মনের ইচ্ছেগুলো আমার শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে মিশে গেছে। ও আমার জঠরে অন্ন হয়ে প্রবেশ করেছে। তারপর একদিন নবীন শরীর আর টাটকা কর্মফল নিয়ে এই মাটিতে

জীবন শুরু করেছিল। আবার কোনদিন রুণু নিজেই নতুন প্রাণকে নিজের জঠরে জায়গা দেবে। সে প্রাণের সঙ্গে ওর যোগ শুধু খানিক মায়ার। আসলে এই পৃথিবীর কোন একটা মাঠে পথিক-আত্মা একা একা নির্জনে কর্মফলের চাকাটা ঘোরায়—আপন মনে—শুধুই ঘোরায়। কথক ঠাকুর মোষের খাটালের পাশে কথকতায় বসে পথিক-আত্মা কথাটা পান কোত্থেকে ?

চলো বাবা।

যাবো। যাবো রে। বলতে বলতে শুয়ে পড়লো দেবকুমার। সত্যি সত্যিই দুনিয়াটা বলে বলে তাকে বুড়ো করে দিচ্ছে না তো।

দুপুরে জামাই এসে পড়ার পর এসব কথা আর হোল না। বাবাজীবন এমনভাবেই ভাত খেয়ে গেল—যাতে মনে হবে—এ বাড়িতে কোন গণ্ডগোলই হয় নি। এটাও খুব ভাল লাগলো না দেবকুমারের। শুয়ে শুয়ে একসময় রুণুকে বললো, জানিস—আমাদের ছোটবেলায় সপ্তমীতে এত গরম থাকতো না। হিম পড়ে যেতো ভোরের দিকে।

ওমা! আমাদের ওদিকেও তো হিম পড়ে গেছে।

ওদিক মানে—রুণুদের শ্বশুরবাড়ির দিকে। কলকাতারই এক প্রান্তে ওর শ্বশুরবাড়ি। নতুন পাড়া। বাড়িঘরদোর গিয়ে শেষ হয়েছে ধানক্ষেতে। সেদিক থেকেই শহরে পাখি উড়ে আসে। ভো কাটা ঘুড়ি ওদিকেই উড়ে চলে যায়। রুণুর জীবনটা—সংসারটা দুই প্রান্তের মাঝখানে রান্নাবাড়ি নিয়ে পড়ে থাকে।

রাজু তার জামাইবাবুর সঙ্গে এক হাত খেলতে বসে গেল। শেফালী সারাটা সকালই দূরে দূরে। এখন রুণুর জন্যে লেপের ওয়াড় ভাঁজ করে দিচ্ছে। যাবার সময় নিয়ে যেতে হবে রুণুকে। বিয়েতে বম্বে ডাইয়িংয়ের কম্বল কাম লেপ দেওয়া হয়। তাড়াতাড়িতে ওয়াড় করা হয় নি। আমাকে ঘিরে এই সংসার। আমাকে দিয়ে এর শুরু। মাঝামাঝি এসে শেফালী জয়েন করলো।

আমার আগের জন্মের পথ চেনানো আত্মা অপূর্ণ সব ইচ্ছে বাজারের থলেতে ভরে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর কোন্ না বৃষ্টি—কোন্ না ফলদায়িনী অঙ্কুরে বাসা বেঁধে শেষমেষ আমারই পিতৃশরীর আশ্রয় করে। তারপর সেই অনন্ত চাকা! চাকা কথাটায় কী এত হাসি পায় কথক ঠাকুরের? ভদ্রলোক নাকি অল্পবয়সে ওই আদি গঙ্গার গায়েই আঢ্যিদের চালের কারবারে কাজ করতো।

নতুন আলু উঠতে শুধু করেছে। বস্তা ঝেড়ে বিক্রি হয়ে যাবার পর নীচের দিকে যে ধুলোমাখা গুলি গুলি আলু থাকে—তার সঙ্গে পেঁয়াজকলির পাতা মিশিয়ে ভাজলে ফুলকো লুচির সঙ্গে চমৎকার। দেড় কিলো মত সেই আলু কিনে ফেরার পথে পাড়ার মোড়ে একদল উঠতি ছেলে দেবকুমারকে দেখে ফিকফিক করে হাসলো। অমনি দেবকুমার বাজারের আরেক গলিতে সেঁধিয়ে গেল। এই হয়েছে এক মুশকিল। এমন করেই তাকিয়ে থাকে সবাই। বিশেষ করে চেনা লোকজনেরা। নয়তো নিজের পাড়া থেকে বেরিয়ে দেবকুমার একদম অ্যাট ইজ হয়ে যায়। কেন না, সেখানকার লোকজন তো তাকে দেখেনি আগে।

এসব অসুবিধের সঙ্গে কিছু সুবিধেও আছে। এখন তো বাসট্রামে উঠলে মাঝে মাঝে তার বয়সী লোকজনও দেবকুমারের মাথা, ভ্রূ, গালের দাগদাগালী দেখে তাকে সিট ছেড়ে বসতে দেয়। এই সিট ছেড়ে দেওয়াটা সে বেশ এনজয় করে। তাই বাস থামলে যতটা স্পীডে দেবকুমার নেমে যেতে পারে—তার চেয়েও আস্তে করে নামে। কণ্ডাক্টরের মনোযোগটুকু তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে তবে পাদানী থেকে টুক করে নেমে পড়ে পথে।

মুশকিল হোল গিয়ে এই চেনা মহল্লা। নিজের পাড়া। অফিস। বাজারের ননী মাছওয়ালা। জেনারেল প্র্যাকটিশনার অমলেন্দুবাবু

এম. বি। আর অফিসের অসিত? সে তো এখন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি সারিয়ে নিয়ে চড়ে। জেনারেল অ্যাড্‌মিনসট্রেশনে নিজের বদলির জন্যে অসিতকে আর বলে নি দেবকুমার। একটি অসৎ বউয়ের একজন অসৎ স্বামী। তার চেয়ে বেশি কিছু না অসিত দত্ত।

বাড়ি ঢুকে আলু পেঁয়াজকলি ভাজতে বলায় শেফালী ঝাঁঝিয়ে উঠলো। আমি কি শুধুই রাঁধবো? বুড়ো পেঁয়াজ কলিগুলো এনেছো কেন? ও কি কেউ খেতে পারে?

গায়ের চাদরখানা সরিয়ে নিজেই মার্বেল সাইজের আলুগুলো কুটতে শুধু করে দিল দেবকুমার। এ আলু কোটা এমন কিছু নয়। মাঝখান থেকে ফালি করে দোফালা করলেই চলে। শেফালী এগিয়ে এসে বঁটি কেড়ে নিল বেমক্কা। মেঝেতে বসতে বসতে দেবকুমার প্রায় থেবড়ে বসে গেল। বাড়িতে অন্য প্রাণী নেই। রাজু বেলা ন'টা দশটাতেই ফেনা ভাত খেয়ে অ্যানুয়ালের রেজাল্ট আনতে গেছে। দেবকুমারের খুব অপমান লাগলো। কাজের লোক তো তুমিও খুঁজে বের করতে পারো।

পারি। কিন্তু আসতে চায় না।

দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো। তার মানে?

সে তুমি বোঝো গিয়ে। পোড়া বস্তির মেয়েমানুষরা তোমায় নিয়ে হাসবে—কথা বলবে—সেটা কি খুব ভালো হবে? তৃপ্তি তো বলার কিছু আর বাকী রাখে নি।

পোড়া বস্তি মানে এখানকার ঝি-পাড়া। রাঁধুনী পাড়া। যুদ্ধের সময় জাপানী বোমায় বস্তির অনেকটা পুড়ে গিয়েছিল।

ভালো করে শেফালীর মুখখানা দেখলো। সেখানে দুটো চোখে মেয়েলী হাসি ছিল। ছিল প্রতিশোধের আনন্দ। তৃপ্তি কাজ ছেড়ে দিয়ে যাবার সময় একটা কথায় প্রায় পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কোন গোপ্ত রোগ আছে……। সেই কথাটাই কি পোড়া বস্তিতে রসালাপের বিষয়?

আজ সকালের শীতের সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের মিশেল। এবারে আলু একটাকা আশি। অন্যবার এসময়—বিশেষ করে আলু পেঁয়াজকলির কিলো—এক টাকার ভেতরেই থাকে। শেফালী নিজেই কুটতে বসে গেল। কুটতে কুটতেই বললো, এত নোলা কেন? এত খাওয়ার ইচ্ছে কেন?

বলতে বলতেই কাজ করছিল শেফালী। আমারও তো বয়স হয়েছে। এত সব ভাল লাগে? রোজ একঘেয়ে রান্নাবান্না—

এবারও কোন জবাব দিল না দেবকুমার। জীবন এত তাড়াতাড়ি মানে হারায়? এই তো সেদিন শেফালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোল। রুণুকে কোলে নিয়ে ভোরবেলার ট্রামে এ বন্ধু সে বন্ধুর বাড়ি ঘুরে এসেছি কত। এত তাড়াতাড়ি সব তেতো হয় নাকি?

ডিসেম্বর চলে যাবে। শীতের রোদে বাইরের লাল বারান্দাটা আড্ডা মারার অপূর্ব জায়গা। জীবন এইভাবে ফুরায়। বসুজ ইটিং লজের আদি দুই মেম্বার—দেবকুমার নিজে আর তার বউ শেফালী শুধু এখন বাড়িতে। অথচ এটা আর এখন আসলে কোন বাড়ি নয়। স্রেফ থাকবার জায়গা।

বসুজ ইটিং লজের তিনখানা ঘরের স্কুলবাড়িখানার শেষে রান্নাঘর। সেখান থেকে আলু পেঁয়াজকলি খুন্তিতে ডলতে ডলতে শেফালী পাশ ফিরে তাক থেকে রাঁধুনীর শিশিটা হাতে নিল।

অমনি দেবকুমার একদম দোরগোড়ায় এসে গেল। রান্না রাখো। এসো আমরা একটু পাশাপাশি বসি না।

কি? বলে এমন করে তাকালো শেফালী—যাতে দেবকুমার আগাগোড়া কুঁচকে গেল।

শেফালী আবার জানতে চাইলো, কি? পাশাপাশি কেন?

আজকাল তো তুমি একদম কাছেও আসো না।

খুন্তি হাতে উনুনের মিঠে তাপে শেফালীকে মন্দ দেখাচ্ছিল না। আসবো কি ? আমার একদম ভালো লাগে না।

কি ভালো লাগে না তোমার শেফালী ?

শেফালী আর কথা বাড়ালো না। খুন্তিটা এপিঠ ওপিঠ করে ভলছিল কড়াইয়ে। দেবকুমারও কথা বাড়ালো না। আজকাল সে পরিষ্কার টের পায়—তার শরীরের পার্টসগুলো কোনরকমে একসঙ্গে আছে। নয়তো দেবকুমারের ডান পা বাঁ পায়ের কথা শুনতে চায় না। মুখ বন্ধ করে থাকলেও বুঝতে পারে—মুখের ভেতরে অন্য এক জগতের গন্ধ। আতা গাছের পাতার গন্ধ। এই গন্ধ ধরেই একদিন রাতে আমি ঘুমের ভেতর একটা জঙ্গলে চলে যাই। সেখানে সেই চুনে হলুদ রংয়ের আত্মঘাতী হরিণটার ছায়া দেখতে পাই গোড়ায়। তারপর চোখ তুলে দেখি, খোদ হরিণটাই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঢিবিতে। আসো না শেফালী—আমরা একটু একসঙ্গে শুই ! জড়াজড়ি করে—

কুলকুল করে হেসে ফেললো শেফালী। অফিসে যাও। ওসব তুমি পারো না—

অফিসে তো যাবোই। এসো না শুয়ে পড়ি।

তোমার সঙ্গে আমার ভালো লাগে না। আমাকে ছেড়ে দাও।

দেবকুমার চুপ করে তাকিয়ে থাকলো। থাকতে থাকতে সুন্দর রোদে ঝলসানো লাল বারান্দাটাকে বড় ভালো লাগলো তার।

ইচ্ছে হয় শুয়ে পড়ি প্রশান্ত সামিয়ানায়
যতই গড়াই ততই প্রাগৈতিহাসিক প্রশান্তি
সামিয়ানার শেষ একেবারেই অনিঃশেষ

এই শেফালী। শেফালী। কবিতার ডাইরিটা দাও না। টুকে রাখবো ক'টা লাইন।

আমি এখন রান্না ফেলে যেতে পারবো না। কি হবে ওসব ছাইভস্ম লিখে ? অফিসে ঠিকমত ফাইল পাঠাও না।

শেষ কথাটায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো দেবকুমার। অফিসের কথা কে বললো তোমায় ?

কেন ? ঋতুদি হেসে হেসে বলছিল তোমার কথা। ফাইল দিলে নাকি তুমি খুলে বসে থাকো। তাগাদা দিলে তবে জানলার তাকে সে ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়! আমি লজ্জায় মরে যাই তোমার জন্যে—

ঋতু বুঝি আমাদের অফিসে জয়েন করেছে ?

তা কেন ? অসিতবাবুর কাছে কি কিছু শোনে না। এই নাও তোমার আলু্ পেঁয়াজকলি। লুচি এখন করতে পারবো না। হাতে গড়া রুটি দিয়ে খাও। খেয়ে তারপর আমাদের অমলেন্দু্ ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে আসো। বলতে বলতে শেফালী বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। দিনকে দিন তুমি এমন হয়ে যাচ্ছো কেন ? সেটা তো ইনভেসটিগেট করা দরকার।

এখন খাবো না। নিয়ে যাও।

আলু্ পেঁয়াজকলি গরম খেতে হয়।

আমার কবিতার ডাইরিখানা দাও তো।

কি আজেবাজে কথা গুচ্ছের লিখে রাখছো। কেন বল তো ? কি হবে ও সব লিখে রেখে ? তার চেয়ে মন দিয়ে অফিসটা করো না কেন ?

যা বলছি তাই করো। এখন খাবো না।

তাহলে আমায় দিয়ে রাঁধালে কেন ? বলতে বলতে শেফালী দেখলো তার চোখের সামনে দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো। তারপর বই রাখবার তাক থেকে মোটা বাঁধানো ছাইভস্ম লেখার ডাইরিখানা হাতে নিয়ে রেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে উড়ো বাতাসে পড়ে গেল দেবকুমার। শীতের এই বাতাসগুলো খুব ভয়ঙ্কর। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ দু'খানা বাড়ির মাঝখান থেকে হুড়মুড় করে এ বাতাস এগিয়ে এসে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতে কবিতা লেখার ডাইরি। গায়ের চাদরখানা কান অব্দি ঠেলে তুলতে তুলতে দেবকুমারের মনে এলো—একটিই লাইন—

এবার তো বৃষ্টি আসে নি
আসে নি ধারাপাতে—ফিরে গেলো জীবনের
ধার দিয়ে যেখানে রেল লাইনও যায় নি
যায় নি একটি তুলসী পাতার গন্ধেও
ফুরিয়ে দিয়ে জীবন—জীবনের লতাপাতায়

খানিকটা এগিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল দেবকুমার বসু। কবিতার লাইন তাকে এইভাবেই আক্রমণ করে। জীবন কথাটা এতই বড়। সেই কথাটার ভেতর দিয়ে একটা মিনিবাস একদম রাজহাঁসের গলা তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল। কথা কি কখনো মানুষকে কুরে খায়? সময় সময় খায়। শেফালীর আর ভালো লাগে না আমাকে। এখন ঋতু, তার ঋতুদি। এই ঋতু বনভোজনে গিয়ে দু'বছর আগে আমার খুব যত্ন করেছিল। এখন আমি তার কাছে একটা জোক বিশেষ—কমিকও বলা যায়। রোদ্দুর দেখে বোঝার উপায় নেই—ঠিক ক'টা বাজে। এখন অফিসে একা হয়ে যাচ্ছি কেন? তারপর আবার অনেকেই—মানে যারা এতদিন আমায় দেখে আসছে—তারা নাকি আমায় বুড়ো দেখছে। হবেও বা! এরকম রোগ তো আগে কলকাতায় আসে নি। ইণ্ডিয়াতে কারও হয়েছে এর আগে—তেমন তো শুনিনি কোনদিন।

দেবকুমারকে রাস্তার মোড় থেকে সরে দাঁড়াতে হোল। কেননা, মোড়ের জটলা থেকে দু' একটা ছেলের মাথা ততক্ষণে তার দিকে ঘুরে গেছে। চোখ তুলে এ ও তাকাচ্ছিল। দেবকুমার হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথ বদলালো। এ পাড়ার ফুটপাথে এখনো কয়েকটা বকুলগাছ আছে। গাছের গোড়ায় ছাইগাদা। ফুলকপি পাতা। বেওয়ারিশ গরু। গেরস্থ বাড়ি। কেরোসিনের লাইন।

একটা বাড়ির সামনে ভাল বাক্সতে লেখা পি. মুখার্জী। তার নীচে লেখা কবি ও কবিতা। কয়েকখানা চিঠির মাথা ডাক বাক্স থেকে বেরিয়ে আছে। অফিসের লোকজন অফিসে চলে গেছে। এখন তার মত কিছু এলোপাথাড়ি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই। একখানা পোস্টকার্ড তুলে নিল দেবকুমার।

প্রিয় পরিমলদা,

আপনাদের ত্রৈমাসিক কবি ও কবিতা কাগজের জন্য ছ'টি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। আশা করি পেয়েছেন। ওর ভেতর থেকে দু'টি কবিতা বেছে নিয়ে আপনি ছাপতে পারেন। আমাদের এই দিনহাটায় এখন গভীর শীত। তামাক চাষীরাই শুধু সকালের দিকে ভোর ভোর বেরোয়। নয়তো সারা দিনহাটা বেলা দশটা অব্দি এক খণ্ড বরফ হয়ে থাকে। এর ওপর ক'দিন আবার রোদ উঠছে না। সেইসঙ্গে কনকনে বাতাস।

দেবকুমার চিঠিখানা জায়গামত রেখে দিল। এবার তো বৃষ্টি আসেই নি। তবু শীত তো পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর জন্মকুণ্ডলীতে এ-বছর বর্ষাখানা কোথায় গিয়ে সেঁধোলো? আশ্চর্য!

এই কবির নাম তার শোনা শোনা। কখনো কি অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক দেখাতে পরিমলবাবুকে আনা হয়েছিল? ইদানীং তো নাট্যানুষ্ঠানে কবি কিংবা ঔপন্যাসিক ধরে আনার রেওয়াজ হয়েছে। একজন জ্যান্ত কবি মঞ্চে। সেকি কম কথা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও আরেকটা ডাকবাক্স। পি. মুখার্জী। কবি ও কবিতা। শেফালী কি জানে তার স্বামীর মত ছাইভস্ম লিখে রাখার আরেকজন গেরস্থ তাদের বাড়ির এত কাছাকাছি থাকেন। ডাক বাক্সে নিজের নাম লেখা। কাগজের নামও লেখা থাকে। কবি ও কবিতা। মালিক—শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়। শর্টে—পি মুখার্জী।

সিঁড়ির মুখে এক ভদ্রলোককে দেখে দেবকুমার জানতে চাইলো, পরিমলবাবুর ফ্ল্যাটটা ?

তেতলায় উঠে যান। বাড়ি আছেন কি এখন ? দেখুন না তবু।

কড়া নাড়তেই যে দরজা খুলে দিল—তাকে দেবকুমার ভেবেছিল, কবি পরিমলবাবুর বাড়ির কাজের লোক।

তাই বললো, পরিমলবাবু কি আছেন ?

হ্যাঁ। আমিই পরিমল মুখোপাধ্যায়। কোত্থেকে আসছেন ?

আমি এই কাছাকাছিই থাকি। অনেকদিন আপনার কবিতা পড়ছি।

কি ব্যাপার ? আসুন—বলে কবি ভেতরে ঢুকতে দিল তাকে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বসার ঘরে যাবার সরু ফালি।

ঘর ভর্তি বই। পোড়া মাটির ঘোড়া। ছবি। খাটের নিচে কবি ও কবিতা পত্রিকার ডাঁই। তিন দেওয়াল থেকে কবির তিনখানা ক্লোজআপ। দেখেই বুঝলো, পরিমল মুখোপাধ্যায় তার চেয়ে বয়সে বছর দশেকের ছোট হবেন।

আমি একখানা কবি ও কবিতা নেব।

নিশ্চয়। নিন না। এ তো আপনাদের মত পাঠকদের জন্যেই।

কত ছাপেন ?

সাড়ে তিনশো। জানেন তো—কাগজের দাম—প্রেস—সবই খরচা বেড়ে গেছে। তবু আমরা যাদের কাছে পৌছানো দরকার—তাদের কাছে পাঠাই। ডাকে। নয়তো গিয়ে দেখা করে হাতে হাতে দিয়ে আসি। একটু চা খাবেন ? অবিশ্যি দেরি হবে। আমার স্ত্রী মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গেছে।

নাঃ। এখন চা খাবো না। এতে তো আপনার খরচা হয়।

তা হয়। হাজার এগারোশো টাকা লাগে।

ওঠে সে টাকা ?

না না। বিজ্ঞাপন কিছু পেলাম তো ভাল। নয়'তো কিছু নয়। স্টলগুলো পয়সা মেরে দেয়।

বিক্রি হয় ?

আপনার হাতের সংখ্যাটাই একশো দশ কপি সেল হয়েছে। কিন্তু পয়সা একটাও কেউ দেবে না। কাঁহাতক স্টলে স্টলে ঘোরা যায় বলুন। কখন লিখবো ? কলেজ থেকে ফিরে এসে ঘুম পেয়ে যায়।

আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না ?

কিসে ?

এই যে এতগুলো টাকা ঘরের খেয়ে—

ওঃ! তা তো বলবেই। তাই বলে আমি থেমে থাকবো ? বড়ো কাগজ তো আমার লেখা ছাপে নি। আমি তো বসে থাকি নি। একটা একটা করে ন'খানা বই বের করেছি—পি এফ লোন নিয়ে। যাগ্‌গিয়ে। আপনার কথা বলুন।

দেবকুমার প্রায় কুঁকড়ে গেল। এই সামান্য সামান্য লিপি।

কবিতা না গল্প ?

কবিতা। দেখবেন ?

দেখি।

ডাইরিখানা এগিয়ে দিল দেবকুমার বসু। এতদিন পরে যেন তার নিজের ধর্মাবলম্বী একজনের সঙ্গে দেখা হোল দেবকুমারের। যে কিনা একটু একটু করে হারানো লাইনগুলোকে খাতার পাতায় সময়মত গ্রেফতার করে রাখে। একদম বিরুদ্ধ অবস্থার ভেতরেও কবি ও কবিতা কাগজ করেন। ন'খানা বই বের করেন। আমি তাহলে এতকাল কি করেছি ? না লিখেছি—না ছেপেছি। কোন হার্ডশিপের ভিতর দিয়েই তো যাই নি।

কতদিন লিখছেন ?

অল্পদিন। কিছু হয়েছে ?

চিহ্ন আছে। ঠিক কতদিন লিখছেন ?

তেমন কিছু না। মাঝে মধ্যে লিখি। আপনাদের মত লোকদের কখনো দেখাই নি তো।

না দেখিয়ে ভালো করেছেন। তবু বিশ বছর তো এই নিয়েই পড়ে আছেন দেবকুমারবাবু।

আমার নাম জানলেন কি করে ?

এতে তো কোন বুদ্ধির দরকার হয় না। ডাইরিতেই আপনার নাম লেখা রয়েছে দেখলাম।

আমি কিন্তু বিশ বছর ধরে লিখছি না পরিমলবাবু। এসব আমার এই অল্পদিনের লেখালিখি।

আপনার একটা ম্যাচিওর মাইণ্ডের পরিচয় পেলাম। সময় পেলে মাঝে মধ্যে আসবেন এখানে। আপনার তুলনায় সবাই আমরা হয়তো অল্পবয়সী। তবু খারাপ লাগবে না আপনার—

দেবকুমার বুঝলো, কবি পরিমল মুখোপাধ্যায়ও সেই একই ভুল করেছেন। সে ভুল আর ভাঙালো না। মনে মনে বললো, আমি তোমার চেয়ে বেশি বড় নই কবি পরিমল মুখোপাধ্যায়। মুখে বললো, ছন্দটন্দ ?

আপনি তো গদ্য ছন্দে লিখেছেন। লিখে যান—বলে কবি পি মুখার্জী একটা ছোটো কৌটো খুলে কি বের করে দাঁতে ঘষতে লাগলেন। খুব মন দিয়ে। তারপর হঠাৎ থামিয়ে বললেন, একজন কবি শুধু লিখতেই পারেন। আর কি পারবেন ? যা দেখবেন—সেই দেখা থেকে তাঁর কবিতায় নির্যাস উঠে আসবে। আপনার কবিতায় কিছু পুরনো শব্দ এখনো আছে। ওসব আস্তে আস্তে খসে যাবে।

আপনি কি মাজছেন ?

গুড়াকু। মাজবেন ?

মাজি নি কোনদিন। কেমন লাগে?

মেজে দেখতে পারেন। একটু ঝিম ধরা ভাব আসে। এই আর কি। লিখুন না আপনি। লিখে যান।

খুব লেট হয়ে গেছে হয়তো।

তা একটু দেরি তো হয়েই গেছে। এই বয়সে কে আর কবিতা শুরু করে বলুন? তবে যে কোন সময়েই শুরু করা যায় দেবুবাবু। লিখে যান। লিখে যান না—বলতে বলতে কবি দাঁত মাজতে চলে গেলেন। আলমারির তাকে রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

দেবকুমার তার মনের ভেতরে হাসলো। আমার লেট হয়ে গেছে। মুখে কিছুই বললো না। কবি ফিরে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছে বললেন, একজন কবি কী-ই বা আশা করতে পারেন। তাকে লিখে যেতে হবে। কিছু থাকবে। কিংবা একদম কিছুই নাও থাকতে পারে। আমার 'স্বর্গের ভাড়াটে' একদম গোড়ার দিনকার সনেট সংকলন। সেখানে জীবন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম—তা আজও পুরনো হয় নি। বইটা আবার রিপ্রিণ্ট হচ্ছে। বেরুলে আপনাকে এক কপি দেব।

আপনি কাউকে দেখতে পান? এ প্রশ্নটা করে দেবকুমারের মনে হোল—করা উচিৎ হয় নি। কিন্তু তখন তার আর ফেরার উপায় নেই। ভেবেছিল, কদাচ একজন কবিকে এমন তন্ময় অবস্থায় পাওয়া যায়। কথা বলার পরেও কবির ঠোঁটে কথাগুলোর স্বেদ ফুটে উঠছিল।

পরিমলবাবু চশমাসুদ্ধ মুখখানা কাছাকাছি নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসু। অবাক চোখে বললেন, কাকে?

এই যেন মনে হবে আমার দিকে তাকিয়ে দরজার বাইরেই কে দাঁড়িয়ে রয়েছে—

হো হো করে হেসে উঠলেন কবি। অতিপ্রাকৃত! অলৌকিক।!

নাঃ। তেমন কিছু দেখি নে। তবে পেছন ফিরলে—আই মিন হোয়াইল লুকিং ব্যাক্—অনেক কিছুই তো মনে পড়ে। তবে নস্‌টালজিয়া থেকে সাবধানে থাকবেন।

আমি সেকথা বলছি না পরিমলবাবু। মানে আগের জন্মের—কিংবা—

কথাটা তুলে নিলেন কবি পি. মুখোপাধ্যায়। তার মানে অন্তর্দৃষ্টি।

আমি ডিফাইন করতে পারবো না। মনে হবে—এই তো কে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তুলেছি যেই—অমনি সব মুছে গেল।

ওই তো—ওই একই—সেই অন্তর্দৃষ্টির কথা বলছেন আপনি। শুনেছি—জীবনানন্দের ছিল। উনি নাকি দেখতে পেতেন। ভালোই তো—আপনি যদি দেখতে পেয়ে থাকেন—

এই কবিতাটা দেখুন।

দেখেছি আমি সব। আপনি কি কলেজ লাইফে পদ্য লিখতেন?

না। আগে কোনদিন লিখি নি পরিমলবাবু। এই পদ্যটা—বলেই দেবকুমার বসু আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল—

বাতাসে সে আসে ঘনঘন
ভাসে সে বাতাসে যখন তখন
দৃষ্টি বিঁধলেই সে শুধু বাতাস
নীরেট বাতাসে থাকে না কোন জলছবি
আনত চোখের ওপারেই সে শুধু ভাসে
ঘন বাতাসেই ঘনিয়ে ওঠে
আসে এবং ভাসে আনত চোখের এক পর্দা বেফাঁসে

কবি পি. মুখোপাধ্যায় চোখ বুজে ফেলেছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, কাছেই তো থাকেন। কয়েকটা পদ্য কপি করে দিয়ে যাবেন। আমরা পড়ে দেখবো। একটু কারেকশন করলে তো কোন আপত্তি নেই আপনার? আমরা অদল-বদল করে ছেপে দেব।

দেবকুমারের গলা সরল হয়ে এলো। এই বয়সে কেউ কি কবি হতে পারে স্যার?

পারবে না কেন? সর্বসময়—সবই হয়। পল গঁগার কথাই ভাবুন না। মোটা মাইনের চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দিয়ে কোন্ বয়সে তিনি ছবি আঁকতে লেগে গেলেন—সেই কোন্ সুদূর তাহিতি দ্বীপে—

আমি গঁগার চেয়ে ছোটোই হবো স্যার।

গঁগার নাম শুনেছেন তো?

পড়েছি ওঁর লাইফ পেপারব্যাকে। আমার তো এখনো পঞ্চাশ হয় নি।

কবি পরিমল চমকে উঠে সোজাসুজি তাকালেন। কি বললেন?

আমি গঁগার সেই সব ছেড়েছুড়ে দেওয়ার বয়সে এখনো পৌছাই নি পরিমলবাবু।

কত বয়স আপনার?

সাতচল্লিশ চলছে।

কি বলছেন আপনি? পরিমল মুখোপাধ্যায় উঠে দাঁড়ালেন। অ্যাঁ—?

হ্যাঁ স্যার। আমি নাকি হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছি।

হঠাৎ?

হ্যাঁ। সবাই তো বলছে তাই। এই কমাস হোল শুনছি। অবিশ্যি আমি নিজে কিছু ধরতে পারছি নে। রাস্তার লোকজন—অফিস—বাড়ির সবাই বলছে।

পরিমল মুখোপাধ্যায় যেন ভয় পেয়েই আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন। নির্জন বসার ঘরে কবির পোড়ামাটির ঘোড়ার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। পি. মুখার্জি সেই গুড়াকু মাজনের কৌটোটা থাবা দিয়ে খপ করে ধরলেন। কচ করে কৌটোর মাথা

ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন। একটা আঙুলে মাজন তুলতে তুলতে বললেন, গোড়া থেকে খুলে বলুন তো। একদম পরপর বলবেন সব। কিচ্ছু বাদ দেবেন না কিন্তু। অবিশ্যি আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

আপত্তি কেন থাকবে। এই অব্দি বলে দেবকুমার লক্ষ্য করলো, কবি পি. মুখার্জী তাঁর সোফায় একদম গেঁথে বসে গেছেন। যেন কোন ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার জন্যে প্রায়-চল্লিশ মানুষটি গুড়াকুতে ঘষঘষ করে দাঁত মেজে যাচ্ছেন।

এই তো ক'মাস আগে—বেশি দিন হয় নি—একদিন ঘুম থেকে উঠেছি। আমি তখনো কিছু বুঝতে পারি নি। প্রথম চোখে পড়ি—বা বলতে পারেন প্রথম ধরা পড়ি—আমার ছেলের চোখে—

কত বড় ছেলে ?

প্রথমে মেয়ে—তারপর একটিই ছেলে আমার। ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার কথা আজ। রাজু আমায় দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো—এ কি বাবা ?

দেবকুমার থমকে গেল। সে তার ছেলের প্রশ্নটা এত জোরে চেঁচিয়ে বলে ফেলেছে যে কবি পি. মুখার্জি পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তবু তার ভেতর কবি পরিমল তাঁর সুস্থির ভাবটা একটুও হারালেন না। দাঁতে মাজন ঘষতে ঘষতেই বললেন, তারপর ?

তারপর আর কি ! সেদিন সকাল থেকেই আমি একদম ধড়াস করে বুড়ো হয়ে পড়লাম। সারা পৃথিবীর চোখে—

সেদিন ডায়রি হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হোল—আমি একজন কবির সামনে এতক্ষণ মুখোমুখি বসেছিলাম। বড় রাস্তায় পড়ে দেবকুমারের আচমকাই মনে হোল, এতদিন তো আমি অনেকটা সময়ই হেলাফেলায় কাটিয়েছি। যদি আগাগোড়া একটানা

কবিতা লিখে আসতাম—তাহলে হয়তো আমিও আজ গুড়াকু কিংবা ওরকম কোন কিছু দিয়ে খানিকক্ষণের ঝিমধরা ভাব নিয়ে আসতে পারতাম দাঁত মেজে।

অফিসেই যাই—তেবে সত্যি সত্যিই অফিসে চলে এলো দেবকুমার বসু।

॥ ছয় ॥

রাজু কোনদিন রিডিং পড়ে না। দেবকুমার কয়েকবার বলেও দেখেছে। রাজুর সেই এক কথা। আমি মনে মনে পড়ি বাবা। বিরক্ত কোরো না। এইভাবেই রাজু এইট থেকে নাইনে উঠলো। থার্ড হয়েছে। অংকে মাত্র উনচল্লিশ পেয়েও থার্ড। বালি কাগজে বই মুড়ে মুড়ে দিচ্ছিল দেবকুমার আর রাজু সেই মলাট দেওয়া বইয়ের পুস্তানীতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে যাচ্ছিল—দিজ বুক বিলংস টু……

তোদের স্কুলে বুঝি খুব বই চুরি হয়?

মোটেও না।

তবে ওসব লিখছিস কেন?

লিখতে হয় তাই। সাবধানের তো মার নেই। বলতে বলতে দেবকুমারের দিকে তাকালো রাজু। ওকি বাবা! তুমি তো থেবড়ে বসে গ্যাছো। অফিসে যাবে না?

তুই স্কুলে যাবি নে?

আমাদের তো জানুয়ারি মাস। সরস্বতী পুজো, নেতাজী বার্থ ডে পার করে দিয়ে রিপাবলিক ডে-র পর পড়াশুনো শুরু হবে। তুমি যাবে না অফিসে?

যাবো। তোর মাকে দেখছিনে যে—কোথায় গেল?

কাছেই কোথাও গেছে। এসে যাবে এখন।

উঁহু। কাছাকাছি তো যায় নি। ওই তো বাইরে বেরোবার শাল নিয়ে গেছে দেখছি—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার। রাজু কিছু বললো না। মায়ের বারণ আছে। সে জানে তার মা

এখন কোথায়। ঋতু মাসীর বাড়িতে। মর্নিংয়ে একটা ক্লাস হয়। সেখানে মা কি সব শেখায়। ব্লাউজের হাতার হেম সেলাই। কোনদিন বা পেঁপের চাটনি। একদিন সেই প্ল্যাসটিক না কি চাটনি রাজুর জন্যে এনেছিল। খেয়ে বেশ লেগেছিল রাজুর। বাড়িতে এমন করো না কেন মা ?

তোর বাবা সেরে উঠুক—তখন করবো।

রাজুর পরিষ্কার মনে আছে—সে জানতে চেয়েছিল—বাবার অসুখটা কি মা ?

ডাক্তারের কাছে গেলে তো জানতে পারবো। শুধু শুধু বুড়িয়ে যাচ্ছে। হাড়ে ঘুণ ধরে থাকবে হয়তো।

ভাল ভাল রান্না করলে তো অসুখ সারে মা। ভালমন্দ খেতেও ভালবাসতো বাবা।

আমাদের ভালো সময় পড়ুক—তখন সারাদিন রাঁধবো।

সেদিন দেবকুমার তখনো বাড়ি ফেরে নি। ঠিক অ্যান্নুয়ালের আগে। রাজু জানতে চেয়েছিল—তোমার এসব সেলাই রান্না কারা শেখে মা ?

অনেকে। যারা তোর ঋতু মাসীর ইস্কুলে আসে।

তারা কারা ?

বড়লোকের সোহাগী বউ ঝি-রা। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ নেই যাদের। ইংরিজী বোলচাল দু'চারটে শেখে। সেই সঙ্গে লেসের কাজ। প্লাসটিক চাটনি।

তুমি শিখলে কি করে মা ?

আমি! আমি এমনি শিখেছি। তোদের বাবা তো আগে খুব শৌখিন ছিল!

এখন আর নেই কেন ?

আমিও তো তাই ভাবি। ঋতু মাসীর স্কুলের কাজটার কথা কিন্তু বলিস নি রাজু। শুনলে তুলকালাম করবে। তোকেও

পড়েশুনে বড় হতে হবে রাজু। তোর বাবার এ চাকরিবাকরি যে কতদিন টিঁকবে কেউ বলতে পারে না। এইটুকু বলে বাকিটা ছেলের কাছ থেকে চেপে গিয়েছিল শেফালী। কী দরকার অ্যাত্‌টুকু ছেলের মনটা খারাপ করে দিয়ে—তাও আবার ঠিক অ্যানুয়ালের আগে আগে—।

ভুলো ভুলো করে তেল মেখে চান করে এলো দেবকুমার। মাথা আঁচড়ে দেখলো, রাজু তখনো মন দিয়ে লিখে যাচ্ছে—দিজ্‌ বুক বিলংস টু……

একা কোনদিন খেতে বসতে পারে না সে। তাই আস্তে রাজুকে বললো, আয় আমার সঙ্গে খাবি।

তুমি খেয়ে নাও বাবা। আমি চান করি নি। সবই তো ঢাকা দিয়ে গেছে মা।

শীতের বেলাবেলি একা একা খেতে বসে দেবকুমারের আরও একা লাগলো নিজেকে। ঘরের ভেতরে রোদ নেই। আলো জ্বালিয়ে সে নিজে—বসুজ ইটিং লজের এক নম্বর বোর্ডার খেতে বসলো। খাওয়াদাওয়ার পর আবার অফিস। সেদিনকার মত না হয়ে যায়! ক্যাজুয়াল তো ফি বছর পচে যায়। নেওয়া হয় না। রাজুর রেজাল্ট বেরুনোর দিন কবি পরিমলের ওখানে গিয়েছিলাম। আমি যে চোখের এক পর্দা ওপাশেই কে যেন দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাই—কবি বলেছিলেন—ওঃ! অন্তর্দৃষ্টি! আমি অবিশ্যি তা বলি নি। পি. মুখার্জীর ওখান থেকে বেরিয়ে অফিসে গিয়েছিলাম।

ওঃ! কেন যে গেলাম। আমার তো অনেক ছুটি পাওনা ছিল। ডাল ঢেলে ভাত ভাঙলো দেবকুমার।

সেদিনের অফিস অন্যদিনের চেয়ে একদম অন্যরকম ছিল। দেবকুমার পরিষ্কার তার ঘরে গিয়ে বসলো। যদিও সেদিন তার চান খাওয়া হয় নি। কারণ কবি পি. মুখার্জীর সঙ্গ করে সে সেখানে

অনেক কবিতা খায়। শরীর মন—দুই-ই রীতিমত চাঙ্গা ছিল। একবার শুধু মনে হয়েছিল—শেফালীকে আলু পেঁয়াজকলি ভাজতে বললাম—ভাজলোও—অথচ কী সব কথা বললো—যাতে একদম মুখটা বিড়িয়ে গিয়ে খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেল।

চেয়ারে বসেছি—এমনি সময়ে সেই অমিয় সাঁতরা এসে ঘরে ঢুকলো। স্যার, এই তিনখানা ফাইল জানলায় পাওয়া গেছে।

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। যেন জানলাতেই ফাইল রাখা হয়। তাই গোড়ায় বুঝতে পারি নি। তাছাড়া এই অমিয়রাই তো চেয়ারে পা তুলে গপ্পালি করে। আমার নাকি ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরেছে।

ঘচ্ করে সব মনে পড়ে গেল। কি বলছো অমিয়! জানলায় কেন ফাইল থাকবে?

তাই ছিল স্যার। আপনি হয়তো—বলতে বলতে মাথার পিছনে হাত রাখলো অমিয়।

কি বলতে চাইছো?

হয়তো কাউকে ডেকে পান নি—

মুখের কথা কেড়ে নিলাম। কাউকে না পেয়ে জানলার তাকে ফাইল রেখেছি! আমি জানি না—একটা ধাক্কা খেলেই ফাইলগুলো নীচে রাস্তায় গিয়ে পড়বে? কি ভেবেছো? বলে ফাইল তিনখানা কেড়ে নিলাম। কবে কবে আউট ট্যাগ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি—তারিখ তো মনে নেই। সত্যিই তিনখানার গায়ে পুরু ধুলো।

একটা কথা মনে পড়লো। অমিয় সাঁতরারা কোনরকম ফাউল প্লে করছে না তো? আমার পাঠানো ফাইল ঘুরিয়ে এনে ধুলো মাখিয়ে হাজির করে নি তো?

একদম ধুলো না ঝেড়ে ফাইল তিনখানা নিয়ে ডেপুটি জি. এম-এর ঘরে গেলাম। ঘর ফাঁকা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রবিদার

কাছে গেলাম। সেও নেই। রবিদার খাস বেয়ারা বললেন, বাবু খেলা দেখতে—

ওঃ। আমিই তো শুধু খেলা দেখতে যাই না। সারা অফিসে আমার লেভেলের লোকজন এখন নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। র‍্যাকেট থেকে ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ার থেকে র‍্যাকেটে। চোখের ব্যায়াম করে যাচ্ছিল ডি জি এম। এ জি এম। এম ডি। সবাই।

আর আমি। এই থার্ড ফ্লোরে অন্ধকার—শীতে শিরশিরে করিডরে দাঁড়িয়ে আমি। আশেপাশে কেউ নেই। হঠাৎ মনে পড়লো, রাজু আর দাবা খেলে না কেন? শেফালী কি বোঝালো ওকে?

দেবকুমার এখন কইমাছে চলে এসেছে। সাবধানে ভাত মেখে পরিষ্কার তার মনে হোল—অমিয় সাঁতরা নিশ্চয় তার সঙ্গে ফাউল প্লে করেছিল। সে কেন শুধু শুধু জানলার তাকে ফাইল রাখবে। এখানে তো কেউ ফাইল রাখে না। ফাইল যদি আত্মঘাতী হতে চায় তবেই তো ওখানে গিয়ে ঝুঁকে বসে থাকবে। একটা বাতাস উঠলেই উড়ে গিয়ে নীচে পড়বে। অবিশ্যি ফাইলের যদি কোন মন থাকে। কিন্তু ফাইলে তো থাকে আমাদেরই নোট। নোটের পর নোট।

এই রাজু। খাবি আয়।

তুমি খেয়ে নাও বাবা। পান সেজে দেবো?

দে—বলে নিজেকেই দেবকুমার বললো, এত বাধ্য হয়ে উঠছে কেন রাজু? এত আঠা কেন পড়াশুনোয়? শেফালী কী বুঝিয়েছে ওকে? আমিই কি ওকে খেলার জগৎ থেকে সরিয়ে এনেছি? আমিই দায়ী?

রাজু?

কি বাবা?

একবার ভেতরে এসে শুনে যাও—বলে খাওয়া থামিয়ে ওয়েট

করতে লাগলো দেবকুমার। তখনই তার মনে পড়লো, অসিত কি অমিয় সাঁতরাদের কিছু শিখিয়ে দিয়েছে? তাকে ডিসক্রেডিট করার জন্যে? কিন্তু অসিতের কি গেইন হবে তাতে? অবিশ্যি শেষবার অসিত তার টেবিল থেকে উঠে যাবার সময় দাঁতে দাঁত ঘষে বলে গিয়েছিল, আচ্ছা, আমিও দেখে নেব।

শত্রুতা জিনিসটা মানুষের রক্ত, হাড়, মজ্জায় মিশে আছে। একটু ঘষা খেলেই তা বেরিয়ে পড়ে।

কি বাবা? পান দেব?

না। পান দিতে হবে না তোমায়। তোমার মা কোথায়?

জানি না তো।

তোমায় বলে যায় নি?

না বাবা। তুমি ওঠো। আমি এঁটো তুলে দিচ্ছি।

ধমকে উঠলো দেবকুমার। এসব তোমায় কে করতে বলেছে? তোমার মা? আমি তো অসুস্থ নই। চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। পান দিতে হবে না তোমায়। তোমার মা এসে সেজে দেবে।

রাজু তটস্থ হয়ে দাঁড়ালো।

তোমায় ডেকেছি কেন বল তো বাবা?

রাজু মাথা নাড়লো।

তুমি আজকাল দাবা খ্যালো না কেন বাবা?

এ কথায় রাজুর চোখ ছলছল করে উঠলো। ঠোঁটও একটু কাঁপলো। তুমি আজ অফিসে যাবে না?

তোমার তো নতুন ক্লাস। তুমি তো গেলে না রাজু?

আমাদের এখন রিপাবলিক ডে অব্দি বিশেষ পড়াশুনো হয় না।

তাহলে খেললে পারো। দাবায় তো তোমার নেশা আমি জানি। তবু খেলো না কেন? কে বারণ করলো তোমাকে?

রাজু কোন জবাব দিল না। মনে মনে শুধু বললো, তুমি আগে

ভালো হয়ে ওঠো তো বাবা। তারপর সব খেলবো। এসব কথা নাকি রুগীকে বলতে নেই। বললে অসুখ আরও খারাপের দিকে চলে যায়। তাইতো মা বলে। মায়ের কথায় আজকাল বাবার জন্যে খারাপও লাগে রাজুর। এক এক সময় মায়ের কথায় বাবার জন্যে কোন মায়া থাকে না। তখন মায়ের মুখখানা রাজুর কাছে একদম অন্ধকারে পড়ে থাকা কয়লার চাঙ।

রোজ এক ঘণ্টা করে দাবা খেলবে রাজু। দাবায় তোমার ট্যালেণ্ট—বলেই দেবকুমার মুখ ধুতে উঠে গেল। আঁচাবার সময় বুঝতে পারলো, রাজু কেমন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে—এইভাবেই রুণুও দূরে সরে গিয়েছিল। ওরা ছোটো থাকতে বেশ কোলে উঠতো। যেই বড় হচ্ছে—দূরে সরে যাচ্ছে। একটু বাড়লেই ওরা দূরে চলে যায়। চলে যায়।

তোয়ালেতে মুখ মুছে দেবকুমার এসে বসুজ ইটিং লজের টানা লাল বারান্দায় সব সময় পেতে রাখা বেঞ্চটায় বসলো। শীতের দুপুর শুরু হয়ে গেছে। এই সময় হাত পা টান করে ভেতরকার হাড়ের মট মট শুনতে দেবকুমারের খুব ভাল লাগে। পরপর দুবার মট মট শুনে দেবকুমার বললো, তোমার মা তো আসে নি। আর কত বেলা করবে?

আমার খিদে পায় নি বাবা।

শীতের বেলা পড়ে গেলে আর খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছে থাকবে না রাজু।

অসুখটা হবার পর থেকে বাবাকে এমন বন্ধু করে পায় নি অনেকদিন। তাই অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী খলবলে হয়ে উঠলো রাজু। জানো বাবা—মৃত্যুর আগে নাকি খাওয়ার ইচ্ছে বেড়ে যায়। হ্যাঁ। মৃত্যুর আগে কিছুদিন খুব খিদে হয়।

এসব তুমি শুনলে কোত্থেকে?

হ্যাঁ বাবা। আমাদের ড্রিল স্যার মরে গেলেন তো।

মরে গেছেন নাকি ? বলো নি তো।

আজকাল তুমি আমার কথা কত শোন। ড্রিল স্যার নাকি মদ খেতেন।

তুমি শুনলে কোথায় ?

একদিন নিজেই আমাদের বলেছিলেন। স্কুল থেকে পিকনিকে নিয়ে গেলেন আমাদের। ড্রিল স্যার সেখানে ঝোলসুদ্ধ অনেক মাংস খেলেন। সবাই খেয়ে বেশী হয়েছিল তো। সবটা খেলেন। ভূগোল স্যার কি বলতেই ড্রিল স্যার বললেন—আমার তো লিভার খারাপ। মরে যাবো শীগ্‌গির। এখন কিছুদিন খুব খিদে থাকবে আমার।

ড্রিল স্যার মারা গেলেন কবে ?

তা এক বছর হয়ে গেল।

পিকনিকে গিয়েছিলে কবে ?

স্যার মারা যাবার বছর দুই আগে প্রায়।

ধমকে উঠলো দেবকুমার। মৃত্যুর আগের কিছুদিন—অতদিন ধরে হয় না। তোমরা বোকা! তাই তোমাদের বোকা বানিয়ে গেছেন ড্রিল স্যার।

তা কি করে হয় বাবা ? মৃত্যুর আগে কেউ কি বোকা বানিয়ে যায় অন্যদের ? বোকা কি চালাক—সে তো আর দেখতে আসবে না।

হয়েছে। আর পাকা পাকা কথা বলতে হবে না। তুমি খেয়ে নেবে এখন। তোমার মা এলে আমি একটু বেরোবো। বাড়ির ভেতর শীত করছে খুব।

তার মানে তুমি অফিসে যাবে না। মানে যেতে চাও না।

দেবকুমার সরাসরি তার নিজের ছেলের চোখে তাকালো। এই এতক্ষণ এত বুদ্ধিমান এই ছোট মানুষটির চোখে সে তাকাতে পারে নি। না। এখন আর অফিসে যাবো না রাজু।

তুমি কিন্তু আজকাল ঠিকমত অফিসে যাও না।

দেবকুমার কঠিন হতে গিয়েও পারলো না। এসব তোমায় কে বলে ?

মা। বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রাজু। হাতে কাগজ কাটার কাঁচি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কাঁচির এক কান আটকে গিয়েছিল। কোনমতে আঙুল বের করে দু'হাতে চোখ ডলতে লাগলো রাজু।

দেবকুমার কাছে এগিয়ে এসে মাদুরের ওপর ছেলের পাশে বসলো। তারপর রাজুকে জড়িয়ে ধরলো।

তুমি কেন ডাক্তার দ্যাখাও না বাবা ?

দূর পাগল ! শুধু শুধু ডাক্তারের কাছে যাবো কেন ? তোমায় আর খেতে হবে না এখন। চল আমরা দুজনে একসঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবো। তোমার মা এলে তবে বেরুবো।

লেপের ভেতরে শুয়ে শুয়েও রাজু কুইকুই করে কাঁদলো। কেন ডাক্তার দ্যাখাচ্ছো না বাবা ? আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি—সকালবেলায় তুমি বুড়ো হয়ে গ্যাছো।

সব কথা পরিষ্কার করেও বলতে পারছিল না রাজু। কাঁদছিল। ফোঁপাচ্ছিল। লেপের ভেতর হাত দিয়ে দেবকুমার দেখলো, তার ছেলের ছোট বুকখানা চাপা কান্নায় আর কথায় ঢিপঢিপ করছে ভেতরে ভেতরে।

আর কথা বলতে হবে না। এবার ঘুমোও তো একটু।

আমার নতুন বইটই সব পড়ে থাকলো মাদুরে—

তোমার মা এসে তুলবে। এখন ঘুমোও। কতদিন একসঙ্গে শুই না আমরা রাজু।

হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজু বললো, সেদিন সকাল হবার আগেই তুমি রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেলে—

ধমকে উঠলো দেবকুমার। ফের কাঁদে ? চোখ বোজ বলছি।

বুড়ো হয়েছি তো হয়েছে কি তাতে ? এই তো বুড়ো হবার বয়স রাজু।

না বাবা ! আমি জানি, এখনো তোমার বুড়ো হবার বয়স হয় নি।

আর কাঁদতে হবে না। ঘুমোও তো একটু। এখন থেকেই তো বুড়ো হয় লোকে। ঠিক আমার এই বয়স থেকেই। মৃত্যুর আগে অব্দি বুড়ো হওয়া চলতে থাকে।

লেপের ভেতরেই বেঁকে উঠে বসতে চাইছিল রাজু। না বাবা। অতদিন ধরে মৃত্যুর আগে অব্দি কেউ বুড়ো হয় না।

হয়। হয়। তুমি জানো না রাজু। সব বাবাই তো মৃত্যুর আগে কিছুদিন ধরেই বুড়ো হতে থাকে।

এই উলটো-পালটা কথার ভেতরেও রাজু আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠলো। ফাঁকা বাড়ি। শেফালী এখনো ফেরে নি। দেবকুমার চমকে উঠলো। রাজু তখন বলছিল—তুমিই তো একটু আগে বললে—মৃত্যুর আগের কিছুদিন—অতদিন ধরে হয় না—!

বলেছি নাকি। ঘুমোও। আমি আর চোখ চাইতে পারছি না রাজু।

ঘুম ভাঙলো একটা অদ্ভুত সময়ে। বাপ ব্যাটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেবকুমার চোখ খুলে ছাখে—রাজু গভীর ঘুমে। খাবার টেবিলের থালা বাসন সাফ। এঁটো তোলা সারা। অর্থাৎ শেফালী ফিরে এসে খেয়ে নিয়েছে। পাছে তাদের ঘুম ভাঙে তাই একটুও শব্দ করে নি।

পা টিপে টিপে উঠলো। বসুজ ইটিং লজের দু'নম্বর বোর্ডার গলা অব্দি কাঁথা টেনে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। পাশেরই ঘরে। শীতের পড়ন্ত দুপুরে বাড়ির ভেতরে কোথাও একটু রোদ্দুর এসে পৌঁছায় নি। কলতলায় উপুড় করা ডেকচির টপে এক ফালি নিংড়োনো লেবু। কোন উৎসাহী কাকের কাজ। রাজুও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সারা পাড়ার গৃহকর্তারা এখন যে যার অফিসে। অনেকেই চল্লিশ পার হবার পর সব রকম ইমাজিনেশন হারিয়ে যে যার অফিসের টেবিল চেয়ার মনে মনে চাটে। কেন না, আর তো রিটায়ারের বেশী দেরি নেই। দশ বারো বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। যেমন কেটে গেছে পেছনের বিশ বাইশ বছর। আমি এর বাইরে—এ কথাটা মনে মনে বলে দেবকুমার নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

এই বেরোবার মুখে বাড়ির সদর দরজার আগে আরেকটা দরজা পড়ে। দিনের বেলাতেও সেখানটা প্রায় অন্ধকার। সেখানে তাকিয়ে দেবকুমার বারান্দায় আটকে গেল।

এটা কি আমার শরীরের ভেতরকার কোন উইকনেস ? কিংবা সত্যি সত্যিই যদি অমিয় সাঁতরাদের কথামত হাড়ের ভেতরে ঘুণ ধরে থাকে। মাত্র দু'হাতের ভেতর ডালপালা করে ছড়ানো শিং মাথায় হরিণটা দাঁড়িয়ে। চুনে হলুদ লোমে ঢাকা চামড়া এসে চোখের নীচে শেষ। সেখানে প্রায় চোখের মণি অব্দি ভেলভেট করে কাজল। পুরু করে লেপা।

হরিণের চোখে তাকিয়ে দেবকুমারের চোখ তিরতির করে কেঁপে গেল। একটা ছুটন্ত তীর কোথাও বিঁধে গিয়ে এমনি করেই কাঁপে। তখনই হরিণটা দেবকুমারকে শুধুই চোখ দিয়ে বললো—কি ? কেমন কিনা ! আমি আগেই বলি নি ?

কি বলেছিল হরিণ—তার কিছুই মনে পড়লো না দেবকুমারের। বরং মনে পড়লো, কবি পি. মুখার্জী বলেছিলেন—এই ব্যাপারেই বলেছিলেন—অন্তর্দৃষ্টি, যা কিনা আমার কবিতায় এইভাবেই সেদিন এসেছিল।

চোখের এক পর্দা ওপাশেই
একদম বেফাঁসে
আসে এবং ভাসে

পাছে এখুনি বাড়িওয়ালাদের কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এই অবস্থায় হরিণকে দেখে ফেলে—তাই হরিণকেই বাঁচাতে সে সিধে দরজার ওই আবছা কোণে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কোথায় হরিণ? নির্জন বাড়িতে আর নির্জনে দেবকুমারের আছাড়ের শব্দটা শুধু দরজার পাল্লাকে দু'বার দোলালো। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে দেবকুমার ধুলো ঝাড়লো। আমাদের চোখের একটু ওপাশেই এক সময়কার চেনাশুনো চলন্ত জিনিসপত্র—মানুষজন বাতাসে গা মিলিয়ে থেমে যায়—নিঃশব্দে তারা ভেসে উঠলে রেকগনাইজ করা দরকার। এই হরিণ বড়ই আত্মাভিমানী এবং আত্মঘাতী। দেখা যায়—এমন কোন বাতাস যদি ঢেউ তুলে মোচড় খেয়ে তার একটা ঢেউয়ের মাথাকে পাতালে ঝাঁপ দিতে দেয়—তাহলে তাতে যে বিষাদ আনন্দের হাত ধরে আত্মঘাতী হয়—তেমন ভঙ্গীতেই এই হরিণ দেখামাত্র ভেসে উঠেই সদাসর্বদা ঝাঁপ দেয়।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তেই দেবকুমার বস্তু হাঁটছিল। ছায়াগোলা রোদ্দুরে কলকাতা এখন আরামপ্রদ। ঠিকে ঝিরা কলাই থালায় ভাত ঢেকে পোড়া বস্তিতে ফিরছিল। এদের ভেতর কে আবার তাকে দেখে চিপ কেটে হাসবে—তার ঠিক কি! দেবকুমার জোর কদমে বড় রাস্তায় চলে এলো। তৃপ্তি তো একের নম্বরের ব্যাপিকা। কোথায় কোন্ কথা ছড়িয়ে বসে আছে।

ট্রামগুলো বেশ ফাঁকা। পাতাল রেলের দরুন সব এখন ময়দানের ওপাশটা ঘুরে এসপ্ল্যানেড্ ধরে। দেবকুমারকে লাফিয়ে উঠতে দেখে কণ্ডাক্টর পর্যন্ত পাদানীতে ছুটে এলো। বয়স্ক কণ্ডাক্টর। বিড়বিড় করে বললো, আপনারা যদি এভাবে ওঠেন—

কোন কথা না বলে জানলার সিটে গিয়ে বসলো দেবকুমার। খানিকক্ষণ বাদে একটা বড় মাঠের এপার থেকে ওপারের আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোর ছবি ফুটে উঠলো। এই হোল গিয়ে কলকাতা।

দেবকুমারের বাঁ হাতে তখন নতুন হাওড়া ব্রিজের কঙ্কাল। গাছপালায় ঢাকা নিষ্পাপ ফোর্ট উইলিয়াম।

ধর্মতলার ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে দেবকুমার এলিটের গায়ে মসলা পাড়ায় এসে পড়লো। লোকে লোকারণ্য। এইখানেই কোথাও রানী রাসমণির বাড়ি। এক সময় তো এখানটায় কোথায় উমা দাস লেনে ধুকুড়িবাজার নামে বেশ্যাপাড়াও ছিল। কোথায় গেল পাড়াটা? এ যে একদম উঠে গেছে। গাদা গাদা লরী। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি সারি সারি।

লাইট পোস্টে পাকাপোক্ত লটকানো কালো এক সাইনবোর্ডে চোখ আটকে গেল। সাদা সাদা হরফে প্রাচীন গুপ্ত রোগের চিকিৎসার কথা। তার দাওয়াই। এক্সপার্ট ডাক্তারের নামের শেষে এক গাদা ডিগ্রী। গোপনতা বজায় রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। একেবারে শেষে ফোন নম্বর।

দেবকুমার ঠিকানা দেখে ঢুকে পড়লো। অন্ধকার সিঁড়িতে সব সময় আলো। দোতলায় উঠে তো তাজ্জব। একদম নন্দনকাননের পারিজাত বন। একতলাটা কলকাতার জঞ্জাল দিয়ে ঘেরা। অথচ দোতলায় ধুলো খুঁটে খুঁজে বের করতে হবে। হালকা নীল মোজাইকের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ইলেকট্রিক আলো।

ডাক্তারবাবু ছিলেন। বিশেষ ভিড় নেই। বেশ রিঅ্যামিওরিং চেহারা। হেসে বসতে বললেন। তারপর একটা ফর্ম এগিয়ে দিলেন। আগে ফিল-আপ করুন।

আপনি বাঙালী?

হ্যাঁ। টাইটেল দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন? 'কাবাসি' পদবি তো মেদিনিপুর বাঁকুড়ায় হয়।

নাম, ঠিকানা, বয়স লিখে ফর্মটা এগিয়ে দিল দেবকুমার। সে জানতো, কোথায় গিয়ে ডাক্তারবাবুর চোখ আটকাবে। আটকালোও তাই। ডাঃ কাবাসী চোখ তুলে বললেন, আপনি সাতচল্লিশ?

হ্যাঁ স্যার। এইটেই আমার রোগ। আমি নাকি আচমকাই বুড়ো হয়ে গেছি। অথচ ইচ্ছে করলে আমি সাতচল্লিশের মতই চলাফেরা করতে পারি।

সাতচল্লিশ যদি বয়স হয়ে থাকে—তো সাতচল্লিশের মতই করবেন।

আমার এখনো পুরো সাতচল্লিশ হয় নি ডক্টর। এখনো তিন মাস বাকী। কিন্তু লোকজনের মুখে মুখে শুনে—তাদের কথার সঙ্গে চাউনির সঙ্গে মিলমিশ করে আমি তো চুয়াত্তর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাস থেকে ধীরে সুস্থে একদম টুপ করে নেমে পড়ি স্যার।

বলুন খসে পড়েন—বলেই ডাক্তার কাবাসি হো হো করে হাসলেন।

এইটেই আমার অসুখ স্যার।

কোন ভাবনা নেই। জেনারেল ডিজিজের তিন হাজার ভ্যারাইটি আছে। সাউথ সি আইল্যাণ্ডের এরকম ধাঁচের পেশেণ্টের কেস হিস্ট্রি আমরা পেয়েছি।

জেনারেল ডিজিজ কি ভি ডি স্যার?

হুঁ। নানা রকমের ম্যালিমেনটেশন তো হয়। গায়ের কোথাও নীলচে চামড়া কেটে ফেটে গেছে?

আজ্ঞে আমার তো কোনদিন ভি ডি হয় নি। ওসব চামড়া আমার গায়েও নেই কোথাও—বলতে বলতে দেবকুমারের শরীর সিরসির করে উঠছিল। বাইরে কলকাতায় এখন মানুষের নদী। চিৎকার। লরী। প্রাইভেট। ট্রাম। ডবল-ডেকার। আর এখানে আমার গায়ের চামড়া নীল হয়ে ফেটে যাচ্ছে।

মনে করে দেখুন না। কখনো কোথাও ঘনিষ্ঠ হন নি?

আজ্ঞে আমার তো মনে পড়ছে না। আর ঘটলে তো মনে পড়বে। আমি শুনছি—আমার নাকি একদম ভেতর থেকে—ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে।

এ-রোগে শেষমেষ আসলে তাই-ই গিয়ে দাঁড়ায়। আমরা লুকিয়ে যাই বলেই এ অবস্থা হয়। মান-সম্মান। জানাজানি। লোকলজ্জা। তারপর অনেকদিন পরে একদিন—

চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার। নেভার—নেভার।

ডাক্তার কাবাসি তখনো ধারা বিবরণীর ঢঙে বলে যাচ্ছিলেন। একদিন আচমকাই সব ফুটে বেরোয় মিস্টার বাসু। আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা তো রয়েইছি। আপনি চোখে কেমন দেখেন?

বয়স আন্দাজে যেমন দেখার তেমন দেখি।

কোন্ বয়সটা মিস্টার বসু? ফট্টি-সেভেন অর চুয়াত্তর?

দেবকুমারের সন্দেহ হোল। ডাক্তারের ছদ্মবেশে এই লোকটি তার সঙ্গে অমিয় সাঁতরার মত ব্যবহার করছে না তো। যাকে বলে ফাউল প্লে।

আমি তো বললাম—আমি চুয়াত্তর নই।

কিন্তু আপনি তো তাই হয়ে আছেন।

সেজন্যেই তো আপনার কাছে আমার আসা। আমি ফট্টি-সেভেন।

আপনার ছেলেমেয়েরা নর্মাল?

অ্যাবসলিউটলি। হোয়াট ডু ইউ মিন?

আপনার ওয়াইফ? তার কোনরকম ম্যানিফেস্টেশন?

খুব একরোখা।

উঁহু। বলছি নে। কোনরকম উইকনেস? হাত-পা ধরা। গাঁটে গাঁটে পেইন। মাথার সামনের দিককার চুল উঠে যাওয়া? সে সব কিছু হয় নি তো?

আপনি কি বলতে চান ডাক্তারবাবু? আমি কোনদিন কোন খারাপ জায়গায় যাই নি।

গোড়ায় এসে সবাই ওরকম বলে। আপনার গায়ে কখনো চুলকুনি বেরিয়েছে, যাতে কিনা কোনরকম চুলকুনি থাকে না ?

ঘাবড়ে গেল দেবকুমার। চুলকুনি থাকবে—অথচ চুলকুনি থাকবে না—এর মানে কি ? আপনি কি ফাউল প্লে করতে চাইছেন আমার সঙ্গে ? খুলে বলুন।

এরকম তিড়বিড়ে সন্দেহ বাই এ রোগের লক্ষণ। আমি মশাই অর্ডিনারি চুলকানির কথা বলি নি।

তবে ?

এ চুলকুনিতে চুলকোয় না। গোটা উঠে গোড়ায় গোড়ায় মিলিয়ে যায়। কোন ব্যথা বেদনা থাকে না।

সেরকম হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না ডাক্তারবাবু।

হয়তো হয়েছে। আপনি খেয়ালই করেন নি। কোন কোন কেসে তিরিশ বছর পরে দেখা দেয়—মানে ফুটে ওঠে। ততদিনে হাড়ে ঢুকে যায় !

ঘুণ ধরে যায় ? বলেই নিজের গলা শুনতে পেল দেবকুমার। ঠাণ্ডা অফিস ঘর। চিকচিক করছে আলো। কসাইখানার চেয়েও ঠাণ্ডা। নির্জন।

যেতে পারে। যাওয়ারই কথা মিস্টার বাসু।

কিন্তু আমি তো ওসব কিছুই করি নি।

আপনার ওয়াইফের ?

অসম্ভব ডাক্তারবাবু।

আপনার বংশে ? কিংবা আপনার ওয়াইফের বংশে ?

তাও ইমপসিবল।

ভালো করে মনে করে দেখুন দেবকুমারবাবু।

খুব পেছনের দিকে কিছু ঘটে থাকলে তো আমি জানতে পারবো না। তবে আপনারই কথামত যদি খুঁজে দেখতে হয়—তাহলে তো আমার বা শেফালীর—

শেফালী আপনার ওয়াইফ। নামটা বেশ।

একথায় কোনরকম মন না দিয়েই দেবকুমার বললো, পূর্বপুরুষের কোথাও কোন পদস্খলন যদি—ধরুন প্রিহিস্টরিক পিরিয়ডেও হয়ে থাকে—

হো হো করে হেসে উঠলো ডক্টর কাবাসি। ইতিহাসের গোড়ার দিকে তো এ রোগ আকছারই হোত এবং ছিলোও—কিন্তু বংশধর থেকে বংশধরে হাজার হাজার বছর ধরে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে তো তা একদিন মিলিয়েও গেছে ভাগ হতে হতে। তখন তো উওম্যান কমন প্রপার্টি ছিল কিংবা প্রপার্টি যখন তখন হাত ফেরতা হোতোই! আমি তখনকার কথা বলছি নে মিস্টার বাসু। ধরুন আমরা সভ্য হয়ে যাবার পর মানে সামাজিক বন্ধন যখন উওম্যানকে আর প্রপার্টির লেভেলে ফেলে রাখলো না, মানে বিয়ে সাদি চালু হোল যখন—তখনই তো এ রোগ এক জায়গায় গিয়ে কনসেনট্রেট করলো। তারপরেই তো বিপদ।

এমন একটা কথায় গিয়ে ডাক্তার থামলো—যেখানে বিপদ কথাটা ঘরময় গমগম করতে লাগলো। এত চেনা কথাটা একদম বোমা হয়ে দড়াম করে দেবকুমারের কানের কাছেই ফাটলো। উঃ! আমি যে কি ফেরে পড়ে গেছি। এ ডাক্তারও যে আমাকে চুয়াত্তরে কনফার্ম করতে চায়। অথচ আমি স্রেফ সাতচল্লিশ। কি করে সাতাশ বছরের একটা লম্বা লাফ দেব। এই ক'মাসে তো আর সাতাশ বছরের একটা লম্বা লাফ দিতে পারি না। একদম অ্যাবসার্ড ব্যাপার।

ডক্টর কাবাসি চল্লিশ পেরোনো গোলগাল মানুষ। তাই লাগছিল দেবকুমারের। ডাক্তার বললো, সভ্যতাই বলুন কিংবা সোসাইটিই বলুন—এভাবে রোগ পুষে রাখতে সাহায্য করলো আমাদের। নয়তো মানুষের অসংখ্য ব্রাঞ্চ লাইনে—একই মাতৃগর্ভে নানান বাবার ব্রাঞ্চ লাইনে এ রোগ ছড়াতে ছড়াতে—

পার্টিশান হতে হতে কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আপনার হাড়েও ঘুণ ধরতো না।

কিন্তু আমি যে একদিন সকালে উঠে শুনলাম—গত রাতে নাকি বুড়ো হয়ে গেছি।

ওটা বাজে কথা। অনেকদিন ধরেই হচ্ছিলেন। রোজ দেখছেন বলে বাড়ির লোক ধরতে পারে নি।

তা কি করে হবে স্যার? আমরা সবাই তো অনেকদিন ধরেই বুড়ো হই।

তার চেয়ে কিছু বেশী স্পীডেই বুড়ো হয়েছেন আপনি। তাড়াতাড়িতে অকালেই একটু বেশী বুড়ো হওয়াতেই আপনি বাড়ির লোকের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছেন হঠাৎ।

আমি বুড়ো না তো।

পুরোপুরি হন নি এখনো। তবে হয়ে যাবেন শীগগিরি। হাড়ে ঘুণ ধরলে তো একদিন জয়েণ্টগুলো ঢিলে হয়ে যাবেই।

কিন্তু সে সময় তো আমার আসে নি।

চিন্তা নেই কোন। আসবে। দেখবেন একদিন সকালে এসেই গেছে।

দেবকুমার বসুর একবার সন্দেহ হোল। সে কি সত্যিই ডক্টর কাবাসির চেম্বারে এসেছে? না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাইন-বোর্ডটা পড়তে পড়তে এসব ভেবে যাচ্ছে? কাবাসি কি আসলে ডাক্তার? না ছদ্মবেশে অমিয় সাঁতরা?

তখনই ডক্টর কাবাসি জানতে চাইলো, আপনার কাছে দেশলাই আছে? দিন না।

কেন?

দেখাচ্ছি আপনাকে একটা জিনিস। আমরা গুপ্ত রোগ হ্যাণ্ডেল করি। আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়। দিন।

দেবকুমারের দেশলাই থেকে পাঁচটা কাঠি নিয়ে ডক্টর কাবাসি

টেবিলে সাজালেন। তারপর বললেন, যাহা সাতচল্লিশ তাহাই চুয়াত্তর।

তা কি করে হয়?

হয়। আপনি কি জানেন প্লাস ইকোয়ালটু মাইনাস?

আমি উঠছি ডক্টর কাবাসি।

বসুন বসুন। এই দেখুন—

দেবকুমার দেখলো—দু'টি কাঠি যোগ চিহ্নের কায়দায় সাজানো। যাকে বলে প্লাস। তারপর সমান সমান চিহ্ন। পাটিগণিত বীজগণিতে যাকে দেবকুমার একদা ইকোয়ালটু বলেছে। শেষে একটি কাঠিকে মাইনাসের কায়দায় শুইয়ে রেখেছেন ডাক্তারবাবু। অনেকটা দেখতে—

+ = -

এবার ডক্টর কাবাসি প্লাসের সিধে কাঠিটা তুলে নিয়ে মাইনাসের গায়ে সিধে করে বসালেন।

- = +

দেখলেন। মাইনাস ইকোয়ালটু প্লাস। কেমন কিনা?

দেবকুমার নিশ্চিত হয়ে গেল—সে নিশ্চয় গুপ্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর কাবাসির বদলে অন্য কোন ধাঁধা বিশারদের চেম্বারে ঢুকে পড়েছে। এরকমই একই সিঁড়ি দিয়ে উঠে একই বাড়িতে এসব পাড়ায় নানা এরিয়ার এক্সপার্টরা পাশাপাশি চেম্বার খুলে বসেন। হয়তো ধাঁধার লাইনে বিশেষজ্ঞ একজনের পদবীও কাবাসি। আর এক্সপার্ট বলেই নামের আগে ডক্টর কথাটা বসাতে হয়েছে। আমি উঠি আজ স্যার—

কোথায় যাচ্ছেন? বসুন বসুন। এজন্যেই তো বলছিলাম—চুয়াত্তর আর সাতচল্লিশ নিয়ে মন খারাপ করার কিছুই নেই। আসলে লক্ষ্য রাখতে হবে বাঁচাটা কেমন হচ্ছে। কেমন করে বেঁচে আছি আমরা। পুরোপুরি তো? কিছুতেই ভেতরে ভেতরে

ঘুণ ধরতে দেওয়া চলবে না। উঠছেন কোথায়? বসুন না—

আমার কাজ আছে ডাক্তারবাবু।

বসুন। বসুন। আপনি আসলে সাতচল্লিশের চুয়াত্তরে ভুগছেন। আমিই আপনাকে সারাবো।

দেবকুমারের দম বন্ধ হয়ে গেল। একি ব্যাপার? এখান থেকে কি আমি বেরুতেই পারবো না? কড়া আলোয় ঝকঝকে ঘরের বাইরে এখনো কি কলকাতার দিন ওয়েট করছে? না সন্ধ্যে মাখানো বিকেল এসে গেল?

একটু বেশী স্পীডে আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন। এই স্পীডটা যদি চেক করা যেতো, মানে রাশটা একটু কমিয়ে এনে—ও কি? উঠছেন কেন? বসুন না। আমিও বেরোবো।

অগত্যা দেবকুমারকে বসতেই হোল।

জানেন মিস্টার বসু—আমরা সবাই জাম্প দিয়ে দিয়ে নানান বয়স টপকে পার হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি জানেন—এভরি সিক্স ইয়ার্স হিউম্যান বডিতে সব পাল্টে যায়?

সব?

না। সব মানে হাড়গোড়, চোখের মণি—এসব বলছি না। তবে গোপনে গোপনে সবই আসলে ছ'বছরে একবার করে পাল্টে যাচ্ছে। মানে সারা শরীরের সেলগুলো রিনিউ হয়ে যাচ্ছে। তাতে হাড়, চোখ, দাঁত—সবই যাচ্ছে পাল্টে।

তাহলে হাড়ে ঘুণ ধরবে কি করে? হাড়ও তো পাল্টে যায়।

কিন্তু প্রিহিস্ট্রির হিস্ট্রি টুকু তো সেল থেকে নতুন সেলে বর্তায়। মানে চলে আসে। আমি জানি মিস্টার বাসু—আপনার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন। ভাবছেন—এ কি রকম ডাক্তার? এলাম গুপ্ত রোগের জন্যে—

আমি কিছু করি নি তো গুপ্ত রোগ হবে কি করে?

ওই একই কথা! ভেতরে ভেতরে হাড়ে গিয়ে যখন ঘুণ ধরে। বাগ্ গিয়ে। আমিও উঠছি। চলুন বেরিয়ে কথা বলতে বলতে যাবো।

বাইরে বেরিয়ে জানুয়ারির থকথকে সন্ধের ভেতরে পড়ে গেল দু'জনে। হেঁটে ও-ফুটে যাবার সময় ডাক্তারকে পুরোপুরি দেখলো দেবকুমার। তার চেয়ে বয়সে ছোটই হবেন। ডাক্তার তার গাড়ির দরজা খুলে বললো, আসুন।

দেবকুমার দ্বিধায় পড়লো। সে তো জানে না—ডাক্তার কোন্ দিকে যাবেন?

আসুন না। কোথাও কি কোন কাজ আছে?

নাঃ। তেমন কিছু নয়।

তবে চলুন না। এই কাছাকাছিই একটু ঘুরবো। আপনি তো এখন জানেন নিশ্চয়—পৃথিবীর সব প্লাস আসলে সব মাইনাসের সমান। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

কলকাতা এখন একেবারে মানুষের নদী। ফুটপাতে ফুলকপি। দেবকুমার পরিষ্কার দেখলো, ডক্টর কাবাসি নামে লোকটি এই ভিড়েও চমৎকার স্টিয়ারিং কাটাচ্ছেন। লোকের পাশ কাটিয়ে গাড়ি খুব সহজেই এগোচ্ছে। দেখুন ডাক্তারবাবু—আমি নেমে যাই।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে ডক্টর কাবাসি বললেন, বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চয় ভাবছেন—আমি কি ভুল জায়গায় এলাম? না। আপনি ভুল জায়গায় আসেন নি। আমি সত্যিই ডাক্তার। এ সম্পর্কে আপনি কোন সন্দেহ রাখবেন না।

আমি কি সত্যিই আপনার কাছে এসেছি ডাক্তারবাবু?

হো হো করে হাসতে হাসতে ডাক্তার গাড়ির নাকসুদ্ধ সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুতে উঠলেন। আমার কাছে নাও এসে থাকতে পারেন!

আপনিই বললেন কিনা—প্লাস ইকোয়ালটু মাইনাস।

ঠিকই তো।

তাহলে আমি এখন আসলে কোথায় ডাক্তারবাবু? বলে চলন্ত গাড়ির ভেতর ডাক্তার কাবাসির সিটের পাশের সিটে প্রায় উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার বসু।

আপনি আমার কাছে এসেছেন কিংবা আসেন নি—এটা কোন বড় কথা নয়। ভাল হয়ে বসুন।

দেবকুমার বুঝলো, সে এখন এক অন্ধকূপে ঢুকে পড়েছে—সেখান থেকে তার হয়তো আর কোনদিন বেরোনোই হবে না। এখন তার শুধু হাত পা ছোঁড়াই সার।

ডক্টর কাবাসি আবার বললেন, কিংবা চুয়াত্তর না সাতচল্লিশ—ওটাও আসলে কোন বড় কথা নয়। যারা আপনাকে দেখছেন—দেখে চোখে কোশ্চেন মার্ক ফুটিয়ে তুলছেন—তাদেরই চোখের পরিবর্তন দরকার।

এত লোকের চোখের সেল কি এত তাড়াতাড়ি পাল্টাবে? তার জন্যেও তো ছ'ছটা বছর দরকার। এসব কথা বলতে গিয়ে দেবকুমার দেখলো—সে কখন ডক্টর কাবাসির যুক্তির জালে নিজেই বারসুঁই হাতে নিয়ে বুনতে বসে গেছে। খারাপ লাগে না তো তার। মনে হচ্ছে—এরকমই তো হয় বোধহয়।

ডক্টর কাবাসি বললেন, সে তো বটেই। কিংবা যার ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরে গেল—তার তো প্রিহিস্ট্রির হিস্ট্রির জন্যেও ওয়েট করা দরকার। কেন না, তারও তো হাড়ের সেল পাল্টে যাচ্ছে ছ' বছরে। বাই দি ওয়ে—আপনার বডিতে কি মিস্টার বাসু চামড়া নীল হয়ে কোথাও ফেটে গেছে—বা ফেটে ফেটে যাচ্ছে?

ঠিক লক্ষ্য করি নি। এবার দেখতে হবে।

তাহিতি দ্বীপের পলিনেশিয়ান পপুলেশনে এই অকাল বার্ধক্য—মানে ফুল স্পাডে কিছু বেশী তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া ঘটতে

থাকে—এই সেনচুরির গোড়ার দিকে। ওখানে মানুষ অল্প বয়সে—ভোররাতের স্বপ্নের আলোয় যেমন নবীন ভাব থাকে—তেমনি সতেজ কাঁচা ভাব নিয়ে ঘোরে ফেরে। তারপর আচমকাই ধড়াস করে বুড়ো হয়ে যায়। মাস স্কেলে! এটা এ সেনচুরির গোড়ার কথা। পল গঁগার অরিজিনাল দেখেছি আমি ওয়াশিংটনে। বিরাট বিরাট ছবি। স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়মে। গঁগা এই ভোররাতের স্বপ্নের আলো ধরতে পেরেছিলেন। তার ভেতর দিয়ে নবীন মানুষ ঘন তাজা ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। চারদিকে পলিনেশিয়ান সারল্য—যেমন সরল সবুজ সবুজ চিরল পাতা কাটিয়ে বাতাস চলে যাচ্ছে।

ছবিতে বাতাস দেখা যায়?

হুঁ। পরিষ্কার দেখা যায়। যেন বাতাস চলে যাওয়ায় পলিনেশিয়ান গাছপালার পাতা ফেটে ফেটে গেছে। ছবির অনেকটা স্পেস জুড়ে সাদা। বোঝাই যায়—ওই সাদা পেরোলেই সমুদ্রের দেখা পাওয়া যাবে। ওদের ওখানে প্রিহিস্ট্রির আমল তো অনেক বেশী দিন ধরেই ছিল। প্রাণের ঊষা লগ্ন একটু বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

আমরা কোথায় যাচ্ছি ডাক্তারবাবু?

গাড়ি এসে থামলো মেডিকেল কলেজের পেছনে। সন্ধ্যে তখন রীতিমত জমে গেছে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে একখানা গলি মেডিকেল কলেজের গা দিয়ে বউবাজারের ছানাপট্টি ডাইনে ফেলে বড়াল স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। এই গলির গায়ে জল কাদা মাখানো ড্রেন ডাস্টবিন আর ভাড়া গাড়ির পাশ কাটিয়ে ডক্টর কাবাসি দেবকুমারকে যেখানে নিয়ে তুললো—সেখানটায় আগেই চোখে পড়বে একটি কলমের আমগাছ—একটি ভাঙা দেওয়ালের আড়াল আর কুপি মত ঢাউস এক আলো ঘিরে কিছু লোকের মাথা—আবছা একখানা ঘরের টালির ছাদ।

এ কোথায় এলাম?

দেবকুমার বেঁকে দাঁড়াতে তাকে ধরে ফেললো ডক্টর কাবাসি। ভেতরে চলুন। মনে রাখবেন—এ দুনিয়ায় প্লাস ইকোয়ালটু মাইনাস।

দেবকুমার সমেত ডক্টর কাবাসি ঢুকতেই একটা হইহল্লা পড়ে গেল। ইটি কে? ইটে কে ডাক্তারবাবু?

টালির ছাদটা বেশ লম্বা। তার নীচে বেঞ্চের ওপর বসলো দেবকুমার। ডক্টর কাবাসিই তাকে বসালো। তারপর বড় গলায় বললো, ভালো করে সাজো তো। সঙ্গে নতুন মানুষ রয়েছে। ঠেকের বদনাম হয়ে যাবে।

ধোঁয়া ঘামানো আবছা আলোয় এবার দশ বারোজন লোকের জটলায় মুখগুলো, পোশাক-আশাক সবই পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগলো দেবকুমারের চোখে। জায়গাটা মেডিকেল কলেজের হাতার ভেতর। আবছা ঘরখানা বোধহয় কোন ফোর্থ ক্লাস স্টাফের কোয়ার্টারও হতে পারে। কলকাতার একেবারে হার্টের ওপর এরকম একখানা ঠেক থাকতে পারে—সেণ্ট্রাল অ্যাভিনু দিয়ে যাতায়াতের সময় কোনদিন চোখেও পড়ে নি দেবকুমারের।

পুড়িয়ে দেবে?

দেবকুমারের চোখের সামনে রাংতামোড়া কুলের বীচি সাইজের কি কয়েকটা তুলে ধরলেন ডাক্তারবাবু।

আমি—

এসব দেখেন নি তো কোনদিন। আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।

পাশেই স্যুট টাই পরা একজন বললো, আমাদের পাড়ায় আপনি চেম্বার খুলুন ডাক্তারবাবু। একজনও ডাক্তার নেই।

কি বলছো রমেন। ডাক্তার নেই মানে!

আছে। চিকিৎসে জানে না। আপনি চেম্বার করলে রুগীতে ভরে যাবে। টাকা রাখবার জায়গা পাবেন না।

আমি তো রমেন—দিনে পাঁচটির বেশী পেশেণ্ট দেখি না।

অনেক টাকা পেতেন কিন্তু আমাদের পাড়ায়।

অনেক পেতাম—কিন্তু অনেক ট্যাক্স দিতে হোত। শেষে প্লাস ইকোয়ালটু মাইনাস হয়ে যেতো। তাছাড়া স্ট্রেন হোত। হাউ নট টু আর্ন—তাই এখন আমি প্র্যাকটিস করছি। জীবনে কোন জিনিসই তো খুব বেশী লাগার কথা নয়। এটা পুড়িয়ে আনো তো রমেন।

রমেন নামে সেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাংতামোড়া কুলের বীচিটা নিয়ে সামনের মালসায় আগুনে পোড়াতে বসলো।

কি? ওটা কি পোড়াচ্ছেন? আমি উঠবো ডাক্তারবাবু। এখানে এত ধোঁয়া—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে যে—

কোথায় যাবেন? বসুন। কি সুন্দর গন্ধ দিচ্ছে। ভালো করে সেজে দিচ্ছি। একবার রেলিশ করে দেখুন।

কি বলে ডাক্তার! এ তো একদম আজগুবি লোক। দেবকুমার উঠেই দাঁড়ালো। না ডাক্তারবাবু। আমায় যেতে হবে। আমি এসেছিলাম—আমাকে দেখাতে। এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন?

আমি কিছু ভুলি নি মিস্টার বাসু। এখানে আমি হাউস সার্জেন থাকার সময় থেকে আসছি। কোন ভয় নেই আপনার। এ আমাদের চেনা জায়গা। ও সুকুমারদা—সুকুমারদা—

ডাক্তারের বাজখাঁই গলায় দেবকুমার অগত্যা আবার বসেই পড়লো। ডাক্তার তার গলা থেকে টাই খুলে কোটের পকেটে রাখছিল। এমন সময় ডক্টর কাবাসি ডাক ছাড়লো। ও সুকুমারদা—আপনি নিজের হাতে একটু বানিয়ে দিন তো—

টালির ছাদের মোটা ছায়ার ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এলো—তাকে দেখে দেবকুমার পড়ে যাচ্ছিল।

এই তো। সুকুমারদা এসে গেছেন। ও রমেন—তোমায় আর করতে হবে না।

দেবসাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে রংয়ের পাতা থেকেই লোকটি উঠে এসেছে। সেই কমাণ্ডার গোঁফ। চোখে পাতলা রিমের চশমা। শার্টের বদলে এই সুকুমারদার গায়ে সাদা ফতুয়া। তাতে দু'পাশে মোট একজোড়া বুকপকেট বসানো। সুকুমারদা মধুর করে হাসলো দেবকুমারের দিকে তাকিয়ে। তারপর উবু হয়ে মালসায় কী পোড়াতে বসছিল। অমনি তার হাতে ধরা দড়িটার শেষদিক থেকে যে এগিয়ে এলো—সে একটি হরিণ। দেবকুমার উঠে দাঁড়িয়েছিল। তড়াক করে।

ডক্টর কাবাসি বললো, এটা সুকুমারদার তপোবন। ওটা পোষা হরিণ।

বলতে বলতে হরিণের সবটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো। মানে—হরিণটা এগিয়ে এসেছে। একদম চুনে হলুদ রংয়ের। চোখের নীচে ভেলভেট পুরু কাজল। মাথায় ডালপালা ছড়ানো শিং। দেবকুমারের বুকের ভেতর প্যারেডের বাজনা বেজে উঠলো। ধুম্ ধুম্ ধুম্। টট্ টেট্রা—ধুম্।

মালসার আঁচে সুকুমারদা ফুঁ দিতেই লালচে আগুনের আলোয় হরিণ মুখ তুলে চাইলো। সোজাসুজি দেবকুমারের চোখে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমার চিনতে পারলো। সামনের লোকগুলোর মাথার ওপর মালসার আগুনে যেটুকু আলো—তাতে হরিণটা আবছা অন্ধকারের ওপর আগাগোড়া কুঁদে বসানো। একদৃষ্টিতে তাকানো মুখের ওপর হরিণটা তার ডালপালা ছড়ানো শিং বেশ ব্যালান্স করে দাঁড়ালো। দেবকুমারের বুকের ভেতর প্যারেডের বাজনা আরও ঘন হয়ে বাজতে লাগলো। তার বুক ফেটে যাওয়ার দশা।

এমন সময় সুকুমারদা লোকটা তার কাছে এগিয়ে এসে সেই কুলের বীচিটা ধরলো। দেবকুমার তাকাতে পারছিল না। রাংতা সুদ্ধু জিনিসটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ডলে তৈরি করে দিচ্ছি।

ডক্টর কাবাসি প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে পড়লো। হ্যাঁ, পয়লাবার আপনিই সেজে দিন।

দেবকুমার হাতে নিয়েও দেখলো, হরিণটা চোখ নামায় নি। সুকুমারদা লোকটা কাছে এগিয়ে এসে যখন বললো, কোন ভয় নেই। আমার এখানে খদ্দেরদের খারাপ জিনিস দিই নে। দেবকুমার তখন চোখ নামিয়ে দেখলো, কাছার বাইরে বাঁ পায়ের কাফ মাসেল ঠিক বেরিয়ে আছে।

জুত্ করে ধরুন।

দেবকুমার ধরলো। তারপর—তার শরীরে খানিকটা ধোঁয়া যেতেই সে বেশ আরাম পেতে লাগলো। তখনো তার বুকে প্যারেডের কেটেল ড্রামের বাজনাটা বেজে যাচ্ছিল। তৎতর্—তর্—তৎ—

আবার সুকুমারদা উবু হয়ে বসে মালসার আগুনে পুড়িয়ে সেজে দিল নিজে। হরিণটার দিকে আর তাকাতে পারছিল না দেবকুমার। সে একদম চোখ নামায় নি। ভীষণ গর্বে মুকুটের কায়দায় ডালপালা ছড়ানো শিং মাথার ওপর ব্যালান্স করে ধরে রেখেছে। চোখের নীচের কাজল ভেলভেট পুরু। এবারও তার শরীরে আরাম ঢুকে যেতে লাগলো। ঠিক এই সময়েই তার মাথার ভেতর দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর পাতার ঘিয়ে সাদা রং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেভাবে আর কি পল গঁগার ছবিতে বাতাস দেখা যায়—কিংবা খোলা স্পেসে সমুদ্রের আভাস ঠিকরে উঠে আসে—প্রায় তেমন করেই। আর ঠিক তখনই—

দেবকুমার বসুর মাথার ভেতর একটা মাটির খুরি মট্ মট্ করে ভেঙে গেল। দেবকুমার পরিষ্কার দেখলো, তপোবন প্যাটার্নের জায়গাটা তার বসার বেঞ্চসুদ্ধ একদিক উঁচু হয়ে গেল। যাকে বলে জল চলকানো। তখনো তার আরাম লাগছিল। এই অবস্থাতেই ডক্টর কাবাসির গলা পেল। সাতচল্লিশ থেকে চুয়াত্তর—

শুধু হরিণ চলকায় নি। সেই চুনে-হলুদ। সেই ডালপালা ছড়ানো শিং। সেই চোখ। একদম ভেলভেট পুরু—নীচের দিকে।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যে দেখে রাজু নিজেই মাকে আনতে গিয়েছিল। ঋতু মাসীদের বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি। জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারের ফুটে রাজুর মাথাটা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করলো শেফালী। ভালো ভালো ঘরের জনা বারো মহিলা—দু' একটি অবিবাহিতাও আছে—কেউ গুজরাটী, কেউ ওড়িয়া—কলকাতায় নতুন নতুন ব্যবসায় ওদের স্বামী, বাবা, ভাই দু' পয়সা কামাচ্ছে। শেফালী নতুন শেখা হিন্দীতে বললো, আজ ইহাতক। কাল ক্যাপসিকাম কি আচার পর চর্চা করুঙ্গি—

রাস্তায় রাজুর হাত ধরে এগোতে এগোতে প্রথম কথাই জানতে চাইলো শেফালী, তোর বাবা ফিরেছে ?

অনেকক্ষণ। মা—ক্যাপসিকাম কি জিনিস ?

ওই বোমবাই লঙ্কা যাকে বলিস। আজ অফিসে গিয়েছিল তোর বাবা ?

সে সব তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না। এখন তো কবিতা লিখছিল দেখে এলাম।

আবার কবিতা ? নিশ্চয় অফিস যায় নি। বলতে বলতে শেফালী বুঝলো, শীত চলে যাবে বলে—যাবার আগে কলকাতার টুঁটি কামড়ে ধরেছে। রাস্তার গায়ের গাড়ি সারানোর গ্যারাজগুলো পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়িতে একদম কোণঠাসা। গেরস্থ বাড়ির গা ঘেঁষা সে-সব গ্যারেজে গাড়ি রংয়ের চকোলেট গন্ধ বাতাসে। এ বাতাসে শেফালীর নিজেকে পরী পরী লাগছিল। আজ ঋতুদি যখন স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল—

তখন সিঁড়িঘরের পাশে একটেরে অফিস ঘরে শেফালী একা একা রেজিস্ট্রার মিলিয়ে দেখছিল। আজই কাজটা শেষ করে দিতে বলেছিল ঋতুদি। পয়সা হবার পর ঋতুদি এত তাড়াতাড়ি মুটিয়ে গেছে যে—সরস্বতী পুজো পার হয়ে গেল—তবু ঘামে। গরমটা বেড়ে গেছে। অথচ শীত তো যায় নি। এরই ভেতর স্লিভলেস নামানো সারা।

রেজিস্ট্রার খাতার ওপরেই প্রথমে ছায়াটা পড়েছিল। শেফালী জানতো. অসিত আসবে। এখন আর অসিতবাবু বলে না শেফালী। দু'জনে একা থাকলে শেফালী শুধু অসিত বলে। টাকা চেয়ে নেয়। অসিত বলে, দেবুকে যদি কোথাও ঘুরিয়ে আনতে পারতে—তাহলে মাথাটা সাফ হয়ে যেত। আমরা অনেক বলে কয়ে চাকরিটা অবিশ্যি রেখে দিয়েছি। কিন্তু কতদিন পারবো জানি না ?

বেশীদিন পারবে না।

কেন ? কি করে বাড়িতে ?

এ বছর একটা বর্ষা হারিয়ে গেছে বলে মনের দুঃখে পড়ে পড়ো শুধু কবিতাই লিখছে !

পড়াশুনো করে কবিতা লিখতে হয় ?

তার সামনে এসে অসিত কেন এত হাবা হয়ে যায় শেফালী বুঝতে পারে না। পড়ে পড়ে মানে—সারাদিন—সারা বিকেল শুধু কবিতাই লেখে।

যাক্ বাবাঃ ! ভায়োলেন্ট কিছু করে না তো সেটাই ভালো। আবার হরিণ-টরিণ দেখতে পাচ্ছে না তো ?

আমার মনে হয় বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল। এ শহরে হরিণসুদ্ধ তপোবন থাকতে পারে নাকি ?

তাই বলে রাস্তায় অমন সারারাত শুয়ে থাকলো ? পুলিস যদি বাড়ি খুঁজে না দিয়ে যেতো দেবুকে—তাহলে কি হোত ?

কি আর হোত! সারারাত নেশা করে রাস্তায় পড়েছিল। তারপর রোদ উঠতেই হেঁটে ফিরে আসতো।

নাঃ! শেফালী। আমার মনে হয়—ওর মনে কিছু হয়েছে। নয়তো—অমন স্বাস্থ্যে এমন রাতারাতি কেউ বুড়িয়ে যায়?

তোমার জন্যেই হয়েছে। বন্ধু হয়ে বন্ধুর বউকে কেউ হামলে পড়ে চুমু খায়? শুনেছো কোথাও? বলতে বলতে ফিকফিক করে হেসে ওঠে শেফালী।

এসব কথায় অসিতের চোখে দ্বিধা ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে ভয়। ঠোঁট কাঁপে। তখন তখনই শেফালী আবার বোমা ফেলে। অমন শিক্ষিতা সুন্দরী বউ থাকতে তুমি আমাকে নিয়ে পড়েছো কেন অসিত? তোমার চোখে পোকা পড়েছে!

পড়ুক বলে এগিয়ে এসে অসিত নির্ঘাৎ শেফালীকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে। ঋতুদির লম্বা ক্লাস থাকলে এক একদিন তো পেড়েই ফেলে তাকে। তারপর সুস্থির হলে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোমায় দেখলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি শেফালী।

কেন? কি আছে আমাতে?

অসিত অনভিজ্ঞ পুরুষ নয়। আনকোরাও বলা যাবে না তাকে। রীতিমত সংসারধর্ম করতে করতে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলা পোড় খাওয়া পুরুষ লোক সে। মেয়েরা কখন এমন সব খেলানো বাংলা বলে—বলে নিজেরাই ভেতরে ভেতরে আরাম পায়—অসিত তা জানে। তাই এইসব সময়ে সে গরু সেজে থাকতেই ভালবাসে।

আর তখন তখনই ভাঙা খোঁপা সজ্জত করতে করতে এটা ওটার পর শেফালী এসব কথাই বলে—কয়লা বাকি পড়লো তিন মাসের। দুধটা কি তুলে দেব?

উঁহু। এখন আমার বন্ধুর মাথার জন্যে দুধ তো অত্যন্ত জরুরী। পারলে বাড়িয়ে দাও। তারপর একটু থেমে বলে—ক্যাশ বাক্সে

যে ব্যাগ আছে—তার ভেতর থেকে দু'খানা গজ নিয়ে যাও। এখুনি নিয়ে নাও না। ঋতুর তো ক্লাস শেষ হয় নি। দু'খানার বেশী গজ নেবে না কিন্তু।

গজ মানে একশো টাকার নোট। এখন অসিত দত্তর তবিলে একশো টাকার তাড়া তাড়া নোট থাকে। আন্দাজে শুরু করা এই ভুলভাল শেখানোর ইস্কুল এখন একতলা ছাপিয়ে দোতলায় উঠেছে। মাসে মাসে সি এ দিয়ে এক নম্বর দু'নম্বর খাতা ঠিক করা হয়।

ক্যাশ বাক্সের দিকে যাবার আগে শেফালী থেমে পড়ে। অসিতের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে—অসিতেরই দেওয়া ব্লু ফাউণ্টেনের গন্ধ চারিয়ে দিয়ে শেফালী অসিতের মুখে ভালো করে তাকায়। নাঃ! দেখছিলাম—সিঁদুরের দাগ লাগানো কিনা। তোমার তো এসব সময় কোন জ্ঞান থাকে না।

তখন তখনই অসিত দত্ত বাম হয়ে গিয়ে আরেকখানা চুমু খায়।

দিলে তো চুলটা নষ্ট করে। বলতে বলতে শেফালী গিয়ে ক্যাশ বাক্স খোলে। তার ভেতরে পেটমোটা ব্যাগ। গজের নম্বরের কোন পরোয়া না করেই হাতে যা ওঠে তাই তুলে নেয়। একবার একসঙ্গে ছ'খানা উঠে এসেছিল। এই ছোট ছোট কাগজগুলোর ক্ষমতা অনেক।

করো কি? করো কি? বলে ছুটে এসেও অসিত শেফালীকে থামাতে পারে না। এসব সময় শেফালী নোটগুলো নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে ফেলে দুষ্টু খেলার হাসি হাসে। মানেটা এরকম—কেমন কিনা! আমি নিলেও তো তোমার অনেক থাকছে!

নিজেকে বেশী বেশী খরচ হয়ে যেতে দিয়েও অসিত এমন সময় এক রকমের আনন্দ পায়। এ ধরনের আনন্দ ঋতুর সঙ্গে তার কোনদিনই হবার নয়। কেন না, ঋতু তার বিয়ে করা বউ। এ

বাড়িখানা ঋতুর বাবার। এখানে অসিত দত্ত এখন একজন প্রায় গেস্ট আর্টিস্ট।

রাজুর হাত ধরে বড় রাস্তায় পড়ে খোঁড়াখুড়ি খুব সাবধানে পার হোল শেফালী। এখানে এখন যেমন ছায়া মেশানো আলো—আজ ঠিক তেমনই ছায়া ফেলেছিল অসিত। তার পেছন থেকে। রেজিস্ট্রার খাতার পাতায়।

কি হচ্ছে অসিত? আমি কিন্তু ঋতুদিকে সব বলে দেব। আমার মেয়ে আছে—জামাই আছে।

পিঠে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে অসিত মৃগী রুগীর গলায় তখনো বলে যাচ্ছিল—তুমি এত সুন্দরী কেন? কেন?

যে কোন সময় ঋতুদি এসে পড়তে পারে। আজকাল যেন শেফালীর মনে হয়—ঋতুদি মাঝে মাঝে তার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। সন্দেহ করে না তো? এই ইস্কুল ইস্কুল খেলার ভেতর শেফালীর দুটো জায়গা বেশ লাগে। এক, মাস গেলে মাইনে। দুই, তাকে পাওয়ার জন্যে অসিতের লুকিয়ে চুরিয়ে আসা। তিন মাস আগেও সে অসিতবাবু বলে ডাকতো। অসিত ডাকতো—মিসেস বাসু।

আরও একটা জিনিস শেফালীর লোভের শেকড় ধরে নাড়া দেয়। তা হোল: সময়ে সময়ে ক্যাশ বাক্স খুলে ব্যাগের ভেতর থেকে কোন পরোয়া না করেই কয়েকখানা গজ তুলে নেওয়া।

কাল বিকেলে ঋতুদি বলছিল, দেবুবাবু কেমন আছেন?

আজকাল কি একটা ভয় কাজ করে শেফালীর ভেতর—ঋতুর চোখের দিকে তাকাতে পারে না। না তাকিয়েই বলেছিল, ওই একই রকম। কিছু বুঝতে পারি না।

স্বামীর ব্যাপারটায় আরেকটু মন দেওয়া উচিত তোমার শেফালী!

মাত্র দু'মাস আগেও ঋতুদি তাকে আপনি বলতো। ইস্কুলের

রবরবা যেমন বাড়তে লাগলো—রাজুর বাবা ততটাই এলেবেলে হয়ে যেতে থাকলো—আর শেফালীও কখন ঋতুদি ঋতুদি করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই হিসেবেই শেফালীকে ঋতু তুমি তুমি করে। এই ঋতুদি কথাটা নিয়েই রাজুর বাবার সঙ্গে একদিন তুলকালাম হয়ে গিয়েছিল শেফালীর। তখনো দেবকুমারের গণ্ডগোলের সবটা পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। তখনো যদি সাবধান হওয়া যেত। পরিষ্কার বুঝতেই পারে নি শেফালী সেদিন।

এবার ঋতুদির চোখের দিকে তাকিয়ে শেফালী বলেছিল, মন তো দিয়ে থাকি ঋতুদি।

না। তুমি দাও না। বিচারপতির ভঙ্গীতে রায় দেওয়া গলায় একথা বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল ঋতু দত্ত। মন যদি দিতে তাহলে তোমার নিজের বেশবাসে এতটা পরিপাটি হতে পারতে?

সঙ্গে সঙ্গে শেফালী নিজের মনের ভেতর নিজেকে বলেছিল, আমায় যদি তোমার চেয়ে দেখতে সুন্দর হয় তো আমি তার কি করবো? নিজে মুটিয়ে গিয়ে অন্যকে হিংসে করা কেন?

কিন্তু এসব কথা তো অন্নদাত্রীর মুখের ওপর কটকট করে বলা যায় না। অবিশ্যি এখনো রাজুর বাবা মাইনে পায় মাস গেলে। অসিত বলছিল, মার্চ থেকে মাস পয়লায় অফিস মাইনের টাকা বাড়িতে শেফালীর হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু, এভাবে কতদিন আর দেবকুমারকে অফিসে রাখা যাবে—তার কোনরকম গ্যারান্টি দিতে পারে নি অসিত।

কাল বিকেলে শেফালী নরম করে ঋতু দত্তকে বলেছিল, কি করবো ঋতুদি? বিশ্বাস করো—আমি একটুও সাজি নি। শুধু চুলটা বেঁধে মুখখানা একটু মুছে নিয়েছি। পরেছি তো অর্ডিনারি শাড়ি।

ঘর ছেড়ে উঠে যাবার সময় ঋতুদি বলে গিয়েছিল, ভুলো না

শেফালী—আমিও একজন মেয়ে। এই সময়—এই মনের অবস্থায় ক'জন মেয়ের রূপ খোলে শুনি? বাহার বাড়ে কাদের?

বিশ্বাস কর ঋতুদি। আমি একজন শাশুড়ী। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

জবাব শোনার জন্যে বসে থাকে নি ঋতু দত্ত। স্পোকেন ইংলিশ, ম্যানার্স, হোম সায়ান্স, ইকেবানা—নানা বিষয়ে নানা ক্লাসের জন্যে নানা রকমের টিচার। নানা ধাঁচের ছাত্রী। অনেক মানুষজনের সামাল দিয়ে তবে ঋতু দত্ত এখন ঋতুদি।

রাজুকে নিয়ে সন্ধ্যের বাতাসে হাঁটতে হাঁটতে শেফালীর নিজেকে খুবই হাল্কা লাগছিল। ভালবাসা মানুষকে পুরুষলোক করে দেয়। রুণু বিয়ে হয়ে চলে যাবার বেশ কিছু আগে থেকেই শেফালী একদম ভুলেই গিয়েছিল—সে একজন মেয়েলোক। কেউ যদি খুব করে চায়—তবেই না এই মেয়েলোক বোধটা ফিরে আসে। এ রাস্তায় এখন লোডশেডিং যাচ্ছে। বাতাসে মোটর গ্যারেজের রং করার চকোলেট গন্ধটা আবার উড়ে বেড়াচ্ছে। এই সময় শেফালীর নতুন রং করা মোটরগাড়ির গায়ের মিহি ধুলো হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এ ধুলো বাতাস পেলেই ওড়ে। সে-ও প্রায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরে এলো। অন্ধকারে রাস্তার দু'ধারে গেরস্থ বাড়ির দরজাগুলো খোলা। মানুষজন দেখা যায়—চেনা যায় না। মনে হচ্ছিল—সব বাড়িতেই তার জন্যে একটা করে সোনার খনি পড়ে আছে। ভেতরে ঢুকে ছোট পেতলের বালতিতে সে সোনা শুধু তুলে নেওয়ার অপেক্ষা।

জীবনের কিছু গর্ত আপনাআপনি বুজে যায়
মাটি চাপা পড়ে থাকে বোতলের একটি ছিপি
কোথাও পাবে না তাকে মাটির মাটিতে
সে গর্ত আদৌ ছিল কিনা সেটাই এখন এক সন্দেহ।

এই অব্দি লিখে দেবকুমার আর অক্ষর দেখতে পাচ্ছিল না কাগজে। লণ্ঠনের ফিতেটা তুলে দিতে গিয়ে দেবকুমার দেখলো, মাননীয় ভঙ্গীতে কে যেন চুপচাপ সামনে দাঁড়িয়ে।

কে? ওঃ! তুমি। কখন এলে? বোসো।

আমি এ বাড়ির গিন্নী। আমাকে অত আপনি আজ্ঞে করে বসাতে হবে না। আজ অফিসে গিয়েছিলে?

পানচুয়ালি দশটায়।

পথে কোথাও ঘোরাফেরা করো নি তো?

পাগল! ফেরার পথে ঘুরতে ঘুরতে হেঁটে ফিরলাম। বাসে ট্রামে তো ওঠা যায় না। অফিস ভাঙা ভিড়ে ট্যাক্সি এদিকে আসতেও চায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে শেফালী—

কি?

এ নিশ্চয় অমিয় সাঁতরাদের কোন ফাউল প্লে। আমায় কোন ফাইল দিচ্চে না অফিসে।

তা তুমি বলো অফিসকে।

আজ বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এম ডি মিটিংয়ে ছিলেন।

অসিতবাবুদের বল।

মুখ কুঁচকে গেল দেবকুমারের। না। অসিতকে বলে কি হবে? অসিত কি আমার ওপরওয়ালা? তুমি কি ওদের স্কুলের কাজটা ছাড়তে পারো না? সন্ধেবেলা বাড়ি ফাঁকা লাগে।

বড়লোকি কোরো না। আজকাল পারলে সব জায়গায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কাজ করে। জিনিসপত্রের দাম দেখেছো?

এতদিন তো আমি একাই সংসার চালিয়ে এলাম। বলতে বলতে দেবকুমার দেখলো, রাজুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ঝুলে পড়ছে। আবহাওয়া পাল্টে দিতে দেবকুমার হাসি মুখেই বললো, এই কবিতাটা শোনো শেফালী।

জীবনের কিছু গর্ত আপনাআপনি বুজে যায়।
মহাভারতের মাঝের পাতাটি হয় উধাও—

ঝাঁঝ দিয়ে ধমকে উঠলো শেফালী। চুপ করো তো। আমার এখন কবিতা শোনার সময় নেই।

একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি। কবি পি. মুখার্জীর 'কবি ও কবিতায়' আমার তিনটে কবিতা বেরিয়েছিল। বলেছিলাম বোধহয় তোমাকে।

না। বলো নি।

হতে পারে শেফালী। বলাই হয় নি তোমাকে। সেই সুবাদে আমার একটা নেমন্তন্ন এসেছে।

কোত্থেকে বাবা?

শেফালীও জানতে চাইলো, কোথায়?

বিশেষ কিছু না। শ্রীরামপুরে এক কবি সম্মেলনে। আমায় কবি হিসেবে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে বলেছেন ওঁরা—

আমি যাবো বাবা। আমি যাবো। কবে যাচ্ছো?

ঠোঁট উল্টে শেফালী বললো, ওঃ! শিং ভেঙে বাছুরের দলে আর স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে যেও না। তার চেয়ে মন দিয়ে অফিস করো। সংসারী লোকের যা মানায়—তাই করো। বলেই শেফালী তার নিত্যকার রান্নায় চলে গেল। দেবকুমার জানে, একটু পরে ঠুকঠুক আওয়াজ আসবে—রান্নাঘরের মেঝে থেকে। নিয়মমত তিনটি ডিম সেদ্ধ করে মেঝেয় ঠুকে খোসা ছাড়াবে শেফালী। তারপর ভেজে নিয়ে ছ্যাৎ করে ঝোল বসাবে। ডিমের ঝোলের কথা মনে পড়তেই দেবকুমার টের পায়—তার টাকরার ছাল উঠে গেছে।

এখন লণ্ঠনের আলোর সামনে খোলা খাতায় কবিতা। দেবকুমার খাটে শুয়ে শুয়েও লেখে। মহাভারতের মাঝের পাতাটি উধাও। আত্মগোপনের চোদ্দ বছরও ফুরিয়ে যায় একদিন। আহা!

আমরা সবাই যদি লং ভার্সে কথা বলতাম। পিওনকে ডেকে বলতাম—কী বার্তা আনিয়াছো এবে? কিংবা ব্যাঙ্কে গিয়ে বলতাম—কহ অর্থ চূড়ামণি। কি আছে ভাণ্ডারে মম—হে অঙ্কবিশারদ!

কবিতা এখন তাকে সব সময় একটু একটু করে চিবিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। কত কবিতাই যে মনে এসে নিঃশব্দে হারায়। রাজু নেমন্তন্নর ছাপানো চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়ছিল। পড়া হয়ে গেলে দেবকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, চলো না বাবা, ঘুরে আসি।

দেখি—

তোমার ছাপা কবিতাগুলো বাড়ি আনো নি?

এনেছিলাম তো। রয়েছে কোথাও—

বেশ মজা হবে বাবা। একদিন তোমার কবিতাই হয়তো আমাদের পাঠ্য হয়ে যাবে। ক্লাসে পড়াবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলবো, মানে বলতে হবে না স্যার—রেখে দিন। আমার বাবার লেখা—বাড়িতে বুঝে নেব স্যার—

দূর পাগল! সবার কবিতা তো আর টেকস্ট্ হয় না।

লিখতে লিখতেই হয় বাবা।

তোর মা তো পছন্দই করে না।

তাতে কি। তুমি লিখে যাও বাবা।

দেবকুমার রান্নাঘর থেকে শেফালীর বাসনপত্র নাড়াচাড়ার আওয়াজ পাচ্ছিল। জানিস রাজু—কলকাতার এক একটা রাস্তা এক একদিন ইচ্ছেমত চেহারা পাল্টায়।

কি যে বলো বাবা! কলকাতা কি গিরগিটি?

হ্যাঁরে। সত্যি তাই। একদম বহুরূপী। আজ অফিসের পর একটা জায়গায় গেলাম—গিয়ে দেখি—যেখানে গিয়েছিলাম—সেখানে সেই রাস্তায়—সে জায়গাটাই নেই।

তোমার রাস্তা ভুল হয়েছে বাবা।

নারে। অফিসের পর বিকেল থাকতে থাকতেই গেছি। গিয়ে দেখি—কোথায় সাইনবোর্ড—কোথায় সে বাড়ি—কিছুই নেই সেখানে।

একদম বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছো বাবা।

সত্যি বলছি রাজু। তোর কথামতই এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।

কোথায়?

এলিটের কাছাকাছি—সেই মসল্লাপাড়ায় রানী রাসমণির বাড়ির গায়ে। রাস্তায় সাইনবোর্ড। দোতলায় চেম্বার। আজ অফিসের পর গিয়ে দেখি—কোথায় সাইনবোর্ড? সব ভোঁ-ভোঁ!! চেম্বারও হাবিস। সে বাড়িটাই নেই।

কি বলছো বাবা? রাস্তা থেকে একটা বাড়িই হাওয়া হয়ে গেল? নিশ্চয় তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছো। আজকাল তো তুমি কবিতা লেখো। আমি জানি—লেখকেরা বানিয়ে বানিয়ে লেখে।

নারে রাজু—একটুও বানিয়ে বলছি না। তুই যে ডাক্তার দেখাতে বললি—তাই তো গেলাম। কী সুন্দর ডাক্তার! আমায় নিয়ে এক তপোবনে গেল। সেখানে আমগাছতলায় প্রায় ধুনীর মত আগুন জ্বলছিল। চুনে হলুদ রংয়ের হরিণ—

থামো বাবা। এসব হতেই পারে না। এসব কিছুই ঘটে নি। এ তোমার স্বপ্ন নিশ্চয়—তোমার ঘুম হয় রাতে?

খোলা জানলা দিয়ে শীত আসছিল। সেটা ভেজিয়ে দিয়ে দেবকুমার ছেলের মুখে তাকালো। রাজু বড় হচ্ছে। মাথার ওপর বাবা না থাকলে কি হবে?—নিশ্চয় ভাবে। দেবকুমার আর কথা বাড়ালো না। আমি কি সত্যিই কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম? হয়তো ভেবেছিলাম—যাবো। আর যাওয়া হয় নি। তাহলে এই ডাক্তার—তার চেম্বার, গাড়ি—গাড়িতে করে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে অমন তপোবন—সবই কি আমার মাথা থেকে

বেরোলো ? না স্বপ্নে দেখেছি ? তাই এখন সত্যি মনে হচ্ছে। ইদানীং দেবকুমারের কাছে স্বপ্নে দেখা জিনিস—আর চোখের সামনে ঘটনা-ঘটা ব্যাপার—সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিংবা না-করা জিনিসগুলোর ভাবনা একদম সত্যি হয়ে দেখা দিচ্ছে।

পরদিন বিকেল যখন সন্ধ্যার সঙ্গে মিশে যাবে যাবে—তখন অসিত শেফালীকে দু'হাতে জড়িয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে চুমু খাচ্ছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শেফালী বললো, তোমার বন্ধুকে অফিস ফাইল দেয় না কেন ? একটা লোক বসে বসে মাইনে নিতে পারে ?

অসুবিধে কিসে ? কাজ কি একদম গায়ে কামড়াচ্ছে দেবুর ?

আবার জড়াবার জন্যে অসিত এগিয়ে আসতেই শেফালী সরে গেল। কাজ না পেলে তো ওর মাথাটা আরও গোলমাল করবে। একেই তো কেমন ঝুকে পড়া চেহারা হয়েছে। এক বছর আগেও যারা ওকে দেখেছে—এখন দেখলে চিনতেও পারবে না।

তুমি ভুল করছো শেফালী। ওর যে এখনো চাকরি আছে এই যথেষ্ট। কেউ কি দেখা ফাইল ট্রে-তে না রেখে রাস্তার দিকের খোলা জানলার প্যারাপেটে রাখে ? যদি উড়ে যেত—যদি বৃষ্টিতে ভিজে যেতো—

এখন বর্ষাকাল নয় অসিত।

স্বামীর জন্যে তো একেবারে উথলে উঠছো। শীত শেষের বাতাস তো ছেড়েছে। যদি উড়ে গিয়ে ফাইলগুলো নীচের ফুটপাতে পড়তো ?

তুমি আছো কি করতে অফিসে ?—বলতে বলতে শেফালী এগিয়ে গিয়ে শাড়ির ভাঁজ, কপালের টিপ সামলে অসিতকে দাঁড়ানো অবস্থাতেই বুকে নিল। ইদানীং অসিত অফিস থেকে ফিরেই সেন্ট

মাখে। গন্ধটা কামিনী ফুলের। এক ধরনের অন্ধকার গন্ধ। কালচে মতন।

অফিস তো আর হেলথ্‌ সেণ্টার নয় শেফালী। অফিস কি কখনো সুবিধে মত কাজ দেয়?

তা জানি। আজ দেখা হোল তোমার সঙ্গে?

আমি দেবুর ঘরে যাই নে। তবে খোঁজ নিয়েছি।

কি?

আজও যায় নি।

শেফালী আরও জোরে অসিত দত্তকে লেপটে নিল। এই সময়টায় ঋতুদির ঘোর ক্লাস। অফিস ঘরে কেউ থাকে না। শেফালীর পরিষ্কার মনে পড়লো—আজও দেবকুমার অফিসের জন্যে তৈরি হয়েই সময়মত বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

দেবকুমার বসু ঠিক এই সময় এলিটের কাছাকাছি রানী রাসমণির বাড়ির গা ধরে মসল্লা পট্টির চেনা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছুটো শুকনো লঙ্কার আড়ত। তারপরই সুগন্ধী জয়ত্রীর গন্ধ বাতাসে। অবিরাম লোকজন। এক জায়গায় দাঁড়ানো কঠিন। লোক ধাক্কা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় সেই সাইনবোর্ড? কোন চিহ্নই নেই। আজ নিয়ে দেবকুমার চারদিন এখানে এলো। সেই চেনা সিঁড়িটাও নেই। এখানেই তো বাড়িটা ছিল। কেউ একেবারে ন্যাতা দিয়ে মুছে নিয়ে গেছে সবকিছু। আশ্চর্য! এখানেই তো এসেছিলাম।

তাহলে কি এটা সেই রকমের বাড়ি—সেই রকমের রাস্তা—যেমন আর কি আমি লোকজন দেখতে পাই ঘরের ভেতর বসে বসে পড়ার সময়—খোলা দরজার ওপাশেই—চোখ তুলে তাকালেই তারা মুছে যায়—পড়ার জন্যে চোখ নামালেই তারা আবার খোলা দরজার বাতাসে ফুটে ওঠে!

চোখের এক পর্দা ওপাশেই যার ফুটে ওঠার
সে ফোটে।
তাকাতেই যে আলো গিয়ে তাকে বেঁধে
তাতে সে মুছে যায়।
এক পদার বেফাঁসে সে ভাসে
সে আসে।

এটা কি দূরদৃষ্টি? না অন্তর্দৃষ্টি? কিংবা দিব্যদৃষ্টি? মন না মতিভ্রম? না চোখের ভুল?

বাতাসে যখন দৃশ্যমান—বৃক্ষ যখন ফলবতী
আগাপাশতলা দৃষ্টির নাম দর্শন।
মতি কি মনের তো ভুল হওয়ায় কথা নয়
চোখের নামই তো অন্ধকার
যেমন অন্ধকার তাবৎ প্রগাঢ় গন্ধ।

দেবকুমার আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সে জানে এর কোন লাইনই আর তার মাথায় ফিরে আসবে না। কেন না, সে ভুলে যাবেই। এই লাইনগুলো চিবিয়ে যদি দাঁতে চিউইং গাম করে লটকে রাখা যেতো—তাহলে বাড়ি ফিরে ঠিক ডাইরিতে টুকে রাখতে পারতো। কিন্তু সে তো হবার নয়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, ডাক্তারী চেম্বার সমেত একটা বাড়ি মুছে যাচ্ছে এখানে—এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পৃথিবীতে এই যে আলো দেখা যায়—এই আলোর চোকলা তুলে ফেলতে পারলে আরেকটা আলো আছে—সে আলো দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতায় ছটা হয়ে বেরোয়। সেই আলোয় এখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ি—সকল প্রকার গুপ্ত রোগ—ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরা রোগ—গ্যারান্টি সহকারে সারানোর সাইনবোর্ড, ডক্টর কাবাসির চেম্বার সমেত দোতলাটা গা ঢাকা দিয়ে মিশে আছে। এই বাইরের আলোটার চোকলা খসাতে পারলেই সব ফুটে উঠবে।

আজ অফিসের নামে বেরিয়ে সেই ওবেলা থেকেই এ জায়গায় ঘোরাঘুরি করছে দেবকুমার বসু। এখন শীত থাকে সকাল আটটা অবধি। তারপর গরম পড়তে থাকে। আবার সন্ধ্যের আগে আগে শীত ফিরে আসে। সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে দু'জন ঠেলাওয়ালা ফাঁকা ঠেলা ঠেলে করপোরেশন বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তাদের একজনের হাতে একটা ঠোঙার ভেতর কুপি জ্বলছিল। এটাই নাকি পুলিসের ট্রাফিক আইন। এরকম আগেও দেখেছে দেবকুমার। ওটা হোল গিয়ে ঠেলার ব্যাক লাইট। আর এই চলন্ত আজগুবি আলোর উল্টো দিকের ফুটপাতে তিন কুষ্ঠরোগী বুকে সাইনবোর্ড লটকে কর্তাল বাজাচ্ছে। ভিক্ষের ঝুলি বলতে পাকা লাউয়ের খোল। দড়ি দিয়ে গলায় ঝোলানো। পিঠের দিকে। তাতে পয়সাও পড়ছে। রাস্তা, ফুটপাত—লোকে লোকারণ্য। তার ভেতরে হাত রিক্সো। সব মিলিয়ে দেবকুমারের বার বার মনে হোল—এই রাস্তার নাম নিশ্চয়ই আশা। একটু পরে তার জন্যে এ পথে কিছু একটা হয়ে যাবে। মন ভরে গিয়ে একটা বিশ্বাসও ফিরে আসছিল।

তাই ভেবে দাঁড়িয়েও থাকলো দেবকুমার। এই পথ দিয়েই ডক্টর কাবাসি ফিরে আসতে পারে। আসতে পারে আগেকার শেফালী। যার মুখ কোথাও কোঁচকায় নি। খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলো—এসব কিছুই ঘটবে না—ঘটার নয়।

তখন ঝুপ ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে পড়ছিল। সেই সঙ্গে শীত। চাদরে ঢাকা লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। দেবকুমারও হনহন করে হাঁটতে লাগলো। যে করেই হোক—সে আজ সেই আমগাছটার কাছাকাছি যাবে। তারপর হরিণ সমেত ডক্টর কাবাসির ডাকে যে লোকটি এগিয়ে এসেছিল—এসে রাংতা মোড়া খুদে এক কুলের বীচি মত জিনিসটা পুড়িয়ে তার জন্যে সেজে দিয়েছিল—তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জাপটে ধরবে সুকুমারদা নামে ওই লোকটাকে।

আপনাকে আমি চিনি। মানে আপনার লেখা পড়েছি। তাছাড়া, এ হরিণ আপনারই। সেও আমরা জানি। আলোর চোকলা তুলে ফেলার পর যে আলো বেরিয়ে পড়ে—তাতেই তো আপনি থাকেন—দেব সাহিত্য কুটীরের ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতায়। আপনি সুকুমার দে সরকার। কিন্তু এই তপোবন? এই আমগাছ? তদুপরি এই ডাক্তার? কি ব্যাপার?

মেডিকেল কলেজটার পেছনে এসে দেবকুমার সেন্ট্রাল অ্যাভিনু থেকে বড়াল স্ট্রীটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। বাঁ হাতে হাসপাতালের শেষ দেওয়াল। কিন্তু কোথায়? আমগাছের কোন চিহ্নও নেই। একদিনে কেটে ফেলে নি তো? বেয়ে উঠতে গিয়ে কনুইয়ের ছাল উঠে গেল। হাসপাতালের দোতলা থেকে আলো এসে পড়ায় জায়গাটির সব কিছু পরিষ্কার। কোন আমগাছই নেই। সেই সবাই মিলে বসার জায়গাটায় তিন চারখানা লাল রংয়ের একতলা বাড়ি। পরিষ্কার বোঝা যায়—ক্লাস ফোর স্টাফের ঘরদোর।

সেখান থেকেই একজন লোক আধো অন্ধকারে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কে? কে রে ওখানে?

গোড়ায় বুঝতে পারে নি দেবকুমার। বুঝেই পাঁচিলের ওপর থেকে নীচে লাফ দিল। না দিয়ে উপায়ও ছিল না। কেন না, লোকটা আর দাঁড়িয়ে থাকে নি। সোজা দেওয়ালের দিকে ছুটে আসছিল। মনে হোল, সেই সঙ্গে আরও দু' তিন জনও।

নীচে অন্ধকারে পড়ে গিয়েও দাঁড়াতে হোল দেবকুমারকে। কেন না, দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়। দুড়দাড় পায়ের আওয়াজ। দেবকুমার ভেবেছিল—অন্ততঃ হরিণটাকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার বদলে—

ডান পায়ের গোড়ালির জয়েন্ট বোধহয় ভেঙে গেল। সেই অবস্থাতেই যা থাকে কপালে—এই ভাবে লেংচে লেংচে

দোকানের ফাঁকা আলোয় দেবকুমার পথের ভিড়ে মিশতে চেষ্টা করলো।

সে প্রায় মিশে যাচ্ছিল—এমন সময় পেছনের হুড়দাড় দৌড়ের শব্দে চোর চোর কথাটা উঁচু গলায় দরুন তার কান ভরে দিচ্ছিল। তখনো দেবকুমার ভাবতে চাইলো—অমন একটা আমগাছ—হরিণ সমেত জায়গাটা মুছে গেল? কিন্তু এ ভাবনাও তাকে অন্যমনস্ক করতে পারলো না। কেন না, পুরো গোলমালটাই তখন তারই পেছনে।

এ ক'মাসে নিজের পাড়ার ভেতর দেবকুমার একটা অভ্যাস করেছিল। তার ইদানীংকার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে—মানে বয়সের ছাপের সঙ্গে তাল রেখে যতটা মানায়—সে ভাবেই হাঁটাচলা করছিল। অনেক জোরে পা ফেলতে পারলেও—সে ইচ্ছে করেই তার এখনকার বাইরের চেহারা—অন্ততঃ যা কিনা প্রথম ধরা পড়ে রাজুর চোখে—অনুযায়ী সে চেনা এলাকার ভেতর চলাচল করে দেখে আসছে। এতে বরং জানা মানুষজন সুখীই হয়। কারণ, ওদের জানাশুনো জিনিসের সঙ্গে সব খাপে খাপে মিলে যায়।

পাড়া থেকে বেরিয়েই কিন্তু দেবকুমার তার ভেতরকার শক্তি যা বলে সেই মত হাঁটাচলা করে। বিশেষ করে ফুটপাত দিয়ে যাওয়ার সময়। তার ট্রামবাস থেকে নামার সময় কিংবা উঠতে গিয়ে সে যতটা পারে তার চেয়ে অনেক ধীরে সুস্থে ওঠে—ধীরে সুস্থে নামে। লোকের চোখে তার যে চেহারা সেই মত করে আর কি তখন।

এবার সে দৌড়োচ্ছিল। হাসপাতালের মাঠে চাকা বসে যাওয়া ভাঙা গাড়ির আশেপাশে যারা বসে থাকে—সেই ঝাঁটা হাতে চেহারার পাঁচ ছ'জন ছুটে আসছিল। টায়ারের দোকান। ফুটপাতে এখনো নারকেলি কুলের ডালা সাজিয়ে ব্যাপারী। একটা গাড়ির গায়ে লেখা—ইসটেড্ ১৯৩৭।

এই তো—বলেই একজন প্রায় দেবকুমারকে ধরে ফেলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভিড়, রিক্‌শা, হিন্দুস্থানী পরামানিকের বাক্স জিগজাগ করে দৌড়তে লাগলো। দৌড়তে গিয়েও দেবকুমার বুঝতে পারছিল—তাকে ধাওয়া করে আসা দঙ্গলটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কেন না, এই চেহারার লোকে যে অমন দৌড়তে পারে—সে আন্দাজ কার বা থাকে ?

ওরা এই ধরে ফেলে—দেবকুমার আবার দূরে সরে যায়। তার পোশাকে দেওয়াল ঘষটানোর দাগ। এ ছাড়া তো তাকে সনাক্ত করার কোন চিহ্নই ছিল না। বুকের ভেতর বড় হাতার সাইজের হার্টখানা বুকের দুই পাল্লা কবাটে এলেবেলে দোল খাচ্ছিল। তাতে হাঁফ ধরে যাওয়ার যোগাড়।

ছুটে আসা দঙ্গলটা এখন তাকে ধরে ফেলার আনন্দের চেয়ে অনেক বড় মজায় হাউস করে চেঁচাচ্ছিল। কেন না, এই চেহারার লোক যে এমন মজা দিয়ে দৌড়তে পারে, ভিড়ের ভেতর পাশ কাটানো সে দৌড় দেখায় যে একটা আনন্দ থাকে—এটা ওদের আগে জানা ছিল না। রাস্তার লোক হকচকিয়ে উঠছিল। বিরক্তও হচ্ছিল। আর ওরা সাতশো মজায় চেঁচিয়ে উঠছিল।

দেবকুমার বুঝতে পারলো—ওরা তাকে দৌড় করাতেই চায়। দৌড়ে দৌড়ে একসময় থেমে পড়লে—ওরা এসে তাকে ক্যাঁক করে ধরবে। তখন আরও বেশী করে চোর চোর চেঁচালেই হোল। এখন শুধু তার দমটা ফুরিয়ে দিচ্ছে। দেবকুমারেরও মন্দ লাগছিল না। অনেকদিন আগে মেট্রোতে আসল ছবি শুরু হওয়ার আগে হ্যাণ্ডিকাপে ঘোড়দৌড় দেখাতো। তার আগে তিনবার ডেকে পর্দায় একটা সিংহ মুছে যেতো। অথচ নিউজরিলের নাম ছিল—মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার। আজ সে এতকাল পরে নিজেই যেন হ্যাণ্ডিক্যাপের অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া।

ধরা পড়ে যাবে যাবে এই অবস্থায় দেবকুমার একটা কালো

ভ্যানের চাকার আড়ালে বসে পড়লো। এ জায়গাটায় অন্ধকার আমসত্ত্ব হয়ে ছিল। উল্টো দিকেই এয়ার লাইন্সের বাড়ি। কার্পেট ধোলাইয়ের একটা বড় দোকানের ভেতর আলো। একটা বাড়ির ভেতর থেকে মার্কারি ল্যাম্পের ছটা। সে আলোর মোজাইক সিঁড়ি পাক খেয়ে মেজানিল ফ্লোরে গুলিয়ে গেছে। দেবকুমার বসু হামাগুড়ি দিতে দিতে ঢুকে পড়লো। তার আর দম ছিল না।

সন্ধেবেলার শীতে দৌড়ে দৌড়ে কান গলা গরম। বুক হাপর হয়ে উঠছে নামছে। অফিস পাড়ার এ-বাড়ির ভেতরটা একদম চুপচাপ। শুধু এই দেড়তলায় ধাঁধালো আলো। কাঁচের বড় পার্টিশন। রাস্তা থেকে তো দেখা যাচ্ছিল না। নিশ্চয় বাইরে থেকে কোন বড় সাইনবোর্ডের আড়ালে পড়েছে।

কাচের সুইংডোর একটু ঠেলতেই ঝপাং করে খুলে গেল। আর অমনি ভেতর থেকে মাজা মেয়েলী গলা বেরিয়ে এলো। ইয়েস। উই আর ওপেন।

কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না দেবকুমার। এইমাত্র মেয়েমানুষের গলার এই দৈববাণী তাকে চমকে দিয়েছে। নজরে এলো— সুইংডোরে প্ল্যাস্টিকের ছোট নোটিস ঝুলছে। ইংরেজীতে। ওয়েলকাম। উই আর ওপেন।

সাবধানে এক পা এগোতে এগোতে দেবকুমার দেখলো, কাঁচের তাকে সারি সারি মেয়েমানুষের মাথা। সবই প্ল্যাস্টিকের কাটা মুণ্ডু। তবে তাদের মাথায় এক এক কিসমের পরচুলা বসানো। ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দর খোঁপা সব। কিসের দোকান বুঝতে পারলো দেবকুমার। মনে মনে বললো, এমন চুপচাপ বাড়িতে মেয়েরা চুল কাটতে আসে? তাও সন্ধেবেলায়?

দেবকুমারকে দেখে যে চমকে উঠলো—সে একজন মেয়েমানুষ। জিনসের হিপ পকেটে দুটো বড় তুলির ডগা। গায়ে কপিং রংয়ের

কার্ডিগান। বয়েজ কাট মাথায় চুলের ডান ঢালে ইন্দিরা গান্ধীর সাদা। বাঁ-হাতের কব্‌জিতে পুরুষদের এইচ. এম. টি। মেটাল বডির। মুখে কোথাও ছায়া নেই। দাগ নেই। দ্বিধা নেই। চশমার ওপিঠে ঝকঝক করছে চোখ। এদেরই শীতকালে সর্দি হলে নাকের ডগা লাল হয়। সেটাও বিউটি।

দেবকুমারকে আঙুল তুলে কি বলতে যাচ্ছিল মহিলা। আঙুলের ডগার নখগুলো উল্টোদিকের বিরাট আয়নায় অ্যাকোরিয়ামের মাছ হয়ে ঝিলমিল করে মিলিয়ে গেল। আর অমনি দেবকুমার বসু চেঁচিয়ে উঠলো। তুমি কণা?

মহিলা মহিলাই মনে হচ্ছিল দেবকুমারের। একটু দমে গিয়ে কণা মনে হওয়া মহিলা চশমার ফ্রেমের মাঝখানটা ওপর দিকে ঠেলে ভ্রূ মধ্যে পাঠিয়ে দিলো। আপনি? চিনতে পারছি না তো। এখানে শুধু মেয়েরাই আসে—

আমি দেবকুমার বসু। সেই যে—চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু দেখেই—

চিনেছি। এটা মেয়েদের বিউটি পারলার। আপনি বরং—

আপনি আপনি করছো কেন আমায়? আমি বুড়ো হয়ে গেছি বলে?

বুড়ো হলে আমার তো কিছু যায় আসে না দেবুবাবু।

আমি কিন্তু আসলে বুড়ো নই কণা।

হলেনই বা! তাতে আমার কি?

তোমার মুখ কিন্তু তেমনি কাঁচাই আছে। শুধু চুলটা একদিকে পেকে কিন্তু বেশী ডিগনিফায়েড লাগছে।

পাকে নি। ডাই করিয়েছি—সাদা রংয়ে—ওদিকটায়।

॥ আট ॥

বেলা বারোটায় অফিসে ঢুকে দেবকুমার আজ পাঁচটা অব্দি টেবিলে টাইট হয়ে লেগে থাকলো। চেয়ার থেকে একবারও উঠলো না। পাঁচটা নাগাদ তার ঘরে যেই অমিয় সাঁতরা ঢুকলো—অমনি সে আরও কঠিন হয়ে বসলো। কাঠের চেয়ারটা একদম নরম নয়। তবু ফাঁকা টেবিলে কনুই রেখে বসে থাকলো দেবকুমার। কী ফাউল প্লে ছোকরা খেলে—কে জানে? সাবধানের মার নেই। দেবকুমার চেয়ারে বসে বসেই দেখতে পাচ্ছিল—অমিয়র হাতা গোটানো শার্টের বাইরে মাংসল কনুই। তাতে গৌর চামড়ার ওপর কালো কালো লোম। ক'বছর আগে যখন এ অফিসে অমিয় ঢোকে, তখনকার চেহারা মনে আছে দেবকুমারের। রোগা মত। এখন তো মুটিয়ে যাবার ধাত এসে গেছে শরীরে।

বাড়ি যান স্যার। অফিস তো ছুটি হয়ে গেল।

এই যাবো।

পাখা চালান নি? গরম পড়ে গেছে তো ভীষণ।

দেবকুমার জানালা দিয়ে আকাশে এক জায়গার ত্রিভুজ মত দেখতে পাচ্ছিল। মেঘের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য এখন বৃষ্টি হওয়ার সময় নয়। এবারও কি বৃষ্টি উধাও হয়ে যাবে? অমিয় সাঁতরার কথার পিঠে কথা সাজাতে হবেই, বললো, চলছিল এতক্ষণ। মনে মনে বললো, এত সাহস পায় কোত্থেকে? কখন যাবো না যাবো—সে কথা বলার তুই কে? একথা আগে বললে দেবকুমার স্টার্ন মেজাজ নিত। এখন তার নিজের অফিসটাকেই সে বুঝতে পারে না। পরিষ্কার লাগে না তার। ফাইলপত্তর

কিছু আসেও না টেবিলে। সাপ্লায়ারদের সঙ্গে করিডরে দেখা হলে তারা বোকা হয়ে গিয়ে তাকায়। কিন্তু কাছে ঘেঁষে না। আসলে বৃষ্টি না আসতেই হিম পড়ে গিয়ে এই পাঁচ ছ'মাসে তার কি সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। বৃষ্টি না হলে রোদে জ্বলে যাওয়া শুকনো মাঠে একটা ছাগলকে সে কাসতে দেখতে পায়। তার সরু সরু খুরে মাঠের ধুলো খোঁচা খেয়ে উঠে আসছে। কোথাও ছায়া নেই। এমন একটা সময়েই বোধহয় আমি আচমকা বুড়ো হয়ে গেলাম। এটা নিশ্চয় আবহাওয়ার এফেক্ট। হয়তো লাখে একজন মানুষের এমন ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরে যায়। ভেতরকার এই ঘুণের বাইরেকার সব ছাপ এখন আমার চেহারায় ফুটে উঠছে।

অমিয় সাঁতরা টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বললো, আপনি তো স্যার ইউনিয়নকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। ইউনিয়নের জন্যেই আপনার চাকরিটা এখনো আছে কিন্তু।

তাই বুঝি! বলে খোলাখুলি হাসলো দেবকুমার। তখন সে মনে মনে বলছিল—তবে যে শেফালী বলে—অসিত নাকি আমার চাকরিটা রেখে দিয়েছে। সেজন্যে সিধে এমাসে বাড়িতে মাইনেটা পাঠিয়ে দিয়েছে শেফালীর হাতে।

আমরা না থাকলে আপনার চাকরি থাকতো না স্যার?

শুনে সুখী হলাম। কি করতে হবে তোমার জন্যে?

কিছু না। আপনার শরীর ভালো নয়। বাড়ি যান। শুধু শুধু অফিসে এসে বসে থাকেন কেন? ছুটি তো অনেক জমা আছে। ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন না।

ফাঁকা অফিসে অমিয় সাঁতরার গলা গমগম করে উঠলো। দেবকুমার অমিয়র গলায় তার নিজের ডেথ্ সেণ্টেন্স শুনতে পাচ্ছিল। নিজেই বুঝতে পারছিল—কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না। ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গী দেখে আন্দাজে জবাব দিতে হচ্ছিল

দেবকুমারের। সে জানে—এখন তার নিজের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রায় নিজের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল। দয়ায় টিঁকে থাকা চাকরির জন্যেই এই মুখের মালিককে এখন অমিয় সাঁতরার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর চেয়ে অপমানের আর কি হতে পারে?

বাড়ি চলে যান না স্যার।

এই যাচ্ছি—বলেই দেবকুমার লাফিয়ে উঠলো। আমাকে আজকাল ফাইল পাঠাচ্ছো না কেন তোমরা?

আর কোনদিন ফাইল আসবে না আপনার কাছে।

মানে?

এত মানে জেনে লাভ কি আপনার? যান না—বাড়ি চলে যান।

কেন? তুমি এখন সারা অফিসের পাখাগুলোয় তেল দেবে?

হ্যাঁ। তাই দেবো। যান তো—বাড়ি যান।

লিফট্‌ম্যান নমস্কার করলো দেবকুমারকে। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে তারই জন্যে অনেকক্ষণ ধরে দরজা খুললো। দেবকুমার বেরিয়ে যাবার সময় তাকে বললো, একটা করে ডাব খাইবেন—রোজ ছ'পহরে—

পাঁচটার পরেও চনচন করছে রোদ। দেবকুমার ঠিক করলো, আজ একবার রানী রাসমণির বাড়ির গায়ে সেই জয়ন্ত্রীর সুগন্ধী দোকানীর কাছে যাবে। অনেকদিন যাওয়া হয় না। ডক্টর কাবাসি আর তার চেম্বারটা খুঁজে বের করবে। ভালো করে খুঁজলে ঠিকই পাওয়া যায়। কোথায় যেতে পারে আস্ত একটা বাড়ি? আমার সঙ্গে কথা বললো মানুষটা। রীতিমত চেম্বারওয়ালা ডাক্তার।

হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে এসে দেবকুমারের মনে সন্দেহ হোল—একটু আগে ফাঁকা অফিসে অমিয় সাঁতরার সঙ্গে যা হোল

—তা কি আদৌ হয়েছে ? না—সবই আমার কল্পনা ? গত বর্ষায় বর্ষা না হয়ে আমার যে কী সর্বনাশ হয়ে গেল। এ যে কি এক ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরা রোগ। না আছে ট্যাবলেট। না ক্যাপস্যুল। বডির কোন এক জায়গায় অপারেশন করে যে আমার শরীর থেকে বুড়োটে মেরে যাওয়ার টিউমারটা বের করে দেওয়া যাবে—তাও নয়। তাহলে এখন আমি কি করি ?

রানী রাসমণির বাড়ির গা ধরে যে রাস্তা—তাতে না পড়ে দেবকুমার ফলের গলিতে পড়লো। জায়গাটায় হিণ্ডেলিয়ামের বাসনের দোকান, প্রেসার কুকার, মাছি আর গাদা গাদা আমসত্ত্ব, নাসপাতি, বেদানা। কলকাতা না ঘুমোলে তার গায়েও থিকথিক করে লোক। এমন একটা রাস্তা দিয়ে এগোতে গিয়ে সে বুঝলো—জীবনেও ফলেরই ধারায় রস আসে। তার জীবনের রস এখন শরীরের তলানীতে কোথাও গত বর্ষাটার মতই সেঁধিয়ে গেছে। এ রস টেনে টেনে বের করতে পারলেই বডি থেকে ঘুণ ধরার গুপ্ত রোগটাকে উচ্ছেদ করা যেতো।

রস বোধহয় মানুষের সঙ্গে মানুষের মেশামিশিতে থাকে। আমি কেন কোথাও কারও সঙ্গী হতে পারছি না ? রুণু বিয়ে হয়ে চলে গেল। সে এখন অন্য এক বাড়ির বউ। সেখানে তার দেওর, স্বামী, শ্বশুর, ননদদের নিয়ে নতুন জীবন। আমারও তো শেফালীর সঙ্গে নতুন জীবন হওয়ার কথা ছিল। হতে হতে হোল না।

অসিত তো আমার বন্ধু। তোমার কিছু নয় শেফালী। আমার অফিসের কলিগ মাত্র। ওদের বাড়ি আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি কি করে ঋতুকে ঋতুদি বলে ডাকো ? ওদের ইস্কুলে মাষ্টারি করো ? টাকা পাও ? তোমার লজ্জা করে না। আসলে তো আমি আর তুমি কাছাকাছির লোক।

মানুষ কি করে আশি নব্বই বছর বাঁচে ? আমি যদি বাঁচি—তো আমাকে আরও চল্লিশ বছর এ পৃথিবীতে থাকতে হবে। কার

সঙ্গে থাকবো? কাদের সঙ্গে মিশবো? কি করে মিশবো? পৃথিবীতে সব সময় নতুন লোক এসে যাচ্ছে। আজ যে-বাড়িতে আমি ভাড়া আছি—সে বাড়িতে বাহান্ন বছর পরে নতুন একজন ভাড়াটে দক্ষিণের জানলার পাশে তার বুকর‍্যাক সাজাতে পারে। তেত্রিশ বছর আগে এ বাড়িতেই একজন দারোগা থাকতেন। তিনি বর্ষাকালে রোদ উঠলে জিভ বের করা বুট সামনের বারান্দায় শুকোতে দিতেন। এই সাতচল্লিশেই আমি বুঝতে পারছি—আমি ভুল জায়গায়—ভুলভাবে এসে গেছি। কোন্‌টা সঠিক তা আমি জানি না। কিন্তু এটা যে ভুল—তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আট বছর বয়সে ভাবতাম—কবে আমাদের নিজেদের একটা ক্যারাম বোর্ড হবে? তাহলে এক গেম খেলেই পরের বোর্ড আর ছেড়ে দিতে হবে না। বারো বছর বয়সে ভেবেছিলাম—নিজে যখন চাকরি করবো—তখন বড় এক বাটিতে পাঁউরুটি ভিজিয়ে বড় দানার জাভার চিনি মাখিয়ে আস্তে আস্তে খাবো। তারপর একদিন সতেরো বছর বয়সে জানতে পারলাম—ক্যারাম বোর্ড বা পাঁউরুটি বড় হওয়ায় আগেই কেনা যায়। তখন আমি এক ক্লাস নীচের ছাত্র পড়িয়ে মাসে পঞ্চাশ টাকার টিউশুনি করি। শেফালীর সঙ্গে ফুলশয্যার রাতে ভীষণ গরম ছিল। ওর গলার মালা থেকে একটা পিঁপড়ে বেরিয়ে আমার চোখে কামড়ালো।

তখনো কি জানি ছাই জীবন এমন হয়ে যাবে! জানলে কী আর অ্যাতো জড়াতাম। কবে অল্লের ওপর দিয়ে একটা কম ভাবনার—একটা কম খরচার লাইফ বানিয়ে নিতাম—যা কিনা ঘচাং হয়ে গেলেও কোন আপসোস থাকতো না। নো রিগ্রেটস্। কেননা আমি তো তৈরিই থাকতাম।

কিন্তু এত অভিযোগ, এত বিষাদ—এসব নিয়ে আমি এখন কোথায় যাই? আমি ভগবান করি নি কোনদিন। ভগবানের

জানি না কিছু। ভগবান নিশ্চয় একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু ও লাইনে আমার কোন ট্রেনিং নেই।

বছরের প্রথম গরমের মুখে কলকাতা একদম থম মেরে আছে। এসপ্ল্যানেড্ জুড়ে মানুষের ভিড় দলা পাকিয়ে পাকিয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এর ভেতর আমার হারিয়ে যাওয়া সহজ। দশজনের একজন হয়ে গেলে আমি বুড়ো কী গুঁড়ো, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার থাকে না। কিন্তু এর ভেতর থেকে আমি বেরিয়ে এলেই—দেবকুমার বসু—এবং একা—অর্থাৎ ডক্টর কাবাসির কথামত আমার বডির কোন জায়গা নীল হয়ে ফেটে ফেটে যেতে পারে। এই একা হয়ে যাওয়াটা যে কী কদাকার—

এর চেয়ে যদি সব ভুলে যেতে পারতাম। তাহলে আবার সবকিছু অ্যানিউ। আবার অ্যাফ্রেশ। বাড়ি ফিরে যেতে শেফালী আমায় গা ধুয়ে আসতে বললো। অথচ আমি শেফালীকে চিনতে পারলাম না। শেফালীর কথাও বুঝতে পারছি না। জীবন মানে কিছু স্মৃতি আর সঙ্গ জোড়া দিলে যা হয়—তাই। রাজু এসে বাবা ডাকতেই আমার মনে হতে পারে—বাঃ! বেশ তো খোকনটি—কিন্তু কে এই খোকা—তা তো আমি জানি না।

অফিসের লোক রাস্তায় দেখতে পেয়ে যদি ডাকে—ও দেবকুমারবাবু। আমি তো সাড়া দেবো না। কেননা—আমি সব ভুলে গিয়ে একজন নতুন লোক। আমাকে কেউ নাম দিয়ে মার্কা মেরে দেয় নি তখনো।

সেও তো এক নিদারুণ ভয়ঙ্কর অবস্থা। স্মৃতি, অতীত, মানুষ—এদের তিন জনের ভেতর কে বয়সে বড়—তাই আগে ঠিক হোক। এরকম একটা দ্বিধা মাখানো অবস্থায় দেবকুমার বসু রাস্তা ক্রস করতে পারলো না। একটি দয়ালু শেয়ারের ট্যাক্সি তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমার উঠে বসলো।

বাড়ি ফিরে বাথরুম থেকে চান করে দেবকুমার গুনগুন করে

শেফালীকে গাইতে শুনলো। বসুন্ধ ইটিং লজের ছ'নম্বর ঘরে ড্রেসিং টেবিল। তার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি সাজা অবস্থায় শেফালি ছ'খানা হাতই পেছনে পাঠিয়ে নিজের খোঁপায় একটা লাল ফুল বসাচ্ছিল।

দেবকুমার পাশে এসে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো, এখন কোথায় যাচ্ছো? আমি এই অফিস থেকে এলাম—

শেফালী গোড়ায় কোন জবাব দিল না। দেবকুমার দেখতে পাচ্ছিল—সে তার মাথার কালো চুলগুলো চিরুণির দাঁতে সিঁথির ছ'পাশে পাড় ভেঙে সাজিয়ে নিচ্ছে। শেফালী দেখছিল—তার স্বামী এক মাথা পাকা চুল চিরুণির দাঁতে ছ'পাটে ভাঁজ করে দিচ্ছে। কণ্ঠার হাড় জেগে গেছে। কলারবোন মাংসের অভাবে খুবই নিরাভরণ। এই কি আমার স্বামী?

অফিস থেকে এলাম—এখুনি তুমি বেরোবে?

তুমি যে কি রকম অফিস করো সে তো আমি জানি। মোলায়েম করে হেসে শেফালী তার কানের পাশের চুল ঠিক করছিল।

এখন কোথায় যাচ্ছো?

তা তোমায় বলা যায়! আমাদের ইস্কুলের অ্যানুয়াল—

তোমাদের স্কুল? তুমি কি এখন অসিতদের—

তা বলতে পারো! ঋতুদি আমায় বাদ দিয়ে কিছু করে না।

দেবকুমার সমান তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, ওরাই তো আমার চাকরিটা রেখেছে!

রেখেইছে তো। একথা বলতে গিয়ে শেফালী তার মাথার চুল ঠিক করা বন্ধ করে ফেললো।

তাই তো—

শেফালীর এবার চোখ কুঁচকে গেল। অফিসে যাও না। গেলে ফাইল রেখে দাও জানলার তাকে। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকে। অসিতবাবু বলে-কয়েই তো তোমার চাকরিটা রেখেছে।

তাই বুঝিয়েছে বুঝি অসিত ?

আমাকে কেউ আলাদা করে কিছু বোঝায় নি। আমি নিজে যেটুকু বুঝি—তাই বললাম। কুৎসিত ইঙ্গিত কোরো না। তুমি ভালো করেই জানো—অফিস কোন পাগলের জন্যে হেলথ্ সেণ্টার খুলে বসে থাকতে পারে না।

দেবকুমার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে এলো। আমি পাগল ?

না হলেও ভান করছো তো পাগলের !

ভান ! আমি ? তোমরা কি করছো ? তোমরা কেন আমায় আচমকা বুড়ো দেখতে শুরু করলে ?

বুড়ো হলেই বুড়ো ছাখে লোকে। আর কথা বললে দেরি হয়ে যাবে আমার—

আমি এখন ভাত খাবো।

বেড়ে নাও। আর সব তো টেবিলে সাজানো রয়েছে।

রাজু খাবে না ?

ঘুমোচ্ছে। আমি এসে বেড়ে দেব।

মশারি টাঙিয়ে দিয়েছো ? নয় তো মশা কামড়াবে।

স্কুল থেকে এসে ঘুমোচ্ছে বিকেল থেকে। তুমি খেয়ে নিয়ে দিও। বলেই শেফালী তার পুরনো স্বামীর চোখের সামনে দিয়ে ফুল্লকুসুমিত ঢংয়ে বেরিয়ে গেল।

দেবকুমারের মনে অনেক কথাই আসছিল। এই যেমন—আজ আর বেরিয়ে কি হবে শেফালী ? থাকোই না সন্ধ্যেটা বাড়িতে, কিংবা একসঙ্গে খেতে বসবো আজ। আমার জন্যে আতপ চাল ভিজিয়ে রেখো তো। পেচ্ছাব হচ্ছে না ঠিকমত। কাল সকাল থেকে খাবো।

কিন্তু এর কোন কথাই সে বলতে পারলো না। বসুজ ইটিং লজের সদর দরজা ফাঁকা স্কুল বাড়ির দরজা হয়ে ঝুলে পড়েছে—

খোলা। বাইরে অন্ধকার। ভেতরে আলো। ইটিং লজের তিন নম্বর বোর্ডার তখন অঘোর ঘুমে। দু'নম্বর বোর্ডারের বিছানায়। দেবকুমার মশারি টানাতে গিয়ে খুব মন দিয়ে ঘুমন্ত রাজুর মুখখানা দেখলো। আমার নিজেরই উৎপন্ন পণ্য। সবে লম্বা হয়ে উঠছে।

খেতে বসে দেবকুমার লক্ষ্য করলো, তার চোয়াল ঠিকমত কাজ করছে বটে—কিন্তু যেসব জিনিস চিবিয়ে ছাতু করতে হচ্ছে—তা সবই সে এতকাল একই কায়দায় মণ্ড করে গলা দিয়ে পাকস্থলীতে পাঠিয়েছে। বডির ভেতরকার গলিঘুঁজিও পুরনো হয়ে এলো। জীবনে নতুন থাকাই একটা কঠিন কাজ। ভাল লাগছিল না খেতে। একা আলো জ্বালিয়ে মাছের মাথা কড়মড়িয়ে খেতে খেতে মনে হচ্ছে—আমি মানুষ না—আমি জন্তু। দেবকুমার উঠে পড়লো। আঁচিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলো, কুলকুচি করা দরকার। কিন্তু কুলকুচি হচ্ছে না। তখন একগাল জল নিয়ে মাথাসুদ্ধ দু'গাল ঝাঁকাতে লাগলো। তাতে যদি মুখের ভেতর জল গড়িয়ে এদিক ওদিক যায়। কায়দাটা মন্দ না। নরমাল কুলকুচির অভাবে খারাপ কি! কিন্তু বেশীক্ষণ করা যায় না। খুব পাকা কদবেলের কায়দায় মাথা নাড়লেই ভেতরে ঘিলুটা চলঢল করে। চাই কি মাথা ধরে যেতে পারে।

ফাঁকা বাড়িতে একগ্লাস জল হাতে দেবকুমার আয়নার সামনে গেল। জল এক ঢোক মুখে নিয়ে কুলকুচো করতে গেল। সত্যিই হচ্ছে না। আশ্চর্য! এটাই কি বুড়োটে মেরে যাবার সাইন। আয়নার কাছে মুখ নিয়ে তার বুক হিম হয়ে গেল। একি দশা তার? এসব কবে হোল?

মুখের ভেতরের জলের ঢোকটা ঠোঁটের দু'কষ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়াচ্ছে। এখন তো এমন হওয়ার কথা নয় তার। এসব তো বেশ বেশী বয়সের সিমটম। আর একেবারে শেষে তো বডি

কোন জল নেয় না। এমন কি গঙ্গাজলও গড়িয়ে পড়ে দু'কষ ধরে। তবে ?

আয়নায় নাক ঠেকিয়ে নিজের দু'চোখে সিধে তাকালো দেবকুমার বসু। আমি সাতচল্লিশ। লোকে যে যাই বলুক —আমি জানি—আমি ফর্টিসেভেন। তখনো দেবকুমারের দু'ধারের কষে জলের ফোঁটা। এইভাবেই ক'দিন আগে ঘুমের ভেতর মনে হচ্ছিল—মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। ভোরবেলা বালিশের পাশটা চটচটে লাগছিল। শেফালীকে বলতেই খুকখুক করে হেসে উঠেছিল—এবার কোনদিন হয়তো হামাগুড়ি দেবে!

দেবকুমার আয়না থেকে সরে এলো।

তার ঘুমের ভেতর কখন শেফালী ফিরলো, দেবকুমারের তা জানার উপায় ছিল না। কেননা, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে লোকজনের এতদিনকার কথাবার্তা একদম উড়িয়ে দিলেও আজ ফাঁকা বাড়িতে সে কুলকুচির জন্যে মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে সব বুঝতে পেরেছে। বসুজ ইটিং লজের চেহারাটা রাতের দিকে হাসপাতালের ওয়ার্ডের চেহারা পেয়ে যায়। এখন রাজুর পাশে তার মা। দেবকুমার বিছানায় একা। তার মাথার ভেতরে ছুটন্ত তীরের ধারায় চুনে হলুদ হরিণটা গোত্তা খেয়ে ঝাঁপ দিল। টাটা সেন্টারের মাথা থেকে। পাতাল রেলের খোঁড়া খালে।

অনেক ঘুমিয়েও পোড়া পোড়া চোখ নিয়ে বেশী বেলায় দেবকুমার উঠলো। আসলে দুর্বিনীত এই ঝাঁপ দেওয়া হরিণের স্মৃতি তাকে ঘুম থেকে টেনে তুললো। নয় তো আরও ঘুমোতে পারতো দেবকুমার। সারা বাড়ি ফাঁকা। টেবিলের ওপর কাল রাতের ছড়ানো থালায় বেড়াল। উঁকি দিয়ে দেখলো, রাজু বা শেফালী কেউই ওঠে নি। জানালায় ঝাঁঝালো রোদ আসবে আসবে। দেবকুমার দেখলো, বেরোবার শাড়িটা খুলে ঘরের কাপড় পরেছে শেফালী। মুখ আর ধোয় নি বোধহয়। চোখের সরু

কাজল টায়ার্ড গর্তে এখন দুটো আউটলাইন মাত্র। আমি যে কি করে সাতচল্লিশ থেকে চুয়াত্তরে জাম্প দিলাম! শেফালী যেখানে তো সেখানেই। সামান্য এদিক ওদিক।

ফাঁকা বাড়িতে দেবকুমার নতুন করে নতুন থালায় ভাত নিল। ডাল, কাঁচা লঙ্কা—সবই তার অমৃত লাগলো। বাইরে রোদ্দুর নিয়ে পৃথিবী তারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বেসিনের জলে মাথাটা ভিজিয়ে নিয়ে আঁচড়ে ফেললো। তারপর রাস্তায়। আমি যতই বলি সাতচল্লিশ—তবু লোকে কেন চুয়াত্তর বলে? আমি তো সাতচল্লিশই দেখি। এই দেখাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি একটু একটু করে দেওয়ালে গিয়ে এখন পিঠ ঘষছি। এটা তো হওয়ার কথা নয়। আমার তো কোনদিন কোন রোগ ছিল না। সাধ আহ্লাদও কোনদিন খুব একটা কিছু নেই। ভাগ্যিস জগৎসুদ্ধ লোকের আমাকে নিয়ে বড় সাইজের এই ভুল হওয়ার আগেই রুণুর বিয়েটা দিয়ে ফেলেছিলাম। নয়তো এখন অনেক প্যারাফারনেলিয়া বেরোতো। এখনো রাজুর পড়াশুনো শেষ হতে অনেক—অনেক দেরি।

ধর্মতলা স্ট্রীটে বাস থেকে নেমে পড়লো দেবকুমার। পরপর তিন চারটে ফোটোর দোকান। তার মাথায় একটা বুদ্ধি রেফ হয়ে গেঁথে গেল। ক্যামেরার লেন্সের কাছে তো কোন জারিজুরি খাটবে না। সত্যিই কি আমি চুয়াত্তর?

বাঁ হাতের দোকানটায় কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেবকুমার একগাদা পোট্রেটের সামনে পড়ে গেল। নানা বয়সের। তারা মেঝেতে। গা দেওয়ালে ঠেকানো। সবাই তার দিকে চোখ চেয়ে। দোকান ফাঁকা।

দেবকুমার বাইরে বেরিয়ে এলো। এ তো ঠিক ছবি তোলার দোকান নয়। এখানে তো সিটিং দিয়ে দিয়ে চেহারার ভেতরকার চেহারা তুলে আনতে হয়। তাতে পোট্রেট হয়। নানা ভাবে

বসিয়ে ছবি তুলে নেয় আগে। তারপর সেই ছবি দেখতে দেখতে আঁকা হয়। জায়গাটা আসলে নানা চেহারার শ্মশান। দেবকুমার ফুটপাতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বিধান রায়ের বাড়িটার এখন জৌলুশ নেই। আগে ভিড় থাকতো। সুকুমার দে সরকার এক সময় দেব সাহিত্য কুটীরের ছোটোদের পুজো বার্ষিকীতে বড় বড় লেখা লিখতেন। কয়েক বছর আর ওঁর লেখা দেখছি না কেন? একটা গল্পে সুকুমার দে সরকার একটি রাজা ফাউনটেন পেনের কথা বলেছিলেন। যে কালিই ভরা থাক্—নিব থেকে বেরোতো শুধু লাল লেখা। পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতার রং এই পৃথিবীর আলোতেও থাকে। বিশেষ করে ভাদ্র মাসের শেষ দিকের বিকেলে। মাঠঘাট তখন জমা জলে থমথম করে।

এয়ার-লাইন্সের বাড়িটা এখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে অনেককে চড়া রোদের আড়ালে রেখে ছায়া দিচ্ছে। ওই তো কার্পেট ধোলাইয়ের কোম্পানি। বাড়িটার দেড় তলায় মেজালিন ফ্লোরে এই দিনের বেলাতেও কড়া আলো। অথচ বাইরের পৃথিবীতে পুজো বার্ষিকীর পাতার প্রায় সেই ঘিয়ে রং। এখনো একটা বর্ষা আসার সময় হয় নি। আসবে। শেষ হবে। শেষের মুখে সেই ভাদ্রের শেষও এসে যায়।

খুব ইচ্ছে হোল, কণার কাছে যায়। আবার সাহসেও কুলোচ্ছিল না। এই কণা—আর সেই কণা! কোন মিল নেই। আজ তো শেফালীর জায়গায় কণাও আমার বউ হতে পারতো। বউ হয়ে বেশীর ভাগ মেয়েই বোধহয় বিগড়ে যায়।

দেবকুমার বস্তু বুক ঠুকে দেড় তলায় উঠে গেল। কাচের দরজায়—উই আর ওপেন—সাইনবোর্ড লটকানো। দেবকুমার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। সাবান স্নোর বিজ্ঞাপনের মেয়েরা যেন চুল বাঁধতে ভ্রূ আঁকতে এই দোকানেই নেমে এসেছে। কোন

কোন মেয়ের মাথায় সাদা ব্যাণ্ডেজ মত জুঁই ফুল রংয়ের বাটি বসানো।

কণা কি করে সাজানো গোছানোর দোকান খোলে ? ও তো রীতিমত এলেবেলে ছিল।

ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল দেবকুমার। কেন না, তখন একটি কবিতা তার তলদেশে পথ করে নিয়ে এগোতে শুরু করেছে। দুটো লাইন একই সঙ্গে তার ঘিলুতে গেঁথে যাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে কোন কবিতারই মাথায় আসা উচিত নয়। কণা তাকে নিশ্চয় এখুনি কোন আয়নায় ছায়া হিসেবে দেখতে পারে। এ কাচের দেওয়াল তো স্বচ্ছ।

> পরিচয় অপরিচয় মাড়িয়ে স্রোতসিদ্ধ
> বেগুনী কচুরি-ফুলের যাত্রা
> অক্ষর ক্ষয় করে ভাব জেগে ওঠে
> ওঠে জনপদ, মোহরের ঘড়া
> মনুসংহিতা স্রোতসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ

দেবকুমারের ঘিলু আর ঠিকমত কাজ করতে পারলো না। কাচের দরজা খুলে কণা এগিয়ে এলো। ভেতরে আসুন।

আমি দেবু। কণা—দেবকুমার আমি।

চিনতে পেরেছি। বসুন। একটু বসতে হবে। ততক্ষণ আপনি এ বই থেকে হেয়ার স্টাইল দেখে নিতে পারেন।

দেবকুমার হকচকিয়ে গিয়ে চকচকে বইখানা ধরলো। পুরুষদের সাজুগুজুর বই। মাথার চুল। মুখ। সাজানোর নানা কেতা। অনেকদিন আগে হাইজিন বইতে পড়েছিল, লোমকূপের গোড়াগুলি পরিষ্কার রাখিলে দেহের গাত্র সতেজ ও সুস্থ থাকে। কণার দোকানে বোধহয় শীল কোটার কায়দায় লোমকূপ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করা হয়। বিরাট আয়নার সামনে কত রকমের শিশি। তাতে কত রকমের লোশন। চারটি মেয়ে—কিংবা মহিলা—

ফারাকের রেখাটা এত সরু—চারজন সাজনদার মেয়ের হাতে মাথা মুখ জমা দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। আমি তো সাজতে আসি নি।

কণারা থাকতো দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে। ওঁর বাবা ছিলেন আলিপুরের একজন অন্যমনস্ক উকিল। বার লাইব্রেরির নাটকে কালে খাঁ। পাড়ার কালীপুজোয় নিজে দিতেন পাঁঠাবলি। বাংলা অনার্সে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় পড়ার সময় কণা প্রথম পাল্টায়। তার আগে ও ছিলো ছেলেমার্কা মেয়ে। ছেলেদের ঘেঁষেই চলতো। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান দেখতো। আত্মপরিচয়েই ওর সর্বনাশ। কারণ, বেশীর ভাগ লাইনের কোন মানে বুঝতে না পেরে ও আমাকে ভালবাসে। সেকি ভালোবাসা! তার কিছুদিন আগেই কিন্তু কণা ছেলেদের বোট রেসে গালিতে ফ্লাগ হাতে বসতে চাইতো। ভাবখানা—আমিই বিজয়িনী। এই ছেলেমার্কা মেয়েটিকে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে সটকাই। আমাকে জড়িয়ে ধরে একদিন এমন জোরে চাপ দিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। তা চাপ দেবেই বা না কেন? বেঙ্গল টিমের অ্যাথলেট হয়ে ওর ঢোকার কথা তখন।

সুগন্ধী ছড়ানো বাতাস কাচের ঘরে চারিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মধ্যে। তার ভেতর সাজনদার একটি মেয়ে কী একটা গন্ধের কৌটো থেকে বাতাসে মিস্ট্ ছড়িয়ে দিল খানিক।

ভিজিটর্স কিউবিকেলে এসে কণা ঢুকলো। আসুন।

দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো। কণার পরনের জিনসে তিন চারটে পকেট। একটায় একটা ছোট তোয়ালে ভাঁজ করে গোঁজা। মুখের চামড়া কোথাও এতটুকু কোঁচকায় নি। চলে আসুন—

দেবকুমার পায়ে পায়ে এগোলো। কোন কোন মহিলার ভ্রূ তোলা হচ্ছিল। কারও বা ব্লিচিং চলছে। সম্ভবতঃ অফিসে কাজ করে এমন একটি মেয়ে একদিকে ঢলে পড়ে পায়ের নখগুলো

ডালিমের দানা করে ফেলছিল। ঠিক এই সময়ে জোরে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। কণাও রীতিমত দোকানদারী ধাঁচে তাকে পাশের ঘরে হাই চেয়ারে নিয়ে বসাচ্ছিল। এমন সময় তার মাথার ভেতর আরেকটা শব্দ এলো। সেই শব্দটির উপযুক্ত জায়গাও সে পেয়ে গেল মনে মনে—

পরিচয় অপরিচয় মাড়িয়ে স্রোতসিদ্ধ
বেগুনী কচুরি-ফুলের যাত্রা
অক্ষর ক্ষয় করে ভাব জেগে ওঠে
ওঠে জনপদ, মোহরের ঘড়া
মনুসংহিতা স্রোতসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ স্রোতস্বিনী

এই স্রোতস্বিনী কথাটার মানে এখন কণার টাইট ব্লাউজ, ব্লাউজের ওপরকার বাটিকের কাজ, জিনের ট্রাউজার ছাপিয়ে থাম শরীর ধরে বয়ে যাচ্ছিল। কণা গম্ভীর গলায় বললো, বসুন—

আমি। কণা—মানে। বলতে বলতে সেই চেয়ারটায় বসতেই হোল দেবকুমারকে। এ ঘরে চেয়ার কম। আয়নাটা অন্য রকমের। লোশন ইত্যাদির শিশিগুলোও অন্যরকম একটু। চেয়ারখানার গা একদম নতুন কেনা ফ্রিজের। অফিস পাড়ায় এখন বোধহয় লানচ্ টাইম। কাচের জানলার উল্টো দিকের ফুটপাতে টিফিনের ভিড়। আলুর চপ, ঘুগনি ঘিরে ঘিরে মানুষজনের ভাঙা ভাঙা ভিড়। চেয়ারটার চাকা ঘুরিয়ে সজুত করছিল কণা।

আমি তোমার সঙ্গে এমনি—বলেই দেবকুমার উঠবার চেষ্টা করলো। পারলো না। তার আগেই কণা অনেকটা ঢালু করে দিল চেয়ার। যেন দেবকুমার আয়নার উল্টোদিকে রোজ এখানে এই চেয়ারটায় শুতে আসে। পেছন থেকে তার মাথাটা পাকা হাতে সাইজ করে নিচ্ছিল কণা। আয়নায় তার চুলে একঢাল সাদা আরও বেশি করে পেশাদার করে ফেললো কণাকে।

এখানে এমনি এমনি তো কেউ আসে না।

না কণা। সেদিন আমার সাহসের অভাব ছিল বলেই—

লম্বা লোশনের শিশিতে তুলি ডুবিয়ে কী তুললো কণা। আয়নার সামনে গরম জলের টাব। তাতে ফর্সা তোয়ালে ডুবিয়ে তুলে ফেললো। বাঁ হাতে গ্লাভসের ভেতর ধোঁয়া ওড়ানো নিঙড়ানো তোয়ালে। লোশনে ডোবানো ডান হাত দেবকুমারের মুখের দিকে এগিয়ে আসতেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বসতে চাইলো। কাইগুলি কণা। আমার কথাটা তো—

কি ?

সেদিন—মানে আমাদের যখন কম বয়স—আমি তো সত্যিই ভীরু ছিলাম।

কে শুনতে চেয়েছে আপনার এসব কথা ? আপনি এখন একজন প্রফেসনাল বিউটিসিয়ানের হাতে মনে রাখবেন। বলতে বলতে ঠাণ্ডা ইথার টাইপের কি যেন তার গালের ওপর দিয়ে কণা বুলিয়ে দিল। তারপর ভাপ ওঠা তোয়ালেটা চেপে ধরে বললো, এমন করে সাজিয়ে দিচ্ছি আপনাকে—চেনা লোকও অবাক হয়ে তাকাবে।

তোয়ালের ভেতর থেকেই দেবকুমার বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করলো। পুরুষরা কি দোকানে গিয়ে সাজে কণা ? আমায় ছেড়ে দাও।

বসুন তো। একদম নড়বেন না। মুখ ভর্তি ময়লা পড়েছে। এসব পরিষ্কার হয় না কত দিন ?

তবুও দেবকুমার উঠতে চাইছে দেখে কণা তার মাথাটা দু'হাতে পেছনে টেনে ধরলো। এমন সাজিয়ে দিচ্ছি—যেখানেই যান —লোকে তাকাবে।

আমি সাজতে আসি নি কণা। এবারও কি বর্ষা হবে না কণা ?

খুব পাকা হাতে কণা দেবকুমারের ভ্রূ থ্রেডিং করছিল। পুরুষরাও সাজে। সব দেশেই সাজে। বর্ষা ?

আমি তোমার সঙ্গে ছুটো কথা বলতে এসেছিলাম। কিন্তু এবারও যদি বর্ষা—

আমার সঙ্গে কোন কথাই থাকতে পারে না আপনার। আমি কাজের মেয়ে। এখন তো বর্ষা আসে না।

বাবা থিয়েটার করেন আর? অন্য কথায় গিয়ে দেখতে চাইলো দেবকুমার।

স্বর্গে থিয়েটার করেন এখন।

সেদিন আমি তোমার প্রতি অবিচার করেছি কণা।

কি বিড়বিড় করছেন সেই থেকে। বুঝতে পারছি না। তুলিসুদ্ধ হাত তুলে কণা থামলো। পরিষ্কার করে বলুন। এটা বর্ষাকাল নয়—আপনি ভালো করেই জানেন।

তখন আমি কাওয়ার্ড ছিলাম।

ওঃ! সেসব কবে চুকে বুকে গেছে। চোখ বুজুন! নড়বেন না।

একঘণ্টা পরে কণার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দেবকুমার পাশের ঘরে এলো। কাজের মেয়ে তিনটি গরম কফির সঙ্গে মাংসের রোল খাচ্ছিল। দেবকুমারকে দেখে উইশ করলো। দেবকুমারও করলো। খদ্দের মহিলারা সবাই চলে গেছে। চেয়ারগুলো ফাঁকা। অফিস পাড়ার লাঞ্চ শেষ। রাস্তাগুলো একটু নিরানন্দ। পিচ গলে গিয়ে চলন্ত টায়ার টেনে ধরছিল। তারই শব্দ। ভেতরটা কিন্তু আরামের। কণার দোকানে তিনটে এয়ার-কুলার চালু। এটা কি কণার নিজের দোকান? না, কোন ফাইনানসিয়ার আছে পেছনে? কী মেয়ে কোত্থেকে কী হয়ে গেছে!

বেরিয়ে আসবার সময় আয়নায় তাকিয়ে দেবকুমারের মনে হোল—তার তো দশটা বছর বয়স কমে গেছে। সে এখন নির্ঘাৎ সাঁইত্রিশ। এক্ষুনি অমিয় সাঁতরার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার আমার। সাঁতরা হোল গিয়ে ফাউল প্লের আস্ত একটি আণ্ডিল।

লিফটে ঢুকে দেবকুমারের গোড়াতেই মনে পড়লো, এখন আমি যদি জল খাই—নিশ্চয় ঠোঁটের দু'কষ দিয়ে জল ফোঁটা হয়ে বেরিয়ে আসবে না। যা দেখেছিলাম—ও আমার মনের ভুল। ওসব হোল গিয়ে বেশী বয়সের সিমটম। যেমন নিশ্চয় মুখ দিয়ে লালা গড়ানো আমারই মনের ভুল। সে বয়স তো আসে নি আমার এখনো। আমি অবশ্যই স্বপ্নে দেখেছি। হয়তো ভোর রাতের স্বপ্ন ছিল। তাই এত সিওর মনে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একগাল জল নিয়ে কুলকুচো করে দেখতে হবে। সত্যিই পারি কিনা। কিংবা সত্যিই পারি না বলে এপাশ ওপাশ ঘনঘন মাথা নেড়েই আমাকে মুখের ভেতর কুলকুচির অবস্থা বানাতে হয় কিনা—সেটাও করে দেখা দরকার। কেন না, এ দশাটা তো আমি স্বপ্নে দেখি নি।

কাঁহা যাইয়েগা ?

লিফটম্যানের একথায় খুশীই হোল দেবকুমার। যাক ! তাহলে এত কাঁচা চেহারা পেয়েছি বলে চিনতেই পারে নি লোকটা। তাকে আশ্বস্ত করতেই দেবকুমার বললো, আমায় চিনতে পারলে না সুগ্রাব। আমি বাসু সাহাব—

লিফট থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেবকুমার দেখলো সুগ্রীব হকচকিয়ে তাকিয়ে আছে। টেনে গেট বন্ধ করে নি। দেবকুমার তার চেহারা কাঁচা হয়ে যাবার সঙ্গে তাল রেখে জোরে হেঁটে নিজের কিউবিকেলে গিয়ে ঢুকলো। যাবার সময় দু'ধারে কাজে বসা টেবিলের লোকজনদের হকচকিয়ে দিল। বেগে হেঁটে ঘরে ঢোকার সময় অমিয়র মুণ্ডুটা চোখে পড়লো না তার।

নিজের চেয়ারে বসে কলকাতার উঁচুতলার হাওয়া পেয়ে মনটাও ভাল হয়ে গেল দেবকুমারের। জানলাটা খোলা। আগেকার উঁচু বাড়ি। তাই শহরের উঁচু দিককার বাতাসে বোধহয় একটু পরিষ্কার হয়। তাই মনে হোল দেবকুমারের। আজ পাখা

আছে। আলো যায় নি। নীচে রাস্তায় বালি ছড়িয়ে গলা পীচ দুরস্ত করা চলছে। টেবিলে গত মাসের নম্বর ফেলা তিন তিনখানা ফাইল সাজানো। ফাইল দেখে মন আরও ভাল হয়ে গেল দেবকুমারের। তাহলে সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোন গোলমাল নেই আমার। কণার সঙ্গে দেখা হতেই সব ঠিক হয়ে গেল। আশ্চর্য! কোথায় চুয়াত্তর—আর কোথায় সাঁইত্রিশ!

দেবকুমার ফাইল দেখতে দেখতে জমে গেল। বাইরের ঠিকেদারি। কাঠের পুল। সিমেন্টের ক্যালভার্ট। এসব বানিয়ে আসছে তাদের কোম্পানি। প্রায় একশো বছর ধরে। রেলের জন্যে। হাইওয়ে অথরিটির জন্যে। এসব কাজের এস্টিমেট হয়ে গেলে দেবকুমার মেটিরিয়াল বুঝে সাপ্লায়ার ঠিক করে। এই-ই তার কাজ। এতকাল এই কাজই করে এসেছে। মাঝের থেকে কেন যে ফাইল আসা বন্ধ হোল। অসিতের তো কোন গুণের অভাব নেই।

ফাইল দেখতে দেখতে দেবকুমার সঙ্গে গাঁথা প্রোজেকশন সিট দেখছিল। একটু পুরু—নীল আকাশী রংয়ের কাগজ। কণার মাথায় এক ঢাল সাদা। দেবকুমার কার্পেট ধোলাই কোম্পানির শো-কেসটা দেখতে পাচ্ছিল। মনে মনে। কার্পেটের ওপর হালকা রংয়ে এক বালক বাঁশীঅলা। নিজেই বাঁশীতে তন্ময়। তখন তখনই দেবকুমার তার হারানো কবিতার লাইন পেয়ে গেল।

> পরিচয় অপরিচয় মাড়িয়ে স্রোতসিদ্ধ
> বেগুনী কচুরি পানার ফুল ভেসে যায়—

উঁহু। ভেসে যায় না। যাত্রা। বেগুনী-কচুরি ফুলের যাত্রা—

> অক্ষর ক্ষয় করে ভাব জেগে ওঠে
> ওঠে জনপদ, মোহরের ঘড়া

একসঙ্গে এতটা মনে করতে পেরে আর হারানোর ঝুঁকি নিল না দেবকুমার। প্রোজেকশন সিটে সেট স্কোয়ার ফেলে প্ল্যান

আঁকা। মাপঝোকের বাইরে অনেকটা জায়গা। দেবকুমার ভূতে পাওয়া বেগে লিখে ফেলতে লাগলো।

কিন্তু সবটা পারলো না। তখনো তার কলমে—স্রোতসিদ্ধ কথাটা জড়িয়ে ছিল।

আবার কে ও ঘরে ফাইল দিল?

রীতিমত চওড়া গলা। দেবকুমার চেনে। এ সেই অমিয় সাঁতরার গলা। কোন একটা ফাউল প্লেতে ছোকরা নিশ্চয় আছে।

এই নতুন বেয়ারাটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বলেই অমিয় কাকে ধমকে দিলো। রীতিমত ছাদ কাঁপানো।

দেবকুমার তার নিজের অফিসে নিজের চেয়ারে ঢলঢলে হয়ে গেল। অন্য সময় এ চেয়ার তার কাপে কাপে ফিট হোত। একবার ভাবলো, অমিয় তো বড় বেড়েছে। উঠেও দাঁড়ালো। ডেকে দাবড়াবে ভেবেছিল।

কিন্তু কাটা দরজার ওপাশেই টেবিল চেয়ারে বসা বাকি লোকজন যেন একই সঙ্গে সবাই গলা তুলে যে যার হাসি ছররা করে ওপরের দিকে ফোয়ারা করে দিল। হো—হো—হো—ওঃ!

অমনি দেবকুমার নিজের চেয়ারে বসে পড়লো। কী বিপদ। কারও যেন কোনদিন নিজের অফিসে এমন না হয়। এই জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়—কত উঁচু থেকে সুকুমার দে সরকারের চুনে হলুদ হরিণটা ঝাঁপ দেয়—তার মাথার ভেতরে—একেবারে মাঝখানে—বিশেষ করে ভোর রাতের দিকে—স্বপ্নে। ওই তো টাটা সেণ্টারের মুণ্ডু। অত বাড় ভাল নয়। একদিন এমন ঝড় উঠবে।

একটি নতুন লোক ঘরে ঢুকে পড়লো। ফাইল দিন। বাবু চাইছেন।

নতুন বেয়ারাই হবে। হয়তো ট্রায়ালে আছে। দেবকুমার কষে এক ধমক দিল। লোকটা অমনি ছিটকে বেরিয়ে গেল।

এবার দেবকুমার পরিষ্কার বুঝলো—তার এই যে এখানে নিজের চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা—সামনে খোলা ফাইল—খোলা জানালা—সব কিছুতেই একখানা পুরনো খবরের কাগজে আগুন ধরে যাওয়ার কায়দায় বিপদ এসে ধাঁ ধাঁ করে ঢুকে পড়েছে। সে চাইলেও ছুটে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

অমিয় সাঁতরা এসে ঘরে ঢুকলো। হাতা গোটানো শার্টের বাইরে মোটা করে মাংসে ঢাকা কনুই। তাতে অনেক লোম। প্রত্যেকটা লোম তাদের কূপ সমেত আলাদা করে চোখে পড়ছিল। কণা এই কনুইখানা হাতের ভেতর পেলে নিশ্চয় গরম জলে নিঙড়ানো ভাপ ওঠা তোয়ালে দিয়ে চেপে ধরতো তারপর চলতো তুলি। লোশন।

যে বেগে ঢুকছিল অমিয়—তার চেয়ে অনেক মোলায়েম গলায় বললো—এ কি করেছেন স্যার। অ্যাঁ ?

দেবকুমার বুঝতে পারলো না। গম্ভীর গলায় বললো, জায়গায় গিয়ে বোসো। এটা অফিস।

আমিও তো তাই বলছি স্যার। এটা অফিস। আপনি এসব কি করেছেন? বলে হো হো করে ছাদ ফাটানো হাসি হাসলো।

ষাঁড়ের মত চেঁচিও না। তোমার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতেই হবে।

তা নিন স্যার! হো হো করে হাসতে হাসতেই নিজের হাসি থামালো অমিয় সাঁতরা। কোথায় গিয়েছিলেন স্যার, বলুন তো ? বাড়ি থেকে আসছেন তো ?

জায়গায় গিয়ে বোসো। এটা একটা অফিস।

আমিও তো তাই জানতাম স্যার। উরে বাবাঃ! আপনি স্যার কিসে এলেন অফিসে ?

দেবকুমার সরাসরি অমিয়র চোখে তাকালো। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে সাঁতরা কাটা দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়ালো। দেবকুমার

বলেই ফেলেছিল, কেন ? যেমন আসি রোজ। কিন্তু তা বললো না। সাবঅর্ডিনেট স্টাফ সম্পর্কে তার একটা পুরনো কথা সব সময়েই মনে পড়ে। ডোণ্ট বি চাম্ উইথ্ দেম্। কে যেন বলেছিল। এ কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমারের চোখ মেঝেতে পড়লো। কাটা দরজার নীচের দিকে অনেকগুলো পা। তক্ষুণি সে বুঝে গেল—খবরের কাগজখানায় আগাগোড়া আগুন ধরে গেছে। পুরনো নিউজপ্রিণ্ট তো।

অমিয় সাঁতরার চোখে চোখ রেখেই দেবকুমার বললো, ওয়ান গুড্ নট কাম্—হোয়েন ওয়ান ইজ নট্ ওয়ানটেড। জায়গায় গিয়ে বোসো। কোনরকম ফাউল প্লে আমি বরদাস্ত করবো না কিন্তু। সিধে বলে দিচ্ছি।

তা তো যাবোই স্যার ! আপনার ভ্রূ কোথায় স্যার ? অ্যাঁ ! এ কি করেছেন ! কে আপনাকে বাঁচাবে, বলুন স্যার ?

দেবকুমার হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছিলো। হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এলো অমিয়। মুছবেন না স্যার। মুছবেন না।

কী পাগলামো জুড়ে দিলে। ভ্রূ মোছা যায় ?

যায় স্যার। আপনারটা যায়। বলে আর হাসি চাপতে পারছিল না অমিয়। কামিয়ে তো দিব্যি ভ্রূ এঁকেছেন।

শাট আপ। বলেই উঠে দাঁড়ালো দেবকুমার। সঙ্গে সঙ্গে কাটা দরজার নীচে কয়েক জোড়া পা শব্দ করে পিছিয়ে গেল।

দেবকুমার উঠে দাঁড়ানোতে অমিয় আরও চমকে তাকালো। মুখে কি সব মেখেছেন স্যার রং ?

তোমার মতলব আমি অনেকদিন ধরে জানি অমিয়। কোন ফাউল প্লে করবার চেষ্টা করবে না। আর কে কে আছে তোমার সঙ্গে ? নাম বলো। বলো—

হাসি থামিয়ে অমিয় সাঁতরা করুণ করে তাকালো। সব বলছি স্যার। বলছি। তার আগে ফাইল ক'খানা দিন তো। বলে

হাতও বাড়িয়েছিল অমিয়। ওর ভেতর একটা ভি. ভি. আরজেন্ট ফাইল। দিন স্যার—

ফাইল যখন দেবার দেবো। সে তোমার ভাবতে হবে না। আমার রেসপনসিবিলিটি আমি জানি। এবার আর কে কে আছে তোমার সঙ্গে—নামগুলো বল তো।

বলছি স্যার। ফাইল ক'খানা দিন আগে। আপনাকে আমরাও বাঁচাতে পারবো না স্যার। নিশ্চিত খবর চলে গেছে ফোর্থ ফ্লোরে। কেন রোজ আসেন অফিসে ?

দেবকুমার পড়ন্ত বেলার রোদ্দুরের ছায়া গরম বাতাসের ভেতর জানলা দিয়েই দেখতে পাচ্ছিল। অথচ সেখানে কোন ছায়া নেই। ছায়া আসলে অফিস বাড়িগুলোর একতলার ফুটপাতে। যে-বাড়ি যতটুকু রোদ আড়াল করতে পারে—শুধু সেইটুকু। আর ছায়া আছে—ওই জীবনদীপ বাড়ির উল্টোদিকের পাতাল রেলের খোঁড়া খালের মাটির ঢিবির বাঁয়ে। দেবকুমার বুঝলো, পোড়া খবরের কাগজের আভাঙা ছাই এখন ফিনফিনে পোড়া কাগজ হয়ে তারই পায়ের কাছে পড়ে আছে। মাড়ালেই ছাতু ছাতু হয়ে যাবে।

আমার কি হোল যে তুমি আমায় বাঁচাবে ?

আরও কি বলতো দেবকুমার। বলা হোল না। দু'জোড়া পা জুতো মসমস করে এসে কাটা দরজায় দাঁড়ালো।

অমিয় তখনো বলছিল, আজ যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে তো অফিসে এলেন কেন ? ছুটি তো অনেক রয়েছে। রেস্ট নিতে পারতেন বাড়িতে।

দু'জনের কেউ আর কিছু বলার আগেই কাটা দরজা খুলে জি. এম.—তাঁর পেছন পেছন ডি. জি. এম. ঢুকলেন। কোথায় ? এই তো মিস্টার বাসু। কি ব্যাপার ? বলেই দাঁড়ানো দেবকুমারের মুখে তাকালেন জি. এম.। তারপর ফিরে তাকালেন ডি. জি.

এম.-এর মুখে। অমিয় সাঁতরা তখন ওঁদের দু'জনকে সুপিরিয়রের প্রপার সম্মান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

দেবকুমার মুখ খোলার আগে একবার ভেবে নিতে চাইলো, জি. এম. আমার মুখ দেখেই অমন করে ডি. জি. এম-এর দিকে তাকালেন কেন? তবে কি কণা তার চেম্বারে বসে আমার মুখ নিয়ে কোন ফাউল প্লে করলো? রসিকতা? নয়তো নিদেনপক্ষে কোন রিভেঞ্জ নিল? কিন্তু তা কি হয়? তাই কি হয় কখনো?

জি. এম. পরিষ্কার গলায় বললেন, ফাইলগুলো নিয়ে একবার আমার ঘরে আসুন মিস্টার বাসু।

এই তো দেখুন না স্যার—কী রকম ইনডিসিপ্লিন গ্রো করেছে অফিসে। সিটে থাকে না কেউ—

সে আমি দেখছি। আপনি একবার আমার ঘরে আসুন। ফাইলগুলো আনবেন কিন্তু। বলেই জি. এম. অমিয় সাঁতরার দিকে তাকালেন। আপনারা যে যার সিটে চলে যান।

যাচ্ছি স্যার।

॥ নয় ॥

মেঝের সবটাই সবচেয়ে মোলায়েম কার্পেটে ঢাকা। জি. এম.-এর মাথার পেছনের কাঠের প্যানেলিংয়ে একখানা পেইন্টিং টানানো। জ. এম.-এর মাথার পেছনটায় ছবিখানা একদম দুর্গা প্রতিমার চালি। কোথাও ছায়া পড়ে নি—এমন ভাবে আলো বসানো। আওয়াজ বলতে শুধু কুলারের গুনগুন।

দেবকুমার ভাল করে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। বাঁ পায়ের রসোল করা স্যুয়েের গোঁড়ালিতে একটা পেরেক নিশ্চয় লটকে গেঁথে যাচ্ছে কার্পেটে। জি. এম.—'আসুন' বলে তাকালেই বিনা বাধায় যাতে এগিয়ে যেতে পারে—সেজন্যেই দেবকুমার আগাম এগিয়ে গেল।

ওঃ! এসে গেছেন। বসুন।

দেবকুমার বসেই ফাইল ক'খানা এগিয়ে দিল, এই যে স্যার—

জি. এম. মাথা নীচু করে সেই ফাইলখানাই দেখে মুখ তুললেন। প্রোজেকশন সিটে এসব আপনার লেখা?

দেবকুমার মনে করতে পারলো না। কোন্‌টা স্যার?

ফাইল ঘুরিয়ে তার সামনে মেলে ধরলেন জি. এম.। এই যে—বাংলায়—

ওঃ! হ্যাঁ স্যার। কয়েকটা পয়েন্ট—

এতদিন অফিসে কাজ করছেন—আপনি জানেন না কোথায় লিখতে হয়? আর এসব কি লিখেছেন বাংলায়? বলেই জি. এম. খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে মুখ তুললেন। এজন্যই আপনাকে ফাইল পাঠানো বারণ করা আছে। কে দিল আপনাকে?

ও মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না দেবকুমার। ভারী, সুখী, রুক্ষ—একদম কোন দাগ নেই—এমন একখানা মাংস লেপা মুখে জি. এম. তার দিকে তাকিয়ে।

কে দিয়েছে আপনাকে এ ফাইল ?

দেবকুমার একদম ভড়কে গেল। আমি টেবিলে এসে পেয়েছি।

কী সব লিখেছেন বাংলায় ? কোন মানে করা যাচ্ছে না—

এবার দেবকুমার আরও কুঁচকে গেল। তার এই হারানো কবিতার কথা সে কাউকে বলে নি এখন পর্যন্ত। একমাত্র কবি পি. মুখার্জী জানেন। তাঁর কাগজে কিছু বেরিয়েছে। দেবকুমার একদম বোবা হয়ে গেল।

বলতে পারেন আপনাকে কে ফাইল দিয়েছে? কথা বলতে বলতে একটা বেলবাটন চেপে ধরলেন জি. এম.। কি লিখেছেন এসব ? মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। বলুন তো কি লিখেছেন ?

দেবকুমার অনেক চেষ্টায় নিজেকে জড়ো করে বলতে গেল—জানা-অজানা, পরিচিত-অপরিচিতের সবরকম ঠিকানা মাড়িয়ে দিয়ে সময় চলে যায়। যেমন চলে যায় কূলহারা নদীজলে ভাসমান কচুরিপানার বেগুনী রংয়ের ফুল। তাই এর পাশে মোহর-ভর্তি ঘড়া ঘড়া সম্পদ, নানা সভ্যতার জনপদ—সবই অর্থহীন। স্রোত মাত্রই সিদ্ধগতি। তার বেগ সময়ের মতই স্বতঃসিদ্ধ। এসব একসঙ্গে করে গুছিয়ে বলতে শুরু করেছিল প্রায়। কিন্তু তার লজ্জা করছিল এই কথা ভেবে যে—প্রোজেকশন শিটে আঁকা প্ল্যানের সঙ্গে এসব কথার তো কোন যোগ নেই।

তাকে লজ্জা থেকে বাঁচালেন মিস্টার সাকসেনা। তিনি বেল পেয়েই বোধহয় পেছনের অ্যান্টিরুম থেকে কাটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়েস স্যার ?

মিস্টার বাসুর টেবিলে কে ফাইল পাঠালো দেখুন তো।

ট্রায়ালে আছে একটি বেয়ারা।

একদম নতুন ?

ইয়েস স্যার।

ওকে আরও তিন মাস ক্যাজুয়ালে রাখুন।

ইয়েস স্যার।

ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কে ছিল দেখবেন অবশ্য।

ইয়েস স্যার। বলেই সাকসেনা চলে যাচ্ছিলেন।

জি. এম. থামালেন তাকে। চিঠিখানা হয়ে গেছে ?

টাইপ হচ্ছে স্যার।

হয়ে গেলে আপনি সঙ্গে করে আনবেন। নিজে হাতে করে আনবেন।

নিশ্চয় স্যার। বলে চলে যেতে যেতে দেবকুমারের মুখ দেখেই যেন একবার চমকে থামলেন সাকসেনা—তার পরেই দরজা খুলে কাঠের প্যানেলে মোড়া এ ঘরের ওপিঠে চলে গেলেন।

জি. এম. এবার দেবকুমারের মুখে একটু নরম করে তাকিয়ে বললেন, আপনার তো ছুটি রয়েছে অনেক। যান না কোথাও ঘুরে আসুন। ফ্যামিলি নিয়ে একটু রিলাকস্ করুন।

আমি কোনদিন কাজে ফাঁকি দিই নি স্যার।

সেকথা হচ্ছে না। এভাবে ভ্রূ কামিয়ে—ভ্রূ এঁকে, গালে রুজ পাউডার মেখে কেউ অফিসে আসে ?

আমার কথাটা শুনুন স্যার।

ইউ আর এ ডিফিকাল্ট ম্যান।

নিঃশব্দ ঘরে এয়ার কুলারের গুনগুন সিধে দেবকুমারের রগে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছিল। দেবকুমার যতই তার চিন্তাগুলো—বলার কথা গুছিয়ে আনছিল—এয়ার কুলারটা ততই ধড়ধড় শব্দ তুলে

গুনগুনে ডুবে যাচ্ছিল। এইভাবেই চলন্ত মোটরে রাস্তার মাছি ঢুকে পড়ে জ্বালায়।

আমি বলতে চাই স্যার—

আর কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে। ইউ আর ইমপসিবল্! প্রোজেকশন শিটে ওসব কি লিখে রেখেছেন—

পাছে ভুলে যাই যদি। কয়েকটা ইমপর্টান্ট লাইন।

কিসের ইমপর্টান্ট?

আপনি আমার সব কথাটা শুনুন আগে।

নাউ ইউ ডিফেণ্ড ইওরসেলফ্ ইন দি কোর্ট। আমাদের যা বলার তা এখুনি আপনি চিঠিতে জানতে পারবেন—

মরীয়া প্রায় দেবকুমার বসু তার বলার কথা ভাল করে বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। আমি কণাকে ভালবাসতাম স্যার—

হোয়াট?

কণাও আমাকে ভালবাসতো। ওর বাবা লাইব্রেরিতে—

কি সব ভুল বকছেন আপনি।

কিছু ভুল নয় স্যার। কণার সাদাসিধে বাবা বার লাইব্রেরীর থিয়েটারে কালে খাঁ হতেন। কিন্তু সময়মত মেয়েদের বিয়ে দেন নি। সেইটেই স্যার—

ধমকে থামতে হোল দেবকুমারকে। জি, এম. তার বয়সীই হবেন। চোখ তুলে তারই দিকে তাকালো। বোঝাই যায়—এসব কথা একটাও তিনি শুনছেন না। দেবকুমারের কথার স্পীড কমে আসায় তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন, এসবের সঙ্গে আমাদের অফিসের যোগ কোথায়! ইউ আর কমপ্লিটলি আনপ্রেডিক্টেবল্—

না স্যার। সেটাই তো বলতে চাইছি। কণা যে এভাবে রিভেঞ্জ নেবে ভাবি নি। রিভেঞ্জই বা বলি কি করে। রসিকতাও তো হতে পারে। ক্রুয়েল রসিকতা—

এমন সময় সাকসেনা ঘরে ঢুকলেন। হাতে লম্বা সাদা খাম—এনট্রি বইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। এজন্যেই যেন দেবকুমার বসু ওয়েট করছিল। সাকসেনা এনট্রি-খাতা এগিয়ে দিতেই সই করে খামটা হাতে নিল। তারপর সাকসেনা দরজার ওপাশে মিলিয়ে যেতেই দেবকুমার আবার শুরু করলো। এমন হোতো না স্যার—আসলে—

হওযার আর কি বাকি আছে মিস্টার বাসু।

সেদিন আমি কাওয়ার্ড ছিলাম। না হলে কণার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে যেতো। আর সে বিয়ে হলে আজ কি আমায় এ অবস্থায় পেতেন স্যার—। কথাটা শেষ করে দেবকুমার নিজেই নিজের মুখের হাসি দেখতে পেল। অথচ তো কোন আয়না নেই সামনে।

জি. এম. নিজের কাজে কি ফাইল দেখছিলেন। মাথা না তুলেই বললেন, আপনি ম্যারেড্ মানুষ। ফ্যামিলি রয়েছে। আবার এসবে যাওয়া কেন! তার চেয়ে রিলাক্স করুন। টেনসন কমান। আপনার ভেতরের অসুখটা বড় ডাক্তার দিয়ে দেখান।

আমার কোন অসুখ নেই স্যার। আর স্যার ওসব তো আজকের কথা নয়! আমি গিয়েছিলাম কণার পারলারে—

আরেকদিন শুনবো। এখন আসুন। চিঠিখানা ভাল করে পড়ে দেখবেন। এটা একটা অফিস। এছাড়া আমাদের রাস্তা ছিল না।

দেবকুমার বসুকে উঠতেই হোল। জি. এম-এর ঘর পেরিয়ে বাইরে এসেই বুঝলো, অফিস ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সে এইমাত্র একটা জাহাজকে আগুন লাগা অবস্থায় ফেলে দিয়েই যেন রাস্তায় এসে নামলো। অফিসের পেছন দিককার রাস্তায় লোক নেই। সেদিকটা ধরেই এগোতে এগোতে দেবকুমার অফিসের খামখানা খুললো।

আশ্চর্য! আমাদের অফিসে এরকম কাগজ আছে? জানতাম না তো। একদম দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতা। সেদিকে তাকিয়ে দেবকুমার দেখলো, টাইপ করা কাগজের ঘিয়ে সাদা রংটা আকাশেও ছড়িয়ে পড়ছে।

কলকাতায় অফিস ভাঙার পর বহু চাকুরে গৃহস্থ বাস-ট্রামের অবস্থা দেখে এই সময় ঠিক করে—হেঁটেই বাড়ি ফিরবো। সেইভাবেই দেবকুমার হাঁটতে লাগলো। এক সময় কলকাতার অলিগলিতে আলো জ্বলে উঠলো। এখন বাবুদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়তে বসে কেউ কেউ। কিংবা সারাদিনের গরমের পর রকে বসে। নয়তো—যে বাড়িতে জলখাবার হয় না—সে বাড়ির লোকজন হাতে পয়সা নিয়ে পাড়ার দোকানে কিছু একটা কিনে খেতে যায়। চা হোক, সেঁকা রুটি হোক। পাঁউরুটি হোক। যা পায়—তাই।

ফুটপাতে ফুটপাতে বাঙালীর ব্যবসা। সে রকমই এক ব্যবসার দোকান দেবকুমারদের পাড়ার মোড়ে। রাস্তার ইলেকট্রিক এ দোকানের আলো। সেখানে চা পাওয়া যায়। টুলে বসে সাট্টা আর রেস দুটোই খেলা যায়। আবার বাড়ি ভাড়ার খবরও পাওয়া যায়। সেখানে বসে দেবকুমার একটা চায়ের অর্ডার দিয়েই চিঠিখানা আবার খুললো।

আঃ! কী সুন্দর কাগজ আমাদের অফিসের। এইটে মনে করেই টাইপের একটা জায়গা তার চোখে আটকে গেল। ইউ আর মেনটালি ইমব্যালান্সড্—তার পর সব হরফই তার চোখে নড়ে গেল: একটা লাইনও সোজা নয়। সব বেঁকে যাচ্ছিল।

এমন সময় পাশের এক ছোকরা—শির ওঠা হাত পা—ঝোলা গোঁফ—উঁকি দিয়ে পড়তে গেল। দেবকুমার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো।

আমরাও ইংরিজী পড়তে পারি দাদা।

দেবকুমার একবার তাকালো। কথা বলে লাভ নেই। ফিকফিক করে হাসছে। এদের দেবকুমার জানে। স্বাধীনতার পর এলেবেলে ভাবে জন্মানো। পাতাল রেলের রাত্তিরবেলা তোলা মাটি সরাবার কাজ নিয়েছে। লরী যায়—লরী গোনে। এই। যারা চাকরি-বাকবি করে তাদের ওপর কেমন একটা জাতক্রোধ। একদিন বোঝাবার চেষ্টাও করেছিল—বাবা—আমি তোমার চেয়ে অনেক আগে জন্মেছি। চাকরি করা কি আমার অপরাধ?

পাড়ার একটা উপকার করুন না। ক'টা ছেলেকে চাকরি দিন না।

বড় বড মন্ত্রী পারছে না। আমি কোত্থেকে দেবো?

পারেন। দেবেন না আপনি। তাই বলুন!

দেবকুমার জানে এটা একটা চালাকি। ওপরে তুলে দিয়ে টুল সরিয়ে দেওয়া। আর বেকার তো রাস্তার যে কোন মোড়ে ভুরি ভুরি। কেউ কেউ তার ছেলে থাকলে ছেলের বয়সী হোত সব বোঝার মাথাও পরিষ্কার হয় নি। এই শির ওঠা শুকনো ছোকরা যে কোন দিকে ওদের চালাতে পারে। প্রায়ই চেষ্টাও করে তাই। দেবকুমার নির্বিরোধী বলে সুবিধা করে উঠতে পারে না।

আজও দেবকুমার কোন কথায় গেল না। ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললো, অফিসের চিঠি। কি হবে তোমার? বলেও তার মনে একটা কষ্ট হতে থাকলো। আমি কি বেওয়ারিশ ম্যানহোলের ঢাকনা? যে যা ইচ্ছে করবে আমার সঙ্গে?

দেবকুমার তাকাতেই ছোকরা লাফ দিয়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে হাততালি। আজ কি প্লে ছিলো দাদার?

চমকে গেল দেবকুমার।

ছেলেটি তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হিংস্র আনন্দে লাফাচ্ছে। কী

সুন্দর পেইন্ট করেছো দাদা। তারপর ভ্রূ আঁকা। সখী সাজতে হয়েছিলো ?

দোকানীও এবার ফিরে তাকালো। পেলে ছিলো অফিসে ? এই দিনের বেলায়—?

হুঁ। চা দাও।

দেবকুমার ভীষণ গরম চা ফুঁ দিয়ে দিয়ে শেষ করে ফেললো। উঠবার সময়েও শুনলো, ছোকরা বলছে—ছিলে বুড়ো—হলে পাটরানী—রাজা কে বা জানে !

সটারি পেলেও এভাবে বোধহয় পাবলিক রাস্তায় ভিড় জমিয়ে কেউ নাচে না। নাচ মানে ভিড় জমাবার জন্যে লাফঝাঁপ। ভীষণ আনন্দ পাচ্ছিল ছেলেটি।

দেবকুমার বাড়ি ফিরেই আগে ঢুকলো বাথরুমে।

বসুজ ইটিং লজের দু'নম্বর বোর্ডার নিশ্চয় এখন ঋতুদির স্কুলে। তিন নম্বর অনেকদিন পরে পড়ার টেবিলে দাবার কোট সাজিয়ে খেলছিল। একদম ডিস্টার্ব না করে দেবকুমার তার ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুমের ভেতরেই একবার রাজুর গলা পেল। বাবা খাবে এসো। মা এসেছে।

উঠবো উঠবো করছিল দেবকুমার। শেফালীর গলা ঝনঝন করে বেজে উঠলো। ওমা আমি কোথায় যাবো গো। মুখে রং মেখে কেউ অফিসে যায়—

দেবকুমার ডান কাতেই শুয়ে থাকলো। উঠলো না। এদিকটা অন্ধকার। আগেকার কয়েকটা ট্রাংক্ থাক্ থাক্ সাজানো।

শুয়ে শুয়েই বুঝলো, সংবাদদাতা স্বয়ং অসিত। এতবড় একটা খবর শেফালীকে না দিয়ে থাকতে পারে অসিত ! একবার ভাবলো —সবটা খুলে বলবে শেফালীকে। কিন্তু সেদিকেও বিপদ কম না। এই এত বয়সে যদি বলে ছোক-ছোকানী গেল না এখনো ?

কবেকার বান্ধবী—তার খোঁজে এতদিন পরে যাওয়া কেন? সে-ও তো আরেক ভজঘট ব্যাপার। কোন্ দিকে যাবে সে বুঝতে পারলো না।

এক সময় দেবকুমার দেখলো, সে-ই চোখ বুজে অন্ধকারে জেগে আছে। আর পাশের ঘর থেকে বসুজ ইটিং লজের দু'নম্বর বোর্ডারের নাক ডেকে চলেছে—মিহি একটা আওয়াজে। শেফালীর বুকে কোন শ্লেষ্মা নেই। কণা আজ তাহলে আমাকে কি করলো? এইটে ভাবতে গিয়ে দেবকুমার তিনটে বাংলা শব্দের ভেতর পাক খেতে লাগলো। রসিকতা—প্রতিশোধ—হ্যানস্থা।

পরদিন ভোরে চা দিয়ে ডাকলো শেফালী। আনন্দেই উঠে পড়লো দেবকুমার। ঘুম তার সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। শেফালী চায়ে চিনি বেশি খায়। তাই বোধহয় চিনি মেশাতে গেছে রান্নাঘরে। কিংবা দুধ। অনেক সময় লিকারও বেশি করে নেয়। নিয়ে পয়লা চুমুক দেয় রান্নাঘরের বেসিনে পিঠটা ঠেকিয়ে। এক সময় আমি আর শেফালী ভোরের পয়লা চা খুব সেরিমোনিয়াসলি খেতাম: তখন রাজুর হাতেখড়ি হয় নি। দেবকুমার এখন একা একা চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। জানলার বাইরেই কড়কড়ে রোদ।

রান্নাঘর থেকেই শেফালীর গনগনে গলা ভেসে এলো। চাকরি তো নেই। এতবড় সংসারটা চলবে কিসে?

দেবকুমার আর চা খেতে পারলো না। অসিত তাহলে সবটাই বলেছে তোমায়!

এক অফিসে কাজ করে। জানবে না?

বলো--জানাবে না!

এ কথায় শেফালী রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। কাজের লোক কাজ ছেড়ে দেয় এবাড়ি! কর্তা রং মেখে অফিসে যায়! ভেতরে ভেতরে কী রোগ বাঁধিয়ে বসে আছো কে জানে? নয়তো এমন করে কেউ বুড়োয়?

তাই তো বন্ধু মানুষ তোমায় সময়মত সব জানিয়ে রাখে!

ঋতুদি অসিতদাকে কিন্তু তুমি ময়লা মাখাতে পারবে না। ওঁরা না থাকলে এখন আমরা কোথায় যেতাম— ?

ওরাই তো এ সংসার চালাচ্ছে! তাই না?

দেবকুমারের এ কথাটার অনেক মানে হয়। বিশেষ করে একটা মানে তো শেফালীর খুব খারাপ লাগলো। মনে মনে। আর সে মানেটা যে একদিক থেকে কিছুটা সত্যি তা শেফালীর চেয়ে কে বেশি জানবে। তাই আরও বেশি করেই খারাপ লাগলো। যদিও সে জানে দেবকুমারের কিছুই জানার কথা নয়। বাড়ির গেরস্থ কর্তা তার নিজের বিশ্বাস মতই কথাটা বলেছে। যেমন আর পাঁচজন কর্তা বিশ্বাস করে—তাদের আয়েই সংসার চলে। আর চলে তো বটেই। আসলে ঋতুদির স্কুলের টাকাটা, অসিতের মানিব্যাগের বড় নোট আর দেবকুমারের অফিসের টাকা নিজের কাছে এই ক'মাস সব একসঙ্গে রাখতে রাখতে শেফালীর কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে—এ সব টাকাই অসিতদের দেওয়া। কেননা, অসিতের চেষ্টাতেই তো এতদিন দেবকুমারের চাকরিটা টিঁকে ছিল।

ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শেফালী বললো, হ্যাঁ। ওঁরা না দেখলে কে আমাদের দেখতো?

আমার অফিসের খারাপ চিঠিখানার বয়ানও ওরা আগাম দেখে রাখে। তোমায় আগাম জানাবে বলে।

ওরা তোমার জন্যে চিন্তা করে বলেই। অসুখ করে তোমার মাথার ঠিক নেই।

কে চিন্তা করে? অসিত? হুঁ!

রাজু জেগে উঠে খোলা দরজা দিয়ে মা বাবাকে একসঙ্গে এ অবস্থায় দেখে চুপ করে তাকিয়ে ছিল। তাকেদেখে দেবকুমারও চুপ করে গেল। কিন্তু শেফালী পারলো না। এই মাত্র তার চোখ

পড়লো দেবকুমারের দুই ভ্রূ-তে। এ কি? কামিয়েছো? কী হোল তোমার? এ কি অসুখ তোমার হোল—

চেঁচিও না। থামো। শোনো আগে—বলে কথার কথাটা শুরু করতে চাইছিল। যা থাকে কপালে—বলেই দেবে সব।

কিন্তু শেফালী থামলো না। খাবার টেবিলে হাত রেখে চেয়ারে এমন করেই বসলো—যাতে মনে হবে ট্রেন ফেল করেছে বুঝি। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, তুমি কি তোমার সেই কোন্ সুকুমারদার তপোবনে গিয়েছিলে? একটা হরিণ থাকে যেখানে? সেই যে পুলিস দিয়ে গেল সেবারে—

আসল কথা বলার কোন পথ না পেয়ে দেবকুমার রাগে রাগে বললো, হুঁ।

সেই মেডিকেলের পেছনে? পরামাণিকও যায় সেখানে?

হুঁ। বসলে একবার কিছু না কিছু কামাতে হবেই। ভ্রূ-র ওপর দিয়ে আমার গেল। কেউ কেউ তো আধখানা করে গোঁফ উড়িয়ে দিল।

তবে যে সেদিন রাজুকে বলছিলে—

কি?

ডাক্তার—হরিণ—তপোবন—কোনোটাই খুঁজে পাচ্ছো না। সব নাকি মুছে গেছে—

কাল দুপুরে হঠাৎ পেয়ে গেলাম আবার। সব এক সঙ্গে!

ওরা রং মাথায় মুখে?

ওখানে সবাইকেই মাখতে হয় শেফালী।

একটা কথা বলি। আমি রুণুকে খবর দিচ্ছি। তুমি বড় কোন ডাক্তার দেখাও। তোমার ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে—

হ্যাঁ শেফালী। আমি জানি।

দেবকুমারের স্থির চোখ—তার একটু ওপরে কামানো ভ্রূর

জায়গায় মুছে যাওয়া তুলির টান দেখতে দেখতে শেফালী বসে বসেই কেঁপে উঠলো। এভাবে তো কোনদিন ও স্বীকার করে নি। এটা কি হেরিডিটারি ? তাহলে তো রাজুর হবে। একদিন রুণুরও হবে।

জেনেশুনে তুমি তাহলে বিয়ে করলে কেন ?

তখন তো জানতাম না শেফালী। এই প্রথম ধরা পড়লো।

তাহলে রাজুর—রুণুর জীবনটাও তো একদিন নষ্ট হয়ে যাবে।

তার কোন মানে নেই। আমার বাবার তো ছিল না।

হয়তো তোমারই প্রথম হোল। তোমার থেকেই ছড়াবে।

আমার মনে হয় না শেফালী। এ রোগ হয়তো হেরিডিটারি নয়।

তুমি তো আর ঠিক ঠিক জানো না।

তা সত্যি। তবে সিমটম দেখে ধরা যাবে শেফালী।

শেফালী এবার নিজের ভেতরে চিলিক দিয়ে কেঁপে উঠলো।

দেবকুমার মুখ গম্ভীর করে বলতেই থাকলো, লক্ষণ ফুটে উঠবে আগে। এখন তো আমি এ রোগের সব জানি। আর আনাড়ী নেই। প্রথমবার ছিল কিনা আমার বেলায়। চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে আমায় সুস্থ প্রমাণ করতে বলেছে অফিস। ততদিন তো বাড়ি বসে হাফ-পে পাবোই। অসিতদের ওখানে তোমার মাইনেটা একটু বাড়াতে বল না। এই ছ'মাসের জন্যে। ওরা তো সিমপ্যাথেটিক।

এই ছ'মাস বাড়ি বসে থাকবে নাকি ?

আহা ! ছ'মাস না থাকি—পনেরো কুড়িদিন তো থাকবো। নতুন ভ্রূ না গজালে বেরোবো কি করে !

শেফালীর অনেকদিন পরে মনে হোল—তার স্বামীর সব কথাই তো স্বাভাবিক। তবে যে অসিতদা বললো, অফিসে রং মেখে গিয়ে খুব ভায়োলেণ্ট পাগলামো করেছে।

কালও সেই ডাক্তারবাবু সঙ্গে ছিলেন ?

হ্যাঁ। ডাক্তার ছিল। হরিণ ছিল। সুকুমারদা ছিলেন।

সবই তোমার মাথার কল্পনা। নাহলে দেখা দিয়ে আবার সব বেমালুম মুছে যায় কি করে ?

এটাই তো এ রোগের লক্ষণ।

কি খেলে তোমরা ?

এমন স্বাভাবিক গলায় শেফালী আগের মত তার কথা শুনছে দেখে দেবকুমার মনে মনে জ্বলে গেল। অসিত আমার সম্পর্কে শেফালীর মাথায় কি কি যে ঢুকিয়েছে কে জানে! যা বলবো—তাই বিশ্বাস করবে এখন। কবে যে শেফালীকে ডাক্তার, হরিণ, সুকুমারদার কথা বলেছে—তা মনে করতে পারলো না দেবকুমার। হয়তো রাজুকে বলেছে। রাজু তার মাকে বলে থাকতে পারে।

শেফালী আবার জানতে চাইলো। কি খেলে তোমরা সবাই ?

চরস।

এদিনই সন্ধের দিকে অসিত দত্ত এক নতুন কায়দায় শেফালীকে আকর্ষণ করছিল। পাশ থেকে। নিজের একখানা হাত শেফালীর বগলের নীচে দিয়ে। শেফালী সরে গেল।

সময় কম। ঝুঁকি বেশি। শেফালীর তো এমন করার কথা নয়। অসিত অবাক হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে বললো, কাছে এসো। কে এসে পড়বে আবার—

আসুক না।

বাঃ। জেনেশুনে ছেলেমানুষী করছো শেফালী।

কে ? আমি ? না, তুমি অসিত ?

সময় চলে যাচ্ছে। এক্ষুণি ঋতুর বিহেবিয়ার ক্লাশ ভাঙবে।

বলো ম্যানার্সের ক্লাস। আদব কায়দা, ওঠা বসা শেখার ক্লাশ। তোমায় কিছুই শেখায় নি ঋতুদি!

বেশ খাজা একটা রসিকতা করলো অসিত দত্ত। এই একটাই শিখিয়েছে ঋতু। এসো।

না। তুমি একটা কাজ করতে পারবে আমার জন্য অসিত—

তোমার জন্য সব পারি আমি! এই ছাখো না—কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। এসো—সময় চলে যাচ্ছে—

তুমি ঋতুকে ছেড়ে দাও। তোমার তো স্কুল আছে।

এটা ঋতুর বাবার বাড়ি শেফালি। স্কুল তো সবে জমে উঠেছে। আরও কত বড় হবে। এসো—

শেফালী দেখলো, রাস্তার দিকের জানলায়—মেঝের ঠিক ওপরেই দু'শিকের মাঝখানে একখানা মুখ সেঁটে লেগে আছে। তখন অলিতে গলিতে সন্ধ্যার বাতাসে নানা রকমের গন্ধ। গরম কালের গোড়ায় ছাঁকা তেলে পেঁয়াজী ভাজা চলছে। অফিসঘরের এদিকের জানলার গায়ে রাস্তায় লোক চলাচল করে না একদম। অফিসে না গিয়ে পেটে পেটে দুষ্টু বুদ্ধি তো কম নয়।

শেফালী এগিয়ে যেতেই অসিত তাকে ধরে ফেললো। চুরি করে এই জড়াজড়িতে এক রকমের জ্বর আসে গায়ে। বেশিক্ষণ থাকে না। অসিতের মুখের কাছাকাছি নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে শেফালী একটা জিনিস দেখতে পেল। আরে আশ্চর্য তো! অসিতের ভ্রূ কী হোল। শেফালীর একবার মনে হোল—আমার মুখের ছায়ার মধ্যে মিশে গেছে বোধ হয়।

দেবকুমারের স্কুল জীবনের এক ক্লাশফ্রেণ্ড এখন কলকাতায় বড় ডাক্তার। সে একবার তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপরটা ডলে দিয়ে দেবকুমারকে বলেছিল—এই যে দেখছিস ডলে দিলাম—অমনি হাতের ওপর লক্ষ লক্ষ সেল ঘষা খেয়ে মরে গেল। আর যেই হাত তুলে নিলাম—আবার লক্ষ লক্ষ সেল তৈরি হয়ে গেল।

এদের চোখে দেখা যায় না। আমাদের শরীরে অবিরাম সেল জন্মায়—মরে—আবার জন্মায়।

ডাক্তারের এই কথাটা তার মনে অনেকদিন ধরে জমে আছে। সে এক এক সময় ভাবে—পৃথিবীটাও তো তাই। মানবধারা জন্ম মৃত্যুর অধীন। অবিরাম মানুষ আসছে। মানুষ যাচ্ছে। এক কালের সুখদুঃখ, কোলাহল—আরেককালের সুখদুঃখ, কোলাহলের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। ভালো নখ থাকলে সময়ের গা থেকে বাতাসের ছাল আলগোছা তুলতে পারলে হয়তো ১৮৩৮-এর কোলাহল, সুখ-দুঃখ, হলাহল উঠে আসবে। কিছুই তো হবার নয়। শুধু চাপা পড়ে থাকে। যেমন পড়ে আছে ডক্টর কাবাসের চেম্বার, সাইনবোর্ড, দোতলায় ওঠার মোজাইক করা সিঁড়ি, মেডিকাল কলেজের হাতায় আমগাছ, হরিণ, ধুনীর আগুন ঘিরে মানুষজনের মাথা। রাংতা মোড়া ছোট্ট একটা বিচি। পোড়ালে হ্যাজাকের জ্বলে যাওয়া ম্যানটেল। বাতাসের পাতলা ছাল। টোকা দিলেই ঝুর ঝুর করে ছাই হয়ে পড়বে। সময় খুব পুরনো হলে পাহাড়ের গুহায় কালচে আলো আর ক্যাকাশে ধুলো হয়ে পড়ে থাকে।

জষ্ঠি মাসের দুপুরবেলা। শেফালী তার ঋতুদির স্কুলে। রাজু স্কুলে যায় নি। খানিক আগেও দেবকুমারের সঙ্গে দাবা খেলার চেষ্টা করেছে। বাবা তুমি চাল ভুলে যাচ্ছো। খেলায় মন নেই—

এখন রাজু একা একাই দান দিচ্ছিল। আশপাশের বাড়ির ছায়া সব একদিকে হেলে যাচ্ছে। গেরস্থরা যে যার অফিসে। গিন্নীরা বেশী বেলায় কাপড় কেচে, ভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছে। মানুষ ক্রমাগত বেশি জন্মাচ্ছে বলে—বাড়িগুলোর রকে বাড়ির কাজের লোকেরা যেমন আড্ডা দিচ্ছিল—তেমনি সংসারে উদ্বৃত্ত ছেলেমেয়েরা ফাঁকা ফুটপাতে একই সঙ্গে ঝগড়া, মহত্ত্ব, মারামারি, নীচে নেমে যাওয়া প্র্যাকটিস করছিল।

ঠিক এই সময় দেবকুমারের ঘিলুতে অম্বলের ব্যথার কায়দায়

একটা কবিতা ঢুঁসোতে শুরু করে দিল। অগোছালোভাবেই এসব লাইন এসে পড়ছিল।

সব গান এখন সবাক মমি
যে কোন রেকর্ড উল্টো দিকে ঘুরে
সময়কে সঙ্গীত করে
উঠে আসে উচ্ছ্বাস, পিয়ানো
গ্র্যাণ্ড মেহগনি, এবোনি পালিশ
যে জীবন আসবে বলে এখনো
গর্ভ পায়নি তাই খোঁজে বারবার
রিলে রেসের চতুর্থ বা অন্তিম সাঙাৎ
সব গান এখন সবাক মমি
সময়কে উল্টো করে বাজাও
সে তোমাকে দেবে কোমল নিখাদ
আনন্দাশ্রু গমকে গমকে বিষাদ

আমি জানি আমি এখনো কবিতার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কবিতা পাই নি। বাতাসের ভেতর বালি দিয়ে লেখা কিছু লাইন আমার প্রায়ই চোখে পড়ে। ঝিলু থেকে তাদের কপি করে কাগজে তুলতে তুলতেই দানা-বালির লেখা বাতাস উড়িয়ে দেয়। মন এক জায়গায় করতে পারলেই আমি কবিতা পেয়ে যাবো। কবি পি. মুখোপাধ্যায় জানেন—আমার এবং তাঁর চোখের এক পর্দা ওপাশেই কে যেন দাঁড়িয়ে থেকে সবসময় আমাদের ওয়াচ করে। আমাদের নত চোখ তাঁর দাঁড়াবার পক্ষে খুব উপযোগী। নয়তো যদি চোখ তুলে তাকাই তো কে কোথায়! কেউ নেই তো। আবার চোখ নামালেই তিনি এসে দাঁড়াবেন।

এই রাজু। চল আমরা ছাদে যাই।

যাবে? চলো। কিন্তু রোদ্দুর যে বাবা—

চিলে কোঠার ছায়ায় বসবো।

ছাদে উঠেই রাজু জানতে চাইলে, তুমি তো সুস্থ লোক বাবা। অফিসে যাবে না ?

আমি যে সুস্থ লোক—সে তো তুই একা বুঝিস।

জানো বাবা। তুমি কিন্তু বুড়ো হওনি। শুধু বাইরেটাই—

কি করে বুঝলি ?

দিব্যি সিঁড়ি টপকে টপকে ওপরে উঠে এলে। তুমি কাল থেকেই অফিসে যাও বাবা।

দাঁড়া। এই কবিতাটা টুকে রাখি। হয়তো ভুলে যাবো।

ডাইরি এনেছো ? আমায় দেখাবে ?

দেখিস। এমন কিছু নেই। একটা জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে মিশিয়ে লিখেছি। তোকে পড়ে শোনাবো'খন। আগে কবিতাটা লিখে রাখি—নয়তো ভুলে যাবো।

দেবকুমার মনে করে করে লিখে রাখছিল। কবি পি. মুখার্জীকে আজই সন্ধেবেলা দেখাতে হবে।

রাজু আবার বললো, তুমি তো সুস্থ লোক বাবা। কালই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে অফিসে জয়েন করো।

আমার ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরার রোগটার কি হবে তাহলে ?

বড় ডাক্তার দেখাও বাবা। চুলে কলপ দাও। দাড়িটা কামাও। তাহলে তুমি আগের মত হয়ে যাবে।

লিখতে লিখতেই দেবকুমার বললে, আগে কি রকম ছিলাম—

একদম বাবার মত।

এখন ?

সব সময় বুঝতে পারি না বাবা। কালই তুমি অফিসে যাও।

দাঁড়া। আগে ভ্রূ গজাক পুরোপুরি। তবে তো। নে—একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোকে। খানিকটা বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে গেছে—খানিকটা আবার রবীন্দ্রনাথের মত। সাবজেক্টটা তো খুব কঠিন। তুই বুঝবি তো ?

পড়ো না তুমি।

পড়া শুরু করার আগে দেবকুমার দেখলো, কলকাতার আকাশপথ জুড়ে কতকগুলো বিবর্ণ বাড়ির মাথা। জষ্ঠি মাসের দুপুরবেলার রোদ হেলে পড়লেও যতটা জ্বালানো পোড়ানোর দরকার—তা সারা। এর ভেতরেও কয়েকটা পুরনো বাড়ির দেওয়াল ছায়া পেয়ে অনেকদিন হোল শ্যাওলা জমার জায়গা করে দিয়েছে। দেবকুমার বললো, তোর কি ভাল লাগবে রাজু?

আমি তো দেবী চৌধুরাণী পড়েছি বাবা।

তাহলে শোন—এ আমার নিজের জন্যে লেখা কিন্তু। পাছে ভুলে যাই—

আর ভূমিকা করতে হবে না। পড়ো বাবা—

এই জীবনের অনেক গূঢ় রহস্যের সন্ধান জীবনে তাকাইলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর আয়নাই হইল জীবন। মনুষ্যেতর প্রাণীর বোধশক্তি কোনরকম মনের অভাবে বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। এই বিশেষ দিক বলিতে বুঝাইতে চাই—বাঁচিয়া থাকার কারণ, দেহধারণ, আনন্দ আহরণ। এই কাজগুলি বুঝিতে বুঝিতে মন ও দেহের সর্বকোষে নিজেকে ও এই রূপময় পৃথিবীকে বুঝিতে পারার নিরন্তর চলন্ত বাঁচিয়া থাকাই জীবন।

কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না বাবা।

আরেক জায়গা পড়ি শোন—

এক একদিন মনে হয় বাতাসে সাঁতার কাটিতেছি। শঙ্খচিল, শালিক, পায়রা—ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আমিও উড়িতেছি। তখন আমার হাত দু'খানি ডানা হইয়াছে। ওষ্ঠে চঞ্চুর আভাস। পা দু'খানি জুড়িয়া গিয়া একটি অভিন্ন পুচ্ছ। আমার বুকের নীচে বাতাস কাটিবার সাঁই সাঁই আওয়াজ পাই। উঠিতেছি—আরও উপরের বাতাসে উড়িতেছি—ভাসিতেছি। আঃ! কি মুক্তি।

অনন্ত বায়ুকণা আমারই শরীরে ঘষা খাইয়া আমাকে ভাসিবার জায়গা দিতেছে।

আমিও বাবা এক একদিন ঘুমের ভেতর ভাসতে থাকি। পুকুরে পা দিয়ে জলে লাথি মেরে যেমন ভাসি—তেমনি বাতাসে পা দাপিয়ে দাপিয়ে এ বাড়ির মাথা—ও-বাড়ির চিলেকাঠার পাশ কেটে ভেসে বেড়াই—

আরেক জায়গা পড়ছি শোন—

চুনে হলুদ হরিণটা এইবার পোজিশন নিল। তার চোখে পুরু করে আঠা আঠা কাজল। ভেতরে চোখের মার্বেল-মণি টলমল করে। সেখানে কোন কথা নেই। আছে অভিমান। সগুল্ম আর বিদায়। ছুটন্ত তীর হয়ে সে ছাদ থেকে লাফ দিল। বাতাসের ভেতর অনেকটা গোত্তা খেয়ে বিঁধে গেল প্রথমে। তারপরই পতন শুরু। পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণ সর্বদা সরলপথে ঘটে।

ডাইরি বন্ধ করে দেবকুমার তার নিজের কান্না সামলাতে চাইলো। মানুষ সর্বদা নির্জনে কাঁদতে চায়। কোন সাক্ষী না রেখে।

আমার একটা কথা শুনবি রাজু। চল। আমরা ওই কার্ণিসে দাঁড়াবো।

নিচে পড়ে যাবো যে বাবা।

না। পড়বি না। আয়—। তোকে আজ দেখাবো—কী করে ওড়া যায়—

সত্যি ?

হ্যাঁরে। ওড়া খুব সোজা। শুধু কায়দাটা জানা চাই। গোড়ায় একটু অসুবিধা হয়। মনে হয়—এই বুঝি নিচে পড়ে গিয়ে আছাড় খাবো। কত হরিণ লাফ দেয়। পাহাড়ের চুড়ো থেকে হরিণরা নিচের খাদে ঝাঁপ খায়—

বাবা।—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রাজু। পড়ে যাবে—

ভয় পাচ্ছিস কেন? আয়। কাছে আয়।

রাজু এগিয়েছিল। দূরে নিচে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ফুটপাথ থেকেই শেফালী ওদের দেখতে পেল। দেখেই পড়িমরি করে ছুটতে লাগলো। ফাঁকা আকাশের গায়ে দেবকুমারের মাথার শাদা চুল দুপুরের বাতাসে উড়ছে। তার গায়ে কালো হাফপ্যাণ্ট পরা রাজু সেঁটে আছে। দূর থেকে শেফালীর মনে হোল—ছেলেটা বাপের গায়ে সিটিয়েই আছে।

আর এগোতে পারছি না বাবা। এটা তেতলার ছাদ—

অত ভয় কিসের রাজু।

কার্ণিশগুলো পুরনো বাবা। মুট করে ভেঙে যাবে।

পড়লেই বা! হরিণরা তো চোখের পলক না ফেলে ঝাঁপ খায়। মাথার সিং সুদ্ধ বাতাসে গোত্তা মেরে কী সুন্দর ঝাঁপ দেয়—

ওদের চোখে তো কাজল থাকে বাবা।

হ্যাঁ। কাজল পরে নিবি চোখে রাজু?

তাই ভালো বাবা—বলে রাজু ছাদের নিরাপদ জায়গায় চলে আসবে এমন সময় দুদ্দাড় করে শেফালী ছুটে এসে রাজুকে জড়িয়ে ধরলো। তার চোখে জল। খোঁপা ভেঙে গিয়ে বাতাসে চুলের গোছা চিরে যাচ্ছে। তার পেছন পেছন বাড়িওয়ালারা দু'ভাই। পর পর। তাদের ছেলেরা। বাড়ির কাজের লোক। সবাই হাঁপাচ্ছে।

দেবকুমার এতক্ষণ একটা নিবিড় ব্যাপারে একদম ডুবে ছিল। শুধু সে আর রাজু। আর বাতাসে উড়ে যাওয়ার ব্যাপার। দেবকুমার ছাদে ছুটে এলো। এত নির্জন কাণ্ডে এত লোক কেন? এসব একদম অপছন্দ তার।

শেফালী রাজুকে নিজের গায়ে চেপে ধরে গলা চিরে ফেলে

চেঁচিয়ে উঠলো। হ্যাঁ। এই লোকটা। এই লোকটাই। একে আপনারা পাড়া-ছাড়া করুন। পাড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আসুন লোকটাকে।

শেফালী? কি বলছো তুমি? আমি—তুমি চিনতে পারছো না?

হাড়ে হাড়ে চিনি।

তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি শেফালী?

পাগল! কে হয়েছে সবাই জানে। আপনারা তাড়িয়ে দিন লোকটাকে। সব্বনেশে লোক।

রাজু হকচকিয়ে গিয়ে একটা কথাও বলতে পারছিল না। বাড়িওয়ালাদের বড় ভাই এগিয়ে এলো, তুপুরবেলা ছাদে এসেছিলেন কেন? অফিস নেই?

শেফালী ফুঁসিয়ে উঠিলো। অফিস! সে পাট চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি বসে আছেন।

অফিস যাচ্ছেন না?

এবারও কথা জুগিয়ে দিল শেফালী। চাকরি আছে যে যাবে!

দেবকুমার এগিয়ে এলো এবারে, এসব কি বলছো শেফালী? খাম তো বাড়ি বসেই পাবে কমাস—

আগে পাই। বলে শেফালী রাজুকে হাতে ধরলো। চল, যাই আমরা। সিঁড়িঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, ফুল পে-র বহর তো আমাদের জানা। নইলে আমি চাকরি নেব কেন? ভাগ্যিস নিয়েছিলাম।

ছাদ ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু বাড়িওয়ালার তু'ভাইয়ের তুই কাজের লোক তার মুখের দিকে তাকিয়ে। দেবকুমার কটমট করে তাকিয়ে বললো, কি দেখছিস? নিচে যা—

আপনিও চলুন বাবু।

কথাটা দেবকুমারের মাথার একদিকে গেঁথে গেল। সত্যিই তো! শেফালীর হিসেব মত সে যদি পাগল-ই হয়—তাহলে তাকে

এই ন্যাড়া ছাদে সবার মত শেফালীও কি করে একা ফেলে যায়? শেফালী তো আমার বউ। বিশেষ করে একটু আগেই যখন আমি কার্ণিশে উঠেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমারের চোখের সামনে একটা ফাঁকা অফিসঘর সন্ধেবেলায় ইলেকট্রিক আলোয় চকচক করে উঠলো। রাস্তা ঘেঁষা জানলায় কয়েকটা শিক। দেবকুমারের নিজেকে ইচ্ছে হোল খোলা আকাশের মাঝখানে পুরোপুরি রোদ্দুরে আগাগোড়া জ্বলে যাওয়া খাক বানাতে। রোদে পোড়া বাঁশ-বাগানের জ্বলে যাওয়া একখানা বাঁশ সে।

তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি—

না বাবু। আপনিও চলুন। খুব বুঢ়া হয়ে গ্যালেন—

দেবকুমার কোন জবাব দিলো না। সে আগে। পেছনে দু'ভাইয়ের দুই কাজের লোক। চিলেকোঠা থেকে সিঁড়িটা খানিকক্ষণ অন্ধকার।

॥ দশ ॥

বাড়িওয়ালাদের দু'ভাই সন্ধ্যে অব্দি মিটিং করলো। বিষয়: দেবকুমার। যতটা না দেবকুমারের কল্যাণ কামনায়—তার চেয়ে বেশি এই চিন্তা যে—পাগল লোক। কখন কি করে তার ঠিক নেই। একটা অপঘাতের কেস হয়ে গেলে তো বাড়িটাই অপয়া হয়ে যাবে। এছাড়া তো থানা পুলিস।

এমনিতে দু'ভাই দুই তলায় থাকে। বড় ভাই এরিয়ান্সে খেলতো ফট্টি-টুতে। এখন অফিস যায়। অরগান বাজায়। ব্লাড্ সুগার। বউ নেই। ছোট ভাই সব ম্যাগাজিন পড়ে আশপাশের লোককে উপদেশ দেয়। দু'জনে ঠিক করলো, পাড়ার ছেলেদের বলতে হয়।

রাতটা রাজু অনেকদিন পরে মাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকলো। পরদিন ভোরে অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগেই বসুজ ইটিং লজে সকাল হোল। জমাদারকে অন্যদিন জল দেয় বাবা। আজ রাজু দেখলো, মা দিচ্ছে। পাশের ঘরের দরজা খোলা থাকে অন্যদিন। আজ দেখলো বন্ধ। বারান্দা ঘুরে ঘরে ঢুকে দেখলো, পাখা ঘুরছে। বাবা তখনো জাগে নি। মা বাথরুমে। রাজু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বাবাকে দেখলো। বাবা যে রোগা হয়েছে তা নয়। কিন্তু সেই চকচকে ভাবটা আর নেই। মাথাটা প্রায় সাদা। চোখের নীচে মোটা করে দুটি দাগ। হাতের দু' একটা লোমও সাদা। চোখের চামড়া কুঁচকে গেছে।

ইস্কুল যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার মোড়ে পৌঁছে রাজু বুঝলো, সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। ফুটপাতে জুয়া-সাট্টার

দোকানে অন্যদিন যারা নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে—আজ তারাই ক'জন তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওদের একজন তো বলেই ফেললো, স্কুল থেকে একটু আগে ফিরিস—মজা দেখতে পাবি রাজু।

ওদের সঙ্গে কোনদিন কথা বলে নি রাজু। কী মজা হতে পারে? ভাবতে ভাবতেই সে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হোল।

অফিস কাছারির লোকজন বেরিয়ে পড়লে পাড়া জুড়িয়ে আসে। তখন কাক নামে ফুটপাতে। ওদের মিটিং বসে টেলিফোনের তারে। নকল স্টেনলেস স্টিলের বাসন গছিয়ে বেনারসীর পাড় কিনতে বেরোয় সুরাটী বাসনওয়ালী। ঠিক এই সময় পাড়ার ক'টি ছেলে এসে বেল টিপলো দরজায়।

খা খা বাড়ি। শেফালী বেরিয়েছে। দেবকুমারের খাবার ঢাকা পড়ে রয়েছে। এভাবেই ক'মাস হোল রেখে যায় শেফালী—বেরোবার সময়। বেশী বেলায় ঘুম থেকে উঠেই মুখের ভেতরটা শুকনো লাগছিল দেবকুমারের। তখন রাজু বেরিয়ে গেছে। শেফালী যাবে যাবে। দেবকুমার একবার শুধু বলেছিল, আজ না বেরোলেই পারতে—

কালকের দুপুরের ব্যাপারের পর শেফালী আর তার দিকে তাকায় নি। কথাও বলে নি। যাচ্ছি, আসছি—এসবও বলে নি। সকালের চা ঠাণ্ডা হয়ে ফিনফিনে সর ভাসছে ওপরে। দেবকুমার বুঝতে পারছিল—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংসারে পুরুষ শুধুই কর্মকাণ্ড দায়দায়িত্বের বোঝা বয়ে বেড়াবার যন্ত্র হয়ে যায়। তার আর কিছু থাকে না। সংসারে যে যার প্রয়োজন তখন তার শরীর থেকে, মন থেকে, সামর্থ্য থেকে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে টেনে নিয়েছে—বা নেয়। আজকাল কিছুকাল এসব কথা তার মাথার ভেতর ঘোরে। মাথার ভেতরে এই ঘোরাটাই কবিতা হয়ে আসতে থাকে।

পুরুষ !
তুমি এ জনারণ্যে নিষ্পত্র
নির্ডাল বৃক্ষকাণ্ড মাত্র
তোমার শিকড়ের রসে গজানো
ডালপালা, ঝুরি, ভাড়াটে শালিখ
ঘড়িদার তক্ষক, আশ্রিত সর্পনিবাস
সবই কাটা পড়ে—উৎখাত কয়েকটি তছনচ সদ্য স্তনচ্যুত
সংসারে তুমি পুরুষ একা দাঁড়ানো বৃক্ষকাণ্ড
অপেক্ষা করো নির্ভুল করাতিয়ার ডেকে আনা
আগন্তুক দশচক্র টাটা-মর্সিডিজের

দেবকুমার ঘস ঘস করে লিখে ফেলেই ঠাণ্ডা চা এক চুমুকে খেয়ে নিল। মুখের ভেতরটা এখন কষাটে চায়ের তিতকুটেতে ভরে গেল। জীবনের শুরুটা আমার আর মনে নেই। এই সেদিনও থাকতো। পেছনটা কেমন আবছা হয়ে যাচ্ছে। সামনের জানলায় গত বছরের স্কন্ধকাটা আঁটির আমগাছটা ডালপালার অভাবে রোদে জ্বলে যাচ্ছিল। প্রায় বছর খানেক আগের একটা কথা মনে পড়ায় পুরো ছবিটা তার চোখে বিঁধে গেল। তখনো শেফালী ঋতুর স্কুলে ঢোকে নি। তৃপ্তি তখনো কাজ করতো এ-বাড়িতে। একদিন দুপুরে কেউ বাড়ি নেই। সামনের দরজায় খিল। দেবকুমার অসময়ে শেফালীকে জড়িয়ে ধরেছিল। ভীষণ টান এসেছিল তার। শেফালী ঠাট্টা করে বললো, হঠাৎ কি হোল ?

পারছি না শেফালী। বলেই জোরে বিছানায় চেপে ধরেছিল।

দায়সারা গোছে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে শেফালী তাকে নিয়েছিল। নাও। হোলো তো ! এবার নামো। নামো বলছি।

এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ায় দেবকুমার নেমে পড়েছিল। পড়তে পড়তে তার একবার মনে হয়েছিল—সে কি কোন বাইরের লোক ? বাড়ীর গিন্নী শেফালী কি তাকে খবরের কাগজে আগের

রাতের বাসি ভাত বেড়ে দিয়ে বলছে—নামো। বারান্দা থেকে নামো তাড়াতাড়ি।

সেদিন তার নিজের মুখ দেখতে পেয়েছিল দেবকুমার। আর পারছি না শেফালী। এসো। ঠিক এই মুখের ছবি সে দেখতে পেয়েছে অসিতের মুখে। সন্ধেবেলার অফিস ঘরে। ঋতুর স্কুলের অফিসে রাস্তার গায়ের পুরনো জানালার শিকে মুখ লাগিয়ে।

এবারের দরজার বেল দেবকুমারের মাথার চুলের নীচের রগে গিয়ে ধাক্কা খেল। একটানা। সেই সঙ্গে হেঁড়ে গলা—বেরিয়ে আসুন না দাদা—

দেবকুমার চমকে উঠে এলো। খোলা সদর দরজায় তিন চারখানা মুখ। এরাই দোলের দুপুরে ট্যাক্সির পেছনের কাচে আধলা ইট ছুঁড়ে দেয়।

কি ব্যাপার? কিসের চাঁদা?

চাঁদা নয় চাঁদু। তোমায় নিতে এসেছি।

দেবকুমারের চোখে রোদ্দুরের সব ঝাঁঝ ঘোড়া হয়ে দাপাতে লাগলো।

ভদ্র ভাবে কথা বলো।

সে তো বলবোই—বলে তাগড়া একজন ভেতরে ঢুকে দেবকুমারকে প্রায় একটা মাছ করে ধরে ফেললো। শক্ত হাতে। এই ভাবেই বড় শোলের লেজ ধরে মাছওয়ালা তুলে দেখায়। ভোরের বাজারে। রসগোল্লা—রসগোল্লা বলে ডাকও ছাড়ে।

দেবকুমারের সব গোলমাল হয়ে গেল। ঘোর কাটলো—যখন সে রাস্তায়। আশপাশের বাড়ির সব জানলা বন্ধ। তার নিজের বাড়ির দরজাটা খোলা পড়ে রয়েছে। কেউ বাড়ি নেই। তাগড়া ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদরা তাকে পাটকাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল। কত পাগলামো করবে চাঁদু—করো। প্রাণ খুলে করো।

ততক্ষণে ভিড়টা বেপাড়ায় পড়ে গেছে।

রাস্তার দু' একজন বললো, কি করছেন? ছেড়ে দিন না।

কি বলছেন দাদু! সেয়ানা পাগল। নিজের ছেলেকে নিয়ে কেউ কার্নিশে দাঁড়ায় বলুন?

বেপাড়ার লোক বলে, পাগল তো। ছেড়ে দিন না।

এইসব কথাবার্তার ভেতর দেবকুমার দেখতে পাচ্ছিল—তাকে ঘিরে রাস্তার ভিড় বাড়ছেই। এটা ভদ্রপাড়ার মাঝখিনে পড়ে। শুয়োরের পাল। রেল লাইন। তৃপ্তিদের পোড়া বস্তি। ম্যাথর পাড়া। মুলী বাঁশের আড়ৎ। সাদা রংয়ের রাসবাড়ি। পেছনেই আদিগঙ্গা। লোকাল ট্রেন চলে গেল বজবজে। বেলা দুটো তিনটে হতে পারে। তাগড়া লোকটা চোখের ওপর থাপ্পড় মারায় বাঁ চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিল না দেবকুমার। বেপাড়ার লোকের কথাবার্তার ভেতর দেবকুমার নিজের কথাটা জুড়ে দিয়ে দেখলো—কাজ হয় কিনা—

আপনারা তো আমায় পাগলা গারদে দিয়ে দেখতে পারেন—

দেবকুমার এই বুদ্ধিমান কথাটা বলে মাথায় আরেকটা চাটি খেল। দেখলেন তো—কেমন সেয়ানা—

তখন দেবকুমারের পাছায়, পায়ে—ছোটখাটো ছোকরারা লাথি কষাচ্ছিল। পড়তি বিকেলের দিকে দেবকুমার বস্তু বেসব্রিজ স্টেশনের উঁচু প্ল্যাটফর্মে উঠতে লাগলো। উঠতে উঠতেই বললো, বাড়ির সদরটা কিন্তু খোলা থেকে গেল।

সে তোমায় ভাবতে হবে না। এক্ষুনি ট্রেন আসবে। উঠে পড়ো।

তোমাদের বউদি এসে যদি দেখে সব চুরি হয়ে গেছে—

চুরি যাবে না। গোগোল বসে আছে। বউদির হাতে বাড়ি বুঝিয়ে দেবে—তারপর ছুটি গোগোলের—

এসব কথা বলতে বলতে তাগড়ার বোধহয় খেয়াল হোল—পাগলের সব কথায় তো রিপ্লাই দিতে হয় না। আর পাগল তো

নরমাল কথা বলছে। তাই বিরক্ত হয়ে গিয়ে চটে উঠলো। সে আমরা বুঝবো। ওই তো ট্রেন ঢুকছে। ওঠো—এবারে ভালোয় ভালোয় উঠে পড়ো।

ট্রেনের জানলার সিটে যারা বসেছিল—তাদের কাছে এই অপমানটা ঢেকে রাখতেই দেবকুমার টুক করে ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে বসলো। ঠিক করলো, পরের স্টেশনেই নেমে পড়বে। তারপর ঘুরপথে ঘোরাঘুরি করে বেশী রাতে বাড়িতে গিয়ে ঢুকবে। তখন তো আর গোগোল থাকবে না। তাগড়ারা থাকবে না। ট্রেন যাচ্ছিল গম্ভীর গাঢ় ধাঁচে। হঠাৎ মনে হোল—গোগোল কি করে শেফালীর হাতে বাড়ি বুঝিয়ে দেবে? যারা কারও স্বামীকে তাড়ায়—তারাই কি তার বউকে বাড়ি বুঝিয়ে দেয়? তবে কি শেফালী সব জানতো? জেনেশুনেই বেরিয়ে গিয়েছিল? সেজন্যেই কি দোতলা—তেতলা থেকে কেউ নেমে এলো না বাধা দিতে?

দেবকুমারের পরের স্টেশনে আর নামা হোল না। বিকেলের আলোয় পৃথিবী সারাদিনের গরমের পর ঠাণ্ডা হচ্ছিল। ট্রেনের দু'ধারে ঘরবাড়ি, ইটখোলা, গাছগাছালি।

রাজু বাড়ি ফেরার পথে পাড়াতেই সব শুনতে পেল।. চায়ের দোকান, খাটালের দোহাল, সিগারেটওয়ালা, মোড়ের মাথায় জটলা পার্টি—সব জায়গা থেকে তার দিকে চোখ, আলোচনা, হাসি।

বাড়ি ফিরেই শেফালীকে পেল বারান্দায়। মা। বাবা কোথায়?

চলে গেছে। পাগল লোকের কি সব ঠিক থাকে! আয় খাবি আয়—

না। খাবো না। কোথায় গেল বাবা?

আমি কি জানি! যেমন গেছে—তেমন ফিরে আসবে একদিন। বাড়ি ফিরেই তো শুনছি—পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দলবেঁধে কোন্ দিকে চলে গেছে। দুধ পাটালি চিড়ের সঙ্গে কলা মেখে দেবো?

খিদে নেই বললাম তো।

কখন বললি! আয়। খাবি আয়।

খাবো না। বাবাকে খুঁজতে যাবে না মা?

পাগলকে কোথায় খুঁজবি?

বাবা পাগল নয় মা।

সে তুই যেমন বুঝিস রাজু। আমি একটু বেরোবো খানিক বাদে—

থানায় যাবে না একবার?

গিয়ে কি হবে রাজু? অতবড় বয়স্ক লোক তো হারাবার নয়।

রাজু চুপ করে ডালকাটা আমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। একবার ভাবলো মা বেরোলে রুণুদির বাড়ি যাবে। গিয়ে জামাইবাবুকে খবরটা দেবে। বাবাকে তো খোঁজা দরকার।

এখন গরমকালে রাত আসে দেরিতে। সকাল হয় খুব ভোরে। দেবকুমার বসু ভোর টের পাচ্ছিল চোখের ওপর। এত চেনা নাম—আগে আসা হয়নি কোনদিন। বজবজ স্টেশনে সে কাল বেশি রাতে শুয়েছে। কলকাতার এত কাছে এমন পরিষ্কার তকতকে শোবার জায়গা আছে এত—আগে জানা ছিল না। স্টেশন খুলে গেছে অনেকক্ষণ। প্ল্যাটফর্মে টিকিট ঘরের পাশে টানা বেঞ্চটা এবার তাকে ছাড়তেই হবে। লোকজন ঘুর ঘুর করছে। মাঝরাতের কেশো ভিখিরিটা কখন উঠে গেছে। দেবকুমার রেল এলাকার বাইরে এসে বুঝলো, কাছেই নদী আছে। চোখে ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছিল; নদীও চোখে পড়লো। বড় বড় তেলের ট্যাংক। পেট্রল ডিপো। শেফালী তাহলে জানতো—পাড়ার ছেলেরা মিলে এবার আমাকে বাড়িছাড়া করবে? কিংবা শেফালী নিজেই হয়তো ওদের ওপর এ ভারটা দিয়েছিল। পাড়ার ভদ্রঘরের বউদির এ অনুরোধটা মস্তানরা কি ফেলতে পারে! চাই কি কিছু টাকা

খরচাও করেছে এজন্যে। নির্জন নদীর পাড়ে নিজে নিজেই শিউরে উঠলো দেবকুমার।

আমার জীবন তো এরকম ছিল না কোনদিন। ভোরবেলায় নিষ্পাপ চেহারার একখানা লঞ্চ যাচ্ছিল—জল কেটে কেটে। এ নদীর কোন্‌দিকে কলকাতা—কোন্‌দিকে সমুদ্র—তা বোঝার উপায় নেই। কলকাতার এত কাছে আছি আমি—অথচ আমার বউ ছেলে সংসার থেকে আমি কতদূরে! আমাকে আমার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিল। আমি কিছু করতে পারি নি। থানায় যেতে পারি। গিয়েও তো কোন লাভ নেই। আমার বাড়ি আমার নয়। আমার বউ আমার নয়। এসব জায়গায় জোর করেও কোন লাভ হয় না আসলে। আমার হাত দিয়ে সব গলে গেল কি করে? এ ব্যাপারটার শুরু গত বর্ষায়। তখন ছিঁটেফোঁটাও বৃষ্টি হয় নি। শহরের বাইরে সব্জিতে আগাম এসে হিম পড়ে গেল।

বাঁ হাতেই নদীর ঘাট। বড় মাল্লাই নৌকোয় লোক উঠছিল। দেবকুমারও উঠে পড়লো। কোথায় যাবে জানে না সে। অনেক দিন আগেই তার যাবার কোন জায়গা নেই। কেউ তাকে কিছু বললো না। মাল্লাই নৌকোর খোল ভর্তি কুমড়ো। নদী শান্ত। এ এক আশ্চর্য জলযাত্রা। সবার মুখে কথা কমে এলো ঘণ্টা খানেকের ভেতর। নদী তখন বড় হয়ে যাচ্ছিল। সামনের দিকে জলের কোন শেষ নেই। দূর দিয়ে দিয়ে অন্য নৌকো। দুটো লঞ্চ। জামার ভেতর পকেটে গোটা চারেক দশ টাকার নোট ছিল। কি ভাবে থেকে গেছে দেবকুমারের।

দুপুরের পর নৌকোর লোক ঘুরে ঘুরে ভাড়া নিচ্ছিল। একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে ফেরৎ পেল পাঁচ সিকে। বেলাবেলি নৌকো এসে পয়লা যে ঘাটে থামলো—সেখানেই অর্ধেকের বেশি লোক নেমে যাচ্ছিল। পিছু পিছু দেবকুমারও নামলো। নদীর গা ঘেঁষে কয়েকখানা নৌকো ওল্টানো। তাদের গায়ে কাঁচা

আলকাতরা। ডাঙায় বড় এক বিড়ির দোকান। আরেকটায় শালপাতায় ভাত দিচ্ছিল। আঁশটে গন্ধ চারদিকে। ঘেয়ো কুকুর। লোকালয় বোধহয় দূরে। দোকানীর কথায় বুঝলো, সে জায়গা থেকে হলদিয়া তেতাল্লিশ মাইল। নয়া রাস্তা ধরে লরি যায় অনবরত। ওই গাছপালার আড়ালেই সেই নয়া রাস্তা।

দু'টি ভাত খেয়ে দেবকুমার নয়া রাস্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। মাটির বাঁধ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেবকুমার এক জায়গায় একটা পরিষ্কার দিঘি পেল। জল কম। তার গা ধরে পরিষ্কার শালবন। বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে শালের বড় ফুলের বড় পাপড়ি উল্টে পাল্টে দিচ্ছিল। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই হু হু ছুটে যাওয়া লরি দেখা যায়। নয়া রাস্তার খানিক গা চোখে পড়লো দেবকুমারের। পরিষ্কার রোদ। এখনো সন্ধ্যে হতে ঘণ্টা দুই বাকি। শাল জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দিঘির বুক দেখা যায়। ফিনফিনে বাতাস জলের গা গিলে করে দিচ্ছিল। দেবকুমারের বুক ধক করে উঠলো।

শুকনো খড়খড়ে শালপাতায় গাছতলা ঢাকা। তার ওপর টেবিল পেতে চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর কাবাসি। খোলা আকাশের নীচে। কনুই দু'খানা টেবিলে। পাশেই স্টেথিসকোপ। মুখে হাসি। দেবকুমারের দিকে তাকিয়ে দূর থেকেই হাত তুলে ডাকলেন। একটা শালফুল শব্দ করে টেবিলের ওপর পড়লো।

দেবকুমার যাবে কি যাবে না ঠিক করতে পারছিল না। এই সেই মুছে যাওয়া ডাক্তার। কোথায় সেই রানী রাসমণির বাড়ির গায়ের গলিতে চেম্বার—আর কোথায় এই শাল জঙ্গল। কে জানে এ হয়তো ডাক্তারবাবুর আরেক ফক্কিকারী। দূর থেকেই দেবকুমার চেঁচিয়ে জানতে চাইলো, আপনি—আপনি তো ডাক্তারবাবু?

হো হো করে হেসে উঠলো ডাক্তার। আমি ছাড়া কে হবে? আমি তো আমিই। চলে আসুন। শরীর কেমন?

তবু দেবকুমার দাঁড়িয়ে থাকলো।

এরপর রোদ চলে যাবে। দেরি করবেন না। চলে আসুন। এদিকে কোথায়?

দেবকুমার চারদিকে দেখলো। কেউ কোথাও নেই। ন্যাড়া মাঠে কিছুদিনের ভেতর হাল পড়বে। এখন সেখানে ছাড়া গরুর ভিড়। সে অনেক কথা ডাক্তারবাবু। হরিণটা আছে?

সব আছে। চলে আসুন তাড়াতাড়ি। কোথায় যাচ্ছিলেন?

গিয়ে বলছি। আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে এর ভেতর।

সে তো দেখেই বুঝছি। তাড়াতাড়ি আসুন।

দেবকুমার ছুটে এগোতে গেল। এবড়ো-খেবড়ো জমি। পায়ের নীচে শুকনো শালপাতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল। উল্টে পড়ে গেল দেবকুমার। পাতার নীচে যে কত রকমের গর্ত থাকে। উঠতে গিয়ে খেয়াল হোল—কোথায় টেবিল! কোথায় ডাক্তার! কেউ নেই। চারদিকে লম্বা লম্বা ছায়া মেলে শুধু শালগাছ। পায়ের নীচে মোটা পাতির ঘাস। দেবকুমার নয়া রাস্তার দিকে ঘুরলো। যে করে হোক—রাস্তায় গিয়েই পড়তে হবে। ওখানে লরি চলে। লরিতে দু' তিনজন মানুষ থাকে। এ জায়গাটাকে তার ঠিক জঙ্গল মনে হোল না। তার চেয়ে বেশি কিছু। ঘুরতেই সে দু'টো চোখের সামনে পড়ে গেল। পুরু কাজলের বর্ডারে ভাসানো কালো রঙের দু'টো টল মার্বেল। শালের কাঁচা পাতা আর শুকনো পাতার ফাঁকে ডোবা সূর্য লাল আলো দিচ্ছিল। তাই চুনে হলুদ লোমে ঢাকা চামড়া আগুনে রং হয়ে জ্বলে উঠলো। আশপাশে কেউ নেই! রাজু! রাজু রে—ডাক তুলে দেবকুমার ধপাস করে পড়ে গেল। শুকনো শালপাতাগুলো গুঁড়ো হয়ে চুর চুর। বিশেষ করে যেগুলো পড়লো দেবকুমারের বুকের নীচে।

মেচেদা স্টেশনের মালবাবুর নাম বরদা মালখণ্ডী। উনি বড় একটা বদলি হন নি এই বিশ বছরে। মালবাবুকে তাই সবাই চেনে। তিনিও সবাইকে চেনেন। বৃষ্টিভেজা প্ল্যাটফর্মের গা দিয়ে বম্বে মেল বেরিয়ে গেল। গাড়ির লেজটা তাবৎ ঝম ঝম সমেত একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার মুখে মুখে তিনি বিশ্বম্ভরকে ডাকলেন। বিশ্বম্ভর এ লাইনের ট্রেনে আতার সময় আতা—পেয়ারার সময় পেয়ারা—শশা, আনারস—সবই ফিরি করে ফেরে।

ও লোকটা কে রে বিশু ?

আপনার চোখ এড়াবে না জানতাম বাবু। এক সময় নাকি ভদ্দরলোক ছিল।

দেখে তো তাই মনে হয়। বিক্রিবাটা হয় কিছু ?

তা হয়। ফিরি তো বিশেষ কিছু করে না। হয় প্যায়রা—নয়তো আধপোড়া ভুট্টা। ট্রেনে উঠে কথাবার্তা বলে না। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি থামলে তবে কামরা পাল্টায়।

থাকে কোথায় জানিস ?

খড়্গপুর প্ল্যাটফর্মেই শেষ। খায় কোথায় জানি নে—। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোলবো ?

না না। কোন দরকার নেই। বলে মনে মনে মালবাবু মালখণ্ডী মশায় নিজেকেই বললো, রেলের আজকাল কত কেতায় গোয়েন্দা বেরিয়েছে। ছদ্মবেশে লাইন চেক করে বেড়াচ্ছে হয়তো।

দু'দিন ধরে বৃষ্টি ধরার নাম নেই। মালবাবুর অফিস, কোয়ার্টার একই করোগেট ছাদের নীচে। চারদিনের দিন বৃষ্টি একটু কমতে মালখণ্ডীমশাই অফিস-ঘর থেকে দেখতে পেলেন, নন্দকুমার বাজারের পান ব্যাপারীরা চলে যাবার সময় তিন বিড়ে পান ফেলে গেছে। এ স্টেশন থেকে সাউথ ইণ্ডিয়ায় পান বুক হয় রোজ। ব্যাপারীরা তোএত ভুলো নয়। হয়তো কাছেই আছে। হোটেলে ভাত সাটিয়ে

এসে আবার তাকে ধরবে। সস্তার ক্রেটে মাল পাঠানোর হিড়িক পড়ে গেছে এ বর্ষায়।

মালবাবু উঠে এসে বিড়ে তিনটে ঘরে তোলার ব্যবস্থ করছিলেন। জলে ভিজে নয়তো পচে যাবে। কিন্তু তুলবেন বি করে। বিশ্বম্ভর, নন্দন—কোন ফিরিওয়ালাই নেই কাছেপিঠে হঠাৎ নজরে পড়লো, সেই ভদ্দরলোকপানা ফিরিওয়ালা পেয়ারা ডালা পাশে রেখে করোগেট ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে আছে—জলের ছাঁট বাঁচিয়ে। ওর দিকে তাকাতেই লোকটি বললো, তুলে দে বাবু—

হ্যাঁ না—কিছুই বললেন না মালবাবু।

তার পেছন পেছন লোকটি ঘরে এসে তুলে দিল বিড়ে তিনটে দিয়ে আবার বাইরে চলে যাচ্ছিল।

মালবাবু বললেন, তুমিও ভেতরে এসে বোসো না। এই বয়সে ভেজা ভাল নয়।

বাইরে থেকে পেয়ারার ডালাটা ভেতরে এনে মেঝেতে বসলো দেবকুমার। আমার বয়স কিন্তু বেশি নয় বাবু। অল্প বয়সে চুল পেকে গিয়ে—

তা মুখের চেহারা যা করেছো—তাতে বয়স দেখার আর দোষ কি!

কামরায় কামরায় ঘুরে খড়্গপুর অব্দি পেয়ারা বেচে আসি। কম পরিশ্রমের তো কাজ নয় বাবু—

মালবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে গলার স্বর শুনছিল দেবকুমারের। কথাবার্তা পরিষ্কার। হয়তো অবস্থা পড়ে গিয়ে আজ এই দশা। এখুনি পূর্ব জীবন জানতে চাইলে কিছুই কবুল করবে না। রইয়ে সইয়ে তাই জানতে চাইলেন, কে কে আছে?

সবাই আছে।

তবে যে খড়্গপুরের প্ল্যাটফর্মে শোয়া হয়?

আপনি তো বাবু সব খবরই নিয়েছেন। মাল কিনি ঝাড়গ্রামের বাগান থেকে। গস্ত করে খড়্গপুরে এসে শুয়ে থাকি।

পরিবার?

আছে। আবার নেইও বলতে পারেন।

ধাঁধা লাগলো মালবাবুর। তাই সাবধানে ভাববাচ্যে বললেন, সংসার ধর্ম তো করা হয়েছে?

তা হয়েছে বাবু। তবে জমে নি!

ওকথা বলছো কেন?

একটা ছেলে—একটা মেয়ে হয়েছে। তারা বড় হয়ে গেল। আমার আর কিছু করার থাকলো না। সংসারে চাড় পাই নে। কার জন্যে খাটবো। টান পেলাম না।

কেন? পরিবার?

তিনি নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিতে পারেন দেখলাম।

তাই বলে প্যায়রা ফিরি করে বেড়াবে ট্রেনে ট্রেনে? এ কেমন ধারার কথা!

হ্যাঁ বাবু। এইটেই আমার কথা। পরিবার নিজেরটা নিজে চালান। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলে সেয়ানা হয় নি এখনো। মায়ের সঙ্গে থাকে। কিন্তু আমি যে সংসার চেয়েছিলাম অন্যরকম।

মালবাবুর আগ্রহ বেড়ে গেল। তিনি বললেন, কি রকম?

আমি চেয়েছিলাম—অনেক ছেলেপিলে থাকবে। বছর বছর ঝিনুক-বাটি, অয়েলক্লথ কিনবো। সংসারের জন্যে কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকবো। কিন্তু তা তো হোল না। যে যার মত বেড়ে উঠলো। আমার হাতেও আর কাজ থাকলো না। আমার দরকার ফুরিয়ে আসছিল সংসারে—

মালবাবু বাধা দিলেন। সে তো তোমার হাতে ছিল। যত ইচ্ছে বাবা হতে পারতে—

যত ইচ্ছে হওয়া যায় না বাবু—সে তো আপনি জানেনই। তবে আরও তিন চারবার তো বাবা হতে পারতাম—

তা হও নি কেন ?

সময় মত মাথায় আসে নি। যখন এলো—তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। মেয়েটা ছেলেটাও বড় হয়ে গেছে। সংসারে তখন আমিও আর টান পেলাম না।

তা বটে—বলে মালখণ্ডী মশায় এই আজব ফিরিওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বৃষ্টি ধরে আসছে।

দেবকুমার এখন যে যুক্তি দিয়ে কথাগুলো বললো—সে'যুক্তি আজ ক'মাসে সে তার মাথার ভেতর একটা একটা করে সাজিয়েছে। সেদিন শাল জঙ্গলে ঘুরে পড়ে যাবার পর থেকেই সে যেন একজন বাইরের লোক। এই ঘুরন্ত পৃথিবীর বাইরে ভাসতে ভাসতে সে পৃথিবীর সব দেখতে পায়। তারই জীবনের ঘটনাগুলো এখন তার কাছে অন্য লোকের ঘটনা বলে মনে হয়। আমার বড় তাড়াতাড়ি জীবন করা হয়ে যাচ্ছিল। তাই ভেতরে ভেতরে হাড়ে আগাম ঘুণ ধরে গেল। নয়তো এমন হয়ে যাওয়ার তো কথা নয় আমার।

ক'দিনের ভেতর মেচেদা লাইন দেবকুমারের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেল। একই পান। গুড়াখু। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখও তার মুখস্থ হয়ে গেল। এবার বর্ষা ভালোই। বাতাস অদৃশ্য হয়ে ভেসে আসে। তাতে গুঁড়ো বৃষ্টির ঝাপ্টা। একদিন খড়্গপুর রেলবাজার ছাড়িয়ে দাঁতন জলেশ্বর রোডে পড়লো দেবকুমার। হাঁটতে হাঁটতেই। গায়ের শার্ট—পাজামা এখন তার চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে গেছে। রেলের ওয়েটিং-রুমে চান করে করে অভ্যেস অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। রেল-বাজারে মোটা কাপড়ের একটা ঢোলা প্যান্ট কিনেছে আজই দুপুরে। সেই সঙ্গে রবারের চটি আর বেঢপ একটা বুশ শার্ট। এ ক'মাসে ফিরি করে করে তার হাতে প্রায় দেড়শো টাকা জমে গেছে। এখন সে সর্বদাই পেছনে

কিছু না কিছু ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু মাঝে মাঝে নির্জন রাস্তায় তার রাজু রে—বলে ডাক দিতে ইচ্ছে হয়।

খরার সময় পৃথিবীটা কার বোঝা যায় না। বড় রাস্তার গা ধরে মাঠ কে মাঠগুলো পড়ে থাকে। ঘোর বর্ষায় জমির লোকজন জানান দেয়। ঢোল কলমির নিশানা পোতা আল ঘেঁষে হেলেবলদ জমি কাড়াচ্ছে। রোয়া চলছে—যতদূর চোখ যায়—মাঠের পর মাঠে—রাস্তার দু'ধারে। এখন ভিজে হাইওয়েতে তেলের ট্যাংকার ছুটতে দেখলেই মনে হবে—দু'ধারের সবুজের ভেতর এ কি পাগল! কি পাগল !!

দেবকুমার ফলের ডালা ফেলে এসেছে খড়্গপুর প্ল্যাটফর্মে। মাথায় বিড়ে পাকাবার গামছাটাও ফাঁকা ডালায় পড়ে আছে। এক একটা অভ্যেস এক এক সময় গজায় আমার। আবার কেটেও যায় এক সময়। বৃষ্টির মুখটা টাইট করে বেঁধে ফেলে আকাশ কিছু ফাঁপা বাতাস পাঠাচ্ছিল হাইওয়ে দিয়ে। সবে উঠে দাঁড়ানো রোয়া ধান তাতে কাঁপছিল। রাস্তার গা থেকে নেমে যাওয়া জমিতে রেনট্রি জাতের কোন গাছ। তার নীচে হালের বলদ জোয়াল সুদ্ধ দাঁড় করিয়ে পঞ্চাশ ষাট বছরের একজন খালি গা জবরদস্ত মানুষ পান্তাভাত খাচ্ছিল। কানা-উঁচু কলাই থালায়। বেলা ঢলে পড়েছে।

অনেকক্ষণ ধরেই হাঁটছিল দেবকুমার। দিগন্তের গাছপালার মাথায় অসময়ে সোনার রোদ বেরিয়ে পড়ছে। আর খালি মনে হচ্ছিল—ওইসব গাছপালার আড়ালে যে বসতি—তা তার খুবই চেনা। ওখানে গেলেই সবাই তাকে চিনতে পারবে। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে যে ওখানে যাওয়া যায়—তার হদিশ করা কঠিন। চার দিকেই মাটি পাঁক করে ধান রোয়া চলছে।

খালি-গা লোকটি পাঁক মাটিতে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়ানো। কানা-উঁচু থালার তলানি পান্তা চুমুক দিয়ে খেলো। দেখে

দেবকুমারের খুব খাওয়ার ইচ্ছে হোল। বলেই ফেললো—আর পান্তা ভাত আছে ভাই—

লোকটি গোড়ায় অবাক হয়ে তাকালো। আগাগোড়া দেখলো দেবকুমারকে। তারপর হা হা করে হেসে ফেললো। আগে বলবেন তো। শুধু পান্তাই আছে কিন্তু। অন্য কিছু নাই।

তাই দাও।

ভাল করে মান-পাতার আড়াল থেকে পান্তা বেড়ে দিয়ে লোকটি বললো, আপনি এখানে বসে খান। আমি আরেকটা কাঁড়ান দেব। খান না বসে। লজ্জা নেই কোন।

সারা পৃথিবীটা এখন ভিজে জলজ্জ। ভিজে ঘাসে উবু হয়ে বসে খেতে ভালই লাগল দেবকুমারের। একহাত দূরের পাঁক মাটির গন্ধ ভাতে। ভিজে গাছপালার গন্ধ তাতে মেশানো। এখনকার পৃথিবীটাকে সে যেন এইমাত্র পাটালি করে কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিল বলেই মনে হচ্ছিল দেবকুমারের।

বলদদের নিয়ে জলে ঢাকা মাটি কাঁড়তে কাঁড়তে লোকটি অনেকটা দূরে চলে গেছে। গরুদের পায়ে জল কাটার শব্দ। তার ভেতরেই লোকটি দেবকুমারের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে কি বলছিল। একটা কথাও শুনতে পাচ্ছিল না দেবকুমার। রাস্তায় লরির আওয়াজ। ইলেকট্রিক হর্ন। জলে মানুষ আর গরুর পায়ের ছপ ছপ ছপাৎ শব্দ।

দেবকুমার বুঝলো, এই ভিজে বাতাসে দিগন্ত ছোঁয়া নরম রোদ্দুর ধরে একটা দুটো করে লাইন আসছে—। অমনি সে বিড়বিড় করে মুখস্থ রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেকদিন পরে আবার কবিতা আসছিল।

মাটি নিজে ভাত দেয়।
দিগন্তরেখার ওপারেই আরেকটি জীবন
যেন একই সঙ্গে ধরা দিতে চায়।

মাটির নিজের শরীর ভাত হয়ে প্রতিভাত—
ভুত পুনর্গঠনের অতীত
কিন্তু তুমি বারবার মনোমত ভবিষ্যৎ সাজাও।
দিগন্তের আরেক পিঠের নাম হারানো ভুত—
শুধু চিনে নিয়ে তুমি কি পারো না
ফিরে ঢেলে সাজাতে—
মনোমত—স্বাদ, সাধ, বাদ তো সাধে নি কেউ

কি বিড় বিড় করছেন দাদা। পছন্দ হয়নি পান্তাটা?

এ কি একটা কথা হোল ভাই। খুব ভালো লাগলো খেতে—। বলতে বলতে দেবকুমার বুঝলো, সে তার এই এখনকার কবিতাটি চিরকালের মত হারিয়ে বসলো।

কোথেকে আসছেন?

খড়্গাপুর বাজার থেকে ভাই—

কোথায় যাবেন?

কোথায় আর যাবো। তোমার সঙ্গেই যাবো।

আবার হা হা করে হাসলো লোকটি। সে তো অনেক দূর। ওই বাবু-পায়ে হাঁটতে পারবেন তো?

এতটা পথ হেঁটেই এলাম।

তা বেশ—বলেই লোকটি বলদদের কাছে ছুটে যেতে যেতে বললো, ফিরতে ফিরতে বেলা পড়ে যাবে কিন্তু।

অনেক আল, অনেক পাঁক মাটি—অনেক ঘুর পথের এঁটেল মাটির রাস্তায় পা হড়কাতে হড়কাতে দেবকুমার যখন লোকটার সঙ্গে সেই দিনেরবেলাকার গাছপালার আড়ালে বসতি এলাকায় এসে পৌঁছলো—তখন সত্যিই রাত এগিয়ে গেছে খানিকটা।

এই এসে গেলেন কিন্তু দেবেন চাষার বাড়ি। কই গো—? দ্যাখোসে—এক বাবুকে ধরে আনলাম—।

আজ আবার কাকে নিয়ে এলে গো?

বলতে বলতে কুপির শিখা হাতের আড়াল করে এসে দাঁড়ালো দেবেনের বউ। দেখেই দেবকুমারের মনে হোল, শেফালীর বয়সী হবে।

আন্দাজে বললো, খোকাখুকীরা কোথায়?

খড়ের ঘর। তবু এই বর্ষাতেও তকতকে লেপা মাটির ঘোরানো বারান্দা বড় একখানা ঘর ঘিরে। পাশেই কোথাও পাতিহাঁসদের ঘর। কুপির আলো পেয়ে তারা প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো একবার।

আমাদের খোকাখুকী নাই বাবু।

চমকে গিয়ে যে 'ও' কথাটা বলবে—তাও মনে এলো না দেবকুমারের।

বাটি সাজিয়ে খেতে দিয়ে দেবেন বললো, আমরা সদগোপ। আপনি?

কায়স্থ। ওসব আমরা মানি নে—

বারান্দার একদিকে তুষের আগুনে কি সেদ্ধ হচ্ছিল। দেবকুমার সেদিকে তাকাতেই দেবেন হেসে বললো, গত সনের ধান সেদ্ধ হচ্ছে। আপনি খান আজ্ঞে—

তোমরা বসবে না ভাই।

আপনার নারাণ তুষ্ট হোক্ আগে।

খাবার দাবারের বাসনগুলো মেটে রংয়ের কাঁসার। কিন্তু পরিষ্কার। জিনিসপত্তর সব বাড়ির। কুপির আলো পড়ে বেগুন ভাজাটাও দেখলে মন খুশী হয়ে যায়। কণাটা কী বোকা! লোকে এইভাবে কাউকে শাস্তি দেয়!

দেবেনের মাঝবয়সী বউ এটা ওটা এগিয়ে দিল। বুনো কাকরোল ভাজা ফেলে উঠছিল দেবকুমার। দেবেনের বউ ফেলতে দিল না।

খেয়ে দেখুন। আপনাদের শহুরে মুখে নতুন লাগবে—

লাগলোও তাই। অনেক রাত অব্দি কথা হোল দেবেনের সঙ্গে। চারদিকে অন্ধকারের ভেতর বৃষ্টি ভেজা পৃথিবীটা নাদুসনুদুস হয়ে পড়ে আছে। পাশেই গইলে হেলে বলদদের গায়ে গায়ে গাইগরু—বাছুর। তাদের কানের লটপট। নাদ নামলো—থপ করে। এখান থেকে হাইওয়ে, লরি, রেলস্টেশন—সব কত স্বপ্ন মনে হয়। মনে হবে ওসব আদপেই নেই কোথাও। যেন একবার স্বপ্নে দেখেছিল দেবকুমার।

মশা মারতে হোল দেবকুমারকে। চড় মেরে। মশারি টাঙাও না দেবেন?

মশারি কিনি নে আমরা। ঘুমিয়ে পড়ি তো—আপনার কষ্ট হবে খুব।

না না। মশা তো কামড়ায়—

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে হা হা করে উঠলো দেবেন। গাই বলদদের মশারি আছে বাবু? ঘুমিয়ে পড়ি তো টের পাই নে।

জ্বর হয় না?

একবার হয়েছিল। সনকাল মনে নেই। সে আট দশ বছর হবে।

তোমাদের কোন অসুখ করে না বলতে চাও!

তা করবে না কেন। করে। শিউলি পাতা—হ্যানা পাতা ত্যানো পাতা খেয়ে নিই—। চুকে যায়।

তবে লোক মরে কি করে এখানে?

বুড়ো হয়ে গেলে।

দেবকুমার বুঝলো, একে বোঝানো যাবে না। বুড়ো হওয়ার আগেও তো মরে।

ক্বচিৎ কখনো। এই সাপে কামড়ালো তো মরলো। ঝগড়াঝাঁটিতে দায়ের কোপ খেয়ে হয়তো মরলো। কিংবা মনের দুঃখে বিষ খেয়ে যদি আত্মঘাতী হয় তো মরে।

এছাড়া ?

তা ধরেন যদি বাজ পড়ে মাথায় তো মরে।

তাহলে বুড়ো হয়ে কিসে মরে দেবেন ? জানতে গিয়ে নিজের কানেই নিজের অধৈর্য লাগলো দেবকুমারের।

আগের দিনের বুড়োরা ক্ষয়কাশে যেতো। গয়ের তুলে তুলে। হেঁপো বুড়োও থাকতো দু'চারটে। এখন বহুমুত্তুর দেখা দিচ্ছে খুব। সেই সঙ্গে সন্ন্যাস—

অন্ধকারের ভেতর দেবকুমার গা ডলতেই মশার নরম শরীর পাচ্ছিল। তারা গোয়াল থেকে উঠে এসে একসঙ্গে এতখানি কলকাতার রক্ত কোনদিন পায় নি। খেয়ে যেন—দেবকুমারের শরীরেই শুয়ে থাকছিল। সে প্রায় নিষ্ঠুর গলায় জানতে চাইলো, তোমার বুড়ো হতে তো অনেক দেরি।

অনেক। তা ধরুন গো এখনো বিশ পঁচিশ বছর। ষাট পেরোলাম এই ক'বছর মাত্তর।

ছেলে পেলে নেই—এত খাটতে ভাল লাগে তোমার ?

কোথায় খাটি ! নিজের জমিটা কাড়াই। ধান করি। দু'জনে মিলে গোহাল-গাই সামলাই। ধান কাটি। তুলি। ঘর গাঁথি। মাছটা ধরলাম। ওল বসালাম পুকুর ধারে। শীতকালটা দু'জনায় যাত্রা শুনি। ব্যাস ! কোথায় খাটুনী দেখলেন বাবু ?

তা বটে। খুব হালকি দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছো।

ছেলেপিলে না থাকলে কি জীবন হয় না বাবু ? সারা বচ্ছর পৃথিবীটা ওলোটপালোট করি। মানকচু তুলে শীতের রোদে শুকুতে দিই। নারকেল গাছের মাথা চেঁছে দিই। আমার এই বয়সে বাবু—এই নাইকুড়ি গাঁয়ে কত গাছ বড় গাছ হোল—কিছু ঝড়ে গেল—কিছু গাছে ঘড়িদার তক্ষক বসলো—সবই দেখলাম—

অন্ধকার দাওয়ায় চ্যাচারি ঘেরা শুকনো মাটিতে খেজুর পাতার দুপ্রস্থ খোলপে পেতে তবে দেবেনের বউ বিছানা করেছে। সে

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেবকুমার এক সময় চুপ করে গেল। খানিক বাদে দেবেনের নাক জানান দিল—সে ঘুমের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। উঠোনের লাউ মাচায় অন্ধকার পাতায় জোনাকি। আবার বৃষ্টি আসছিল। সেই সঙ্গে কবিতা—

ঘড়িদার তক্ষক স্বয়ং সময়ের বরকন্দাজ
আমারও সংসার ছিল—ছিল কেন! আছে ঘরণী
ঘুমাবাব ঘর আর কিছু বংশধর,
পিতৃপক্ষে তর্পণের তিলোৎসর্গ
মাটির সরায় সাজায়ে দিবার নারকেল নাড়ু
বৃষকাঠ ইলিশেব কোল জীবনেব গভীরে
যাবার গাভিব নবীন বাছুর
যার লোম গুণে গুণে তত লক্ষ বছর আয়ু চাই
চাই স্বর্গলোকে থাকিবার পাকা ছাড়পত্র

এসব আদৌ কোন কবিতা যে নয়—তা আমার চেয়ে ভাল কে আর জানে! কোথায় দাঁড়ি বসাবো? কোথায় ছন্দ কে জানে? আমার ট্রেনিং নেই! কবি পি. মুখার্জীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারলে এসব আলগা ভাবনাকে এতদিনে কবিতা করে ফেলতে পারতাম। এখন আমার অফিস নেই। বাড়ি নেই। বউ নেই। সংসার নেই। দেবেনের মত আমিও যদি পৃথিবীটাকে ওলোটপালোট করায় জড়িয়ে যেতে পারতাম!

আলো ফোটার মুখে ঘুম ভাঙলো। দেবেন এক কাতে অসাড়। দেবকুমার দেবেনের বউয়ের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে বেরিয়ে পড়লো। মাটির রাস্তা। কিন্তু জল নেমে যাওয়ায় তেমন সড়সড়ে নয় এখন। নাইকুড়ি গাঁ পেছনে ফেলে কাল সন্ধের মাটির বাঁধে উঠলো দেবকুমার। আলোর চেহারাটা আবার সেই ঘিয়ে সাদা রংয়ের। গাছের মাথাগুলো এখন বেশ পরিষ্কার। কোন্‌দিকে

এগোলে পিচ রাস্তার পৃথিবী পাওয়া যাবে—দেবকুমার বসু তা বুঝতে পারলো।

এরকম ভোর কতকাল ধরে হচ্ছে। হয়েই আসছে। এই হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মানুষজন এসে ঘর বানালো। গাছ বসালো। গোহালে ধোঁয়া দিল সন্ধেবেলা। পুত্র পিতার মুখাগ্নি করে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

কাল রাতে ঘুম হয় নি দেবকুমারের। কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। একবারও তার শেফালীর কথা মনে এলো না। না এলো রাজুর কথা। সে মনে মনে বলতে গিয়ে শুনতে পেল তার নিজেরই গলা। এই পৃথিবীর ওপর দিয়ে আমি চলে যাবো। হেঁটে হেঁটে পৃথিবীকে দেখবো।

বেশ কিছুকাল হোল—কেউ আর দেবকুমারকে ফিরে ফিরে দেখে না। ফিক ফিক হাসে না দেখে। বসুজ ইটিং লজের জন্যে আমি বুড়ো হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ। আবার বৃষ্টি এলো।

॥ এগারো ॥

পেয়ারার চেয়ে কমলা ফিরি করা অনেক সুবিধের। পুজো চলে গেল এই সেদিন। শীতের শুরুতেই নাগপুরের ফোলা ফোলা কমলার চালান এদিককার ট্রেনে চলে আসে। ট্রেনের জানলায় বসে দেবকুমার পুরুলিয়ার উঁচু নীচু ঢেউ জমির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। লাইনের গায়ে মাঝে মাঝে গ্রাম। পেছনের চারটে মাস তার কেটেছে সিউড়ি দুমকার বর্ডার রাস্তায়—জঙ্গলে। বিক্রির পর ফাঁকা ডালাটা সিটের ওপর রাখা। কামরায় লোক নেই। আদ্রার পর তিনটে স্টেশন কেউ ওঠে নি। এখন কুয়াশা সরে গেলেই রোদ দেখে বোঝা যাবে—ক'টা বাজে। সকাল আটটা সাড়ে আটটা হবে।

এই চার-পাঁচ মাস দেবকুমার ঘোড়ার পাহারাদার ছিল। বীরভূমের রাইসমিলগুলো লেভির চাল দেওয়ার পর বেশ খানিকটা দুমকা দিয়ে বিহারে পাচার করে। কড়া পাহারা। বিশেষ করে স্টেট হাইওয়ে ছাড়িয়ে শাল জঙ্গলে পড়বার পর চোরাচালানীরা [illegible]পদের জায়গাটায় ঘোড়ার পিঠে বস্তা চাপিয়ে দিতো। চার পাঁচটা করে। দেবকুমারকে সেই ঘোড়া নিয়ে বাস রাস্তায় পৌঁছতে হোত। ওদিকে লোক তৈরি থাকতো।

মানুষের মাথা সমান শাল চারার আড়াল ধরে ধরে ঘোড়া পার করানো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল দেবকুমারের। বর্ষা ধরে যেতেই নতুন চাল ওঠা অব্দি ভীষণ অভাব। চালের দামও তখন তুঙ্গে ওঠে। এসব থাকতে থাকতে সে শুনেছে—দেখেছে। নাইকুড়ি

গাঁ থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে চালের চোরাচালানীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। অল্প বয়সী সব ছেলে। রাজুর চেয়ে পাঁচ সাত আট বছরের বড়। দু' চারটে ধাড়ি দাগী যারা পাণ্ডা—তারা দেবকুমারকে কখনো খুড়ো—কখনো দাদু বলে ডাকতো। উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে সিউড়ির বাস গিয়ে দুমকায় পড়ে। দেবকুমার কয়েকবারই ওদের খপ্পর থেকে ছটকে গিয়ে বনে জঙ্গলে—পাহাড়ি ঢালের রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়েছে। আবার গিয়ে ওদের জালে পড়েছে ফিরে। ওরাও কেমন মায়ায় আটকে ফেলেছিল তাকে। বিশ বছরের ছোকরাও তাকে তুই বলে ডাকে। এই বুড়ো শোন্—

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘোড়া পারাপার করাতে গিয়ে অনেক সময় দেবকুমারের গা হাত পা ছড়ে যেত। ওরাই সন্ধের পর শাক পাতার রস লেপে দিতো। দিতো—হেরিকেন-গরম লবণের পুলটিশ। ওদের সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটার সময় আমার পায়ে ঠাণ্ডা উঠে আসতো। পায়ের নীচেই ঠাণ্ডা মাটি। সেই নাইকুড়ির পর জুতো ছেড়েছি। বস্তা পিছু একটা টাকা করে পেয়ে পেয়েও কম পাই নি। দাগীরা মিলে টাকা জমা দিয়ে রিস্কের মাথায় বস্তা বস্তা চাল এনেছে। আমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে হেঁটেছি। কোমরে নোট জমে যাওয়ায় দম আটকে আসছিল। ঘোড়াগুলোও বলিহারি। একদিন একখানা দশ টাকার নোট কখন মাটিতে পড়ে গেছে টের পাই নি। চারা শালের পাতা খেতে খেতে ঘোড়াটা মুখ নামিয়ে নোটখানাও জিভে তুলে নিয়েছে। মুখ থেকে যখন বের করলাম—তখন নোটের আর কিছু নেই।

খড়্গপুর রেল বাজারে কেনা সেই ঢোলকা বুশ শার্ট আর প্যাণ্ট এখন তাকে বেশ মানায়। আসলে ওই প্যাণ্ট শার্ট বোধহয়—রেলের ইঞ্জিন ঘরের লোকজনের। সস্তায় কিনে এনে বাজারে বেচে দিচ্ছিল। সরকারী জামাকাপড় এখন অনেক জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়। কলকাতায় থাকতে—যখন সে ভদ্রলোক গেরস্থ বলে

পরিচিত ছিল—তখন—সে ট্রাম কোম্পানির জামা বিক্রি হতে দেখেছে। তখন যদি কিনে রাখতাম!

ট্রেনের জানলা দিয়ে অদৃশ্য বাতাসের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো দেবকুমার। তখন যে ভদ্দরলোক ছিলাম! ভদ্রলোকদের বড় একটা পৃথিবী দেখা হয় না। দুমকার গায়ে শাল জঙ্গলে কোন কোন দিন ঘোড়ার গা ভিজে থাকতো। তাতে বাতাস লেগে একটা বড় জন্তুর গায়ের গন্ধ ভিজে শালপাতার সঙ্গে মিশে যেত সকালবেলায়। মাটির একটা বাস সব সময় ওপরে উঠতে চায়। সেই সঙ্গে ঘোড়া লেজ নাড়তেই বালাঞ্চি থেকে শিশির ছটকে পড়ে। বনগন্ধে সব গন্ধ মিশে গিয়ে তখন জমাট লাগে। দুনিয়ার সব আলাদা আলাদা জিনিস এক হয়ে যায় খানিকক্ষণ। ঘোড়ার বড় মুখে দু'টি টলটলে চোখ। পিঠে চালের বস্তা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দূরের হাইওয়ে দেখা যায়।

এখন এই এখানে আমি আছি। আমার হাড়ের ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরে গেল। শুকনো দুপুরের মাঠে রোদে জ্বলতে জ্বলতে ছাগল ঘাসের অভাবে ধুলো খেয়ে কেশে ওঠে। সত্তর বছর পরেও তো আমি থাকছি না। তখন কারা এসে এই কামরায় বসবে? পৃথিবীটা তাদের জন্যে তখন কেমন থাকবে। তখন আরেক দঙ্গল মানুষের জন্যে আরেক রকমের পৃথিবী। দুমকা বর্ডারের ঘোড়াগুলো আর থাকবে না। থাকবে না হয়তো দেবেনের ঘরবাড়িও। নাইকুড়িতে কারও ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরে না।

একটা তালের বাজনায় দেবকুমার চমকে উঠলো। কামরায় তো কেউ নেই। উঠে গিয়ে দেখলো—মাঝের কোন্ স্টেশন থেকে ভিখিরীপানা একজন উঠেছে। সারা গা র‍্যাপারে মোড়া। সে-ই দু'খানা ভাঙা চাড়া বাজিয়ে তাল দিচ্ছে—দিতে দিতে গান ধরলো। ফাঁকা কামরায় দেবকুমারের জন্যেই যেন এই গানের ব্যাবস্থা।

ঢেউ তোলা দু'ধারের মাঠ। ট্রেনের চাকার আওয়াজ সেই ঢেউতে উঠে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। দেবকুমার উঠে লোকটার কাছে গেল। খোলা দরজার গায়ে পাটাতনে বসে গাইছিল। মুখ ফিরিয়ে লোকটা তাকাতেই দেবকুমার বাংক ধরে ফেলে নিজেকে সামলালো।

নাক নেই লোকটার। ওপরের ঠোঁট গলে পড়ার দশা। বয়স খুব বেশি তিরিশ। কালো দাড়ি। কুষ্ঠ।

ট্রেন থামতেই নেমে পড়লো দেবকুমার। এই মাটি থেকে রোগ! সেই মাটিরই ভাঙা চাড়া দু'হাতে ঠকাঠকি বাজিয়ে ফাঁকা কামরায় গান গাইতে গাইতে লোকটা চলে গেল। কম। ফিরির ডালাটা নামানো হয় নি তাড়াতাড়িতে।

স্টেশনের নাম অনাড়া। একদিকে অনেক হাঁড়িকুড়ি সরা—মাটির। সেগুলো ঘিরে দু'জন মাঝিন্ জাতের ব্যাপারী দাঁড়ানো। ওদের চোখে দেবকুমার আজকাল নিজের চেহারা দেখতে পায়। রংচটা রেলের শার্ট প্যান্ট। পায়ে মাটি বোঝাই লম্বা নখ। সাদা মাথা। একটু ঝোকা চেহারা। খালি পা।

স্টেশনের বাইরের মাঠটাই ধামা প্যাটার্নের ঢেউ হয়ে উঁচু। এরকম কয়েকটা ঢেউয়ের মাঝখানে সাদা রংয়ের চার্চ। দু'টো কালো গাছ। সবে শীতের শুরু। এখনই একটা পুকুরের গোড়ালি ডোবা জল থেকে ধোঁয়া উঠছে। স্টেশনের নাম—অনাড়া।

শুকনো শুনশান চেহারার প্ল্যাটফর্ম। শেডের বাইরে বেরিয়ে দেবকুমার রোদের আরাম পেল। দু'খানা মাঠ পাশাপাশি উপুড় করা। দুই উপুড়ের জয়েন্টে সাদা চার্চের পা ঢাকা পড়ে গেছে। আজ কি বার? রবিবার না তো। অনেকদিন হয়ে গেল—সে কোন বারের হিসেব রাখে না। জানেও না।

ঢালু মাঠ বেয়ে চার্চের গেটে গিয়ে দাঁড়ালো। পলকা কাঠের ওপর মোটা করে আলকাতরা। লালচে সরু শিকলি পথ গিয়ে

শেষ হয়েছে কাঠের চাঁজা ঢাকা বারান্দায়। গেট থেকেই প্রার্থনা-বেদী দেখতে পেল দেবকুমার। কিন্তু কোন লোক নেই। ভেতরে ঢুকে বারান্দা অব্দি এলো। পেছনের দেওয়ালে অনেকটাই কাঁচ। তার ভেতর দিয়ে সকালের রোদ প্রার্থনা ঘরের মেঝেতে লাল হয়ে পড়েছে।

বাঁ-হাতের ঘরটায় যেন লোকের সাড়া পেল দেবকুমার। ভেতরে ঢুকে দেখলো—একটি সাঁওতাল মেয়ে মন দিয়ে তাকের বই ঝেড়ে পুছে তুলে রাখছে—আর সাঁওতালি সুর গুন গুন করে চলেছে।

দেবকুমার ভেতরে ঢুকতেই মেয়েটি ঘুরে তাকালো। বছর ষোল সতেরো বয়স হবে। বই নিবেন? এখন লাইব্রেরি খুলে নাই।

দেবকুমার দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে বই হাতে নিল একখানা। মেয়েটি যেমন কাজ করছিল—তেমন করতে থাকলো। অনেকদিন কোন খবরের কাগজ পড়ে নি দেবকুমার। বইয়ে হাত দেয় নি। যেন অন্য কোন দেবকুমার এসবে হাত দিতো। তাই আলতো করে টানতেই একটা সবুজ রংয়ের বোর্ড-বাঁধাই বই হাতে উঠে এলো। এঘরেও সকালের রোদ। তাতে বইখানা একদম হেসে উঠলো। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী। একাদশ খণ্ড। চার্চকে পাঠানো প্রকাশকের উপহার।

আনমনে পাতা ওল্টাতেই দেবকুমার দু'হাতে বইটা চেপে ধরে টুলে বসে পড়লো।—দেখা হোল না?

দেবকুমারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই সাঁওতাল মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো। কার সঙ্গে? কেউ আসবেন ইখানে?

দেবকুমার তখন বিড় বিড় করে পড়ে যাচ্ছিল। তার ডান হাতের পৃষ্ঠা ২৯৫-র নীচের দিকে—

২১শে শ্রাবণ (৭।৮।৭৮) সোমবার। পরলোকে শিশু সাহিত্যিক সুকমার দে সরকার। মোটা টাইপে। তারপর লেখা—

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুকুমার দে সরকার সম্প্রতি পুণেতে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। বিশেষ করে বনজঙ্গলের গল্প রচনায় তাঁর সমকক্ষ লেখক খুব কমই দেখা গেছে। এদিক দিয়ে তাঁর নাম শিশুসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

বিড় বিড় করে পড়তে গিয়ে দেবকুমার নিজেই বলে ফেললো, হরিণটার কথা লেখেনি? আশ্চর্য!

কুন্ হরিণটো বাবু?

দেবকুমার আপন মনেই বললো, শুধুই বনজঙ্গলের গল্প! কিচ্ছু জানে না—

ইখানে তো হরিণ আসে না বাবু—

দেবকুমার তখন পড়ে যাচ্ছিল—ছাপা হরফগুলো পারলে সে চোখের মণির ভেতর ভরে রাখে। তাকাতেই যতটা দেখতে পাচ্ছিল—তার সবটাই পড়েও ফেলছিল প্রায়।

তাঁর রচনার একটা বিশেষ ঢং ছিল যা প্রায় অননুকরণীয় বললে ভুল হবে না। বাংলা শিশুসাহিত্যের সমস্ত নামকরা বার্ষিকী ও সাময়িক পত্রেই তিনি লিখতেন: সন্দেশ, রামধনু, মৌচাক, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা পড়বার জন্য ছোটরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কয়েকখানা সুন্দর সুন্দব বইও তিনি লিখে গেছেন। যেমন—তুই খুনী, ২৪শে এপ্রিল, চুপ, জঙ্গলের গল্প ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক ও রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

দেব সাহিত্য কুটীরের কথাটা লেখেনি। আশ্চর্য! বলতে বলতে দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো।

কুথায় যাচ্ছেন বাবু। বইটো আমাদের—

চমকে গিয়ে বইখানা র‍্যাকে রাখলো দেবকুমার। একটা ঠিকানা দেখে নি—

মলাট উল্টে ঠিকানাটা মনে গেঁথে নিল দেবকুমার।

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯
সম্পাদক—অশোককুমার কুণ্ডু।

মনে রাখবার জন্যে নামতা করে পড়তে পড়ভে দেবকুমার অনাড়া চার্চের গেট খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। তার পেছনে বারান্দায় তখনো সেই সাঁওতাল মেয়েটি। বইখানা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে ধামা ওলটানো পরেপর মাঠগুলো পার হচ্ছিল দেবকুমার। সুকুমার দে সরকার আদৌ জানতেন না—তার পরে দেবকুমার বসু নামে একটা লোক এসে বই হাটকে তাঁরই বিয়োগপঞ্জী পড়বে। পৃথিবীতে পরে কারা আসবে—তা তো আগাম জানা যায় না। তাদের কোলাহলের ধ্বনি কী দাঁড়াবে—তাও জানা যায় না। তাদের ক্ষোভ থেকে ধোঁয়া উঠবে কিনা—আনন্দ থেকে ফেনা উথলে পড়বে কি না—তাও তো আগাম জানার উপায় নেই। অতীতকে টুকরো টুকরো অবস্থা থেকে কুড়িয়ে এনে ঠিকমত জড়ো করতে পারলে পুরো ছবিটা পাওয়া যায়। কিন্তু আগাম কথা কে বলতে পারে। সূর্যের আজকের পাঠানো আলোই শুধু পরশুর আগাম জীবনে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এই পৃথিবীর অনন্ত ইতিহাসে একটি নিরুদ্দেশ বর্ষার কথা কে মনে রাখে! তাই শাল জঙ্গলে টেবিল পেতে বসতে না বসতে খোলা আকাশের নীচে ডক্টর কাবাসি মুছে যায়। শুধু এক একদিনের আকাশের আলোয় দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতার আলো মিশে থাকে। মিশে থেকে কী যেন মনে করিয়ে দিতে চায়। সেটা কী যেন। যেখানে হয়তো আমি ছিলাম। আর যাওয়া হবে না। রাস্তাটা আলোর মধ্যে মুছে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না। যেমন কিনা মেডিকাল কলেজের হাতায় কলমের আমগাছটা

সেই হরিণটা সমেত একদম লোপাট হয়ে গেল।

বোম্বাই থেকে খুব সাজানো গোছানো ট্রেন ডেকান কুইনে দেবকুমার যখন পুণে এসে নামলো তখন যেন শীতই লাগছিল। অথচ বোম্বাইয়ে না শীত, না গরম। বম্বে মেলে সে উঠে পড়েছিল সন্ধ্যে রাতে। লাইন না পেয়ে গাড়িটা তখন খন্ডান স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিন ক্রমাগত ফুঁসে যাচ্ছিল। শীতের শুরুতে ইঞ্জিনের পাশের কামরা ভালোই লাগে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে নাগপুর পার হয়েছে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মাথায়। তখনো বোম্বাই পাঁচশো মাইল। একবার নাসিকের কালো আঙুর কিনেছিল তিনশো। কামরার জানলায় বসে। ঘোড়পাড়ে স্টেশনে। তারপর তো ছায়াভরা জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে ট্রেনটা ছুটলো। দু'ধারে সম্ভবত কি একটা আধপাকা ফসল—দু'ধারের মাঠ জুড়ে। খানা স্টেশনে ঢুকতে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে মাইল দেড়েকের একটা টানেল। তখন পরের দিনের সকাল।

পুণে শহরে গাড়ি ঘোড়া—ঘরদোর একটু অন্য রকম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি। বাড়ি সাজাবার বেঁটে বেঁটে সাবু গাছ। একটা রাস্তার নাম ইংরিজিতে লেখা—বীর সাভারকার মার্গ। রাস্তায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি তেজি। তার রংচটা রেলের উর্দি ঢাকা শরীরের একদম টপে মাথায় নিশ্চয় সাদা চুল। নয়তো সে এতক্ষণে পথ-চলতি মানুষের তাকাবার কারণ হয়ে উঠতো। শহরটা পুরনো। বাড়িগুলোও পুরনো—কিন্তু বিশাল। সব সময় মনে হচ্ছিল বাতাসের ভেতর নিশ্চয় কোথাও পতাকা উড়ছে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখুনি একটা মিছিল বেরোবে। আর অমনি চারদিকের বাতাসের ফোঁটা বুদ্বুদ হয়ে ক্রমাগত আলো দিতে দিতে ফেটে পড়তে থাকবে।

সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় দেবকুমার হাঁটতে হাঁটতে আন্দাজে রাতের

আশ্রয় পেয়ে গেল। দেউড়ি দেওয়া বিরাট ধর্মশালা। গায়ের চাদর সমেত বিছানা পাঁচ সিকে। তিনদিনের দিন সন্ধেবেলা ঘর ছেড়ে দিতেই হবে। ধর্মশালার খাবার ফ্রি। দিনে দু'বার। বড় হলঘরে গিয়ে বসতে হয় তখন। নয়তো ইচ্ছে হলে রেঁধে খেতে পারা যায়। রান্নার ব্যবস্থা আছে। কাছেই নাকি বাজার। যাকেই জিজ্ঞাসা করে দেবকুমার—তারই পায়ে মোটা চামড়ার নাগরা।

বারোয়ারি অড়হড় পুরী খেয়ে শুতে যাবার পথে একটা ঘরের দরজা খোলা দেখে উঁকি দিল দেবকুমার। জনা তিনেক বাঙালী মন দিয়ে জুয়া খেলছে। দেবকুমার গলা বাড়িয়ে বললো, একটু ভেতরে আসতে পারি—

তারা তাড়াতাড়ি তাস—টাকা পয়সা সরিয়ে ফেললো চাদরের নীচে। কি ব্যাপার—

এক নিঃশ্বাসে দেবকুমার সব বলে জানতে চাইলো, কি ভাবে যে খুঁজে বের করবো বাড়িটা—তাও তো জানি নে। মিস্টার দে সরকার মারাও গেছেন তা প্রায় দেড় বছর।

ওদের একজন বললো, কালই সকালে করপোরেশন অফিসে চলে যান। টাঙ্গা নেবেন। খুঁজতে খুঁজতে যাবেন। আর মাঝে মাঝে বলবেন—পুঢ়ে চল্—পুঢ়ে চল্—

সেটা কি?

মানে—আগে চলো আগে চলো। পুণেতে এই প্রথম নিশ্চয় আপনি—

হু! বলে দেবকুমার চলে এলো। কলকাতা থেকে এতটা পথ এসে স্রেফ জুয়া খেলে কি করে লোক! এসব মন খারাপ কথা তাকে বেশিক্ষণ ভাবতে হোল না। ঘুম ওৎ পেতেই ছিল।

পুঢ়ে চল্ কথাটা পরদিন সকালে কাজে লেগেছিল খুব। দেবকুমার হাতড়াতে হাতড়াতে করপোরেশন অফিসে এসে হাজির

হোল। শ্মশান থেকে গোরস্তান থেকে দাহ কবরের খতিয়ান যে ডিপার্টমেণ্টে এসে জমা হয়—তাদের কোন লোককেই ইংরিজি বা হিন্দিতে কিছু বোঝাতে পারলো না দেবকুমার। কয়েকবারই বললো, সুকুমার দে সরকার। নাইন্টিন সেভেনটি এইট। ডিপার্টমেন্ট থেকে কতকগুলো ধুলোমাখা মেমো বইয়ের কাটা পাতা ধরিয়ে দিলো তাকে। ছেঁড়া ছেঁড়া পাতায় সব মরা লোকের নাম। সিল। ঘাটবাবুদের দস্তখৎ। এতদূর এসে ফিরে যাবো? এসেছিলাম—ঠিকানাটা জানতে। শেষ সময়ে কোন্ বাড়িতে ছিলেন—কারা কারা কাছাকাছি ছিল—তাদের সঙ্গে খুঁজে খুঁজে দেখা করতাম—টুকরো টুকরো কথা জোড়া দিয়ে সুকুমার দে সরকারের কথা জানতাম। জানতে জানতে সেই ঘিয়ে সাদা রংটা ফস্ করে বেরিয়ে পড়তো।

গলাবন্ধ কোট্—চাপা পাজামা—মাথায় লেজঝোলা উল্টো বাটির টুপি যে লোকটি একটি কালো টেবিল আলো করে বসেছিল—সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে টাঙ্গাওয়ালাকে কি যেন বললো। তার ভেতর একটা কথা দেবকুমারের কানে গেল। পুরানো রেসিডেন্সি—

টাঙ্গাওয়ালা দেবকুমারকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো। শহরের খানিক জায়গা দেবকুমারের বহরমপুর বহরমপুর লাগলো। খানিক জায়গা বর্ধমানের শ্যামসায়র এলাকা। খানিকটা আবার বালেশ্বরের ফকিরচাঁদ কলেজ পাড়ার ধাঁচে। এক সময় পুণে শহর ফুরিয়ে গিয়ে এক্কা পাথুরে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। এদিকটায় মোটরগাড়ি আসে না। দোকানপাট নেই। এক সময় ঘোড়া থামিয়ে টাঙ্গাওয়ালা পাথরের রাস্তায় নেমে পড়লো। এ লাও তুমহারা পুরানা রেসিডেন্সি।

কথা না বলে দেবকুমারও পথে নামলো। কাছাকাছি নদী থাকতে পারে। একটা দিক ফাঁকা সাদা। আরেক দিক ধরে সারি কাঠের বাড়ি। কাঠের শিরতোলা দাগ দেওয়ালে। কোথাও

কোন লোক নেই। একটা বাড়ি দেখিয়ে দেবকুমারকে টাঙ্গাওয়ালা বললো—ওহি কোঠি—

লোকটিকে দেবকুমার সঙ্গে নিতে চাইলো। সে মাথা নেড়ে বললো, যাবে না।

পাথরের রাস্তায় শুধু তার নিজেরই জুতোর আওয়াজ। নদীর কাছাকাছি যে সব গাছ থাকে—তাদেরই আড়াল বাড়িগুলোর পেছনে সেই আড়ালের পিছনেই সম্ভবত নদীর পাড়ি। দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

টাঙ্গাওয়ালার দেখানো বাড়িতে দেবকুমার ঢুকলো। ঢুকে বুঝলো, সে ঠিক জায়গা মতই এসেছে। একটা খোলা হরিণ কম্পাউণ্ডে চরে বেড়াচ্ছিল। তাকে দেখে একটু কেঁপে গেল দেবকুমার। হরিণটা কিন্তু তাকালো না। অনেক পুরনো পাথুরে মাটির গায়ে পৃথিবীর লোম—এই খোঁচা খোঁচা ঘাসগুলোর বয়স যে কত তার ঠিক নেই। হরিণটা যে কী খুঁটে খাচ্ছে কে জানে!

কাঠের বারান্দায় ঢুকে দেবকুমার একতলার হলঘরে তাকালো। কোন লোক নেই। ভীষণ পুরনো কায়দার একখানা পালঙ্ক ফাঁকা পড়ে আছে। আশপাশের বাড়ির জানলা দরজাতেও কোন লোকজনের চিহ্ন মাত্র নেই। খালি পায়ে তার একটু শীত শীতই লাগলো। আশপাশের গাছের শুকনো পাতা বাতাসে ভেসে কাঠের মেঝেতে এসে পড়েছে। এখন বাতাসে সে সব পাতা খরখর শব্দ তুলে মেঝেময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতঘড়ি দেখলো দেবকুমার। বেলা বারোটাও বাজে নি।

কলকাতা থেকে এতদূরে এসেছিলেন কেন? সুকুমার দে সরকার তো নিজের চিকিৎসা কলকাতাতেও করাতে পারতেন। তাহলে কি এই আশেপাশের জঙ্গলের সঙ্গে দে সরকার মশায়ের কোন যোগ ছিল? বাইরে ওই হরিণটা কি জঙ্গলের? বাড়িতে তো কোথাও কোন ইলেকট্রিক লাইন দেখছি না।

বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার। বাইরে পুরো বেলার রোদে পাথুরে-পথ—গাছপালা ঝকঝক করছে। এ বাড়িতে কি কেউ নেই? আশেপাশে কেউ নেই? যার কাছ থেকে দে সরকার মশায়ের কথা—শেষ দিককার কথা—কিছু জানা যেতো। শোনা যেতো। বাইরের ওই হরিণটাই কি সেই হরিণ?

গত কয়েকদিন ধরে যে কথাগুলো নামতা করে গুণগুণ করে চলেছে মনে—সেগুলোই আওড়াতে আওড়াতে দেবকুমার বসু একতলার হলঘরের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী। সম্পাদক অশোক কুণ্ডু। পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৭০০০০৯।

বিড় বিড় করতে করতেই এগোচ্ছিল দেবকুমার। কলিকাতা সাত লক্ষ নয়। সাত লক্ষ নয়। ঠিক এই সময় সে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে একখানা অয়েল পেন্টিং পেল। কাঠের প্যানেল দেওয়ালে লটকানো—যেন অনেককাল ধরে। যেটুকু আলো আসছিল ঘরে, তাতেই ছবির কাছাকাছি চোখ নিয়ে অবাক হোল দেবকুমার। সুকুমার দে সরকার তো কোনদিন মাথায় পাগড়ি বাঁধেন নি—গোঁফটাও তো কমাণ্ডার নয় এখানে। আর চোখের চশমার ডাঁটি এত ফিনফিনে কেন?

কি সন্দেহ হোতে বাইরে বেরিয়ে এলো দেবকুমার। কাঠের গেটের দু'ধারে খোদাই করে লেখা নাম। ডান হাতে মারাঠিতে। পড়তে পারলো না দেবকুমার। তাতে ধুলো জমে গেছে। হয়তো রিটায়ার করে সুকুমারবাবু এখানে এসে এই কাঠের বাড়ি কিনেছিলেন।—বনজঙ্গলের পাশেই থাকবেন বলে।

গেটের বাঁ-হাতের স্তম্ভের খোদাই জায়গাটার ধুলো সরাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল দেবকুমারের কাছে। এ তো অন্য নাম! পরিষ্কার ইংরিজি হরফে লেখা—সয়ারাম দেউসকর। তাই বলো! এ তো অন্য লোকের নাম। কোথাও কোন একটা বড় ভুল হয়ে আছে।

টাঙ্গাওয়ালাকে সে কথা বলে লাভ নেই কোন। ফিরতি পথে দেবকুমার দু'টো নাম ওলোট পালোট করে মনে মনে বদলাবদলি করতে লাগলো—

সুকুমার দে সরকার
সয়ারাম দেউসকর
সুকুমার দে সরকার
সয়ারাম দেউসকর

আশ্চর্য! বিড় বিড় করলে দু'টো নামই এক রকম শোনায়। বুঝলো, করপোরেশন অফিসে গিয়ে ঘাট খাতা হাটকে আর কোন লাভ নেই। ছেঁড়া কোন্ পাতায় যে তিনি মরে পড়ে আছেন—তা ধুলো ঝেড়ে জানা এখন খুব কঠিন। শহর পুণের এক কালের রেসিডেন্সি সারা এলাকা নিয়ে কতকাল হয়তো মরে পড়ে আছে। কোন ভুল হয় নি তো? সুকুমার দে সরকার ক্যানসার নিয়ে এতদূরে কেন মরতে আসবেন! এটা সয়ারাম দেউনকরের কেস নয়তো। কলিকাতা সাত লক্ষ নয়। সাত লক্ষ নয়। অশোক কুণ্ডু। কুণ্ডু অশোক। সাত লক্ষ নয়—

এখনো ডিসেম্বরের দুপুরে কলকাতায় পেচ গলে যে চিটে গুড়ের দশা হয়—তা দেখতে পেয়ে দেবকুমার বড় রীতিমত অস্বস্তি বোধ করলো। অনেকদিন পরে আবার কলকাতায়। এখানে পুরনো রেসিডেন্সির মত কোন জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে না। এক শুধু পার্ক সার্কাসের পুরনো কবরখানা। তা সেখানে তো সারি সারি কাঠের বাড়ি পড়ে নেই।

কলিকাতা সাত লক্ষ নয়ে পুস্তক বিপণিতে যখন পৌছলো দেবকুমার—তখন বেলা তিনটে হবে। তখনই আলোতে বিকেল ঢুকে পড়ছিল। সে তার সুকুমার দে সরকার সন্ধান ব্রতে তখনো

কায়মনবাক্যে একাগ্র। শুধু এই সন্ধানটুকুর জন্যেই সে এত পথ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ভাবে তার পৃথিবী দেখা হয়ে যাচ্ছিল। সেই নাইকুড়ি গাঁয়ের ভোরবেলা থেকে। এর মধ্যে আর ডক্টর কাবাসির সঙ্গে তার দেখা হয় নি। দেখা হয় নি—পুরু কাজলের বর্ডারে ভাসা দুই কালো টল মার্বেলের সঙ্গে।

পুস্তক বিপণির কাউন্টারের লোকটি এমন খদ্দের কখনো দেখে নি। বেনিয়াটোলা লেনে তখন দুধারের বাড়িগুলো শীতের ছায়া ছড়িয়ে বসে আছে। গায়ে রংচটা ঢোলকা বুশ শার্ট। সেই সঙ্গে ঢোলকা প্যান্ট। মাথাটা সাদা। খালি পা ভর্তি ধুলো।

কি বই ?

বই নয়। অশোক কুণ্ডু আছেন ?

তিনি তো সেই পরশু সন্ধেবেলা আসবেন—

একটু দেখা হয় না এখন ? অল্পক্ষণের জন্যে—

অশোকবাবু তো এখন আসেন না। ওই তো তার জন্যে প্রুফ পড়ে আছে।

এবার দেবকুমার একটু কড়া হোল। দেখুন—আপনাদের সাহিত্যকোষে পাতায় পাতায় ভুল।

সে আপনি অশোকবাবুকে জানান। উনিই সব দেখেন—

আপনারাই তো প্রকাশক। আপনাদের একটা দায়িত্ব আছে।

লোকটির এরকম খদ্দের সামলানোর অভ্যেস নেই। আপনি দেখা করতে চান ?

দেবকুমার মাথা নেড়ে বোঝালো, হ্যাঁ। আরও অনেক কথাই তার মাথার ভেতর বুজ বুজ করে ভেসে উঠছিল। বলতে পারতো—তবে এত পথ ঠেলে এলেন কেন ?

লোকটি আবার বললো, তাহলে ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। আপনি গিয়ে দেখা করেও বলতে পারেন। এসব কোষগ্রন্থ তো সবসময় কারেকশন হয়। বলতে বলতে ডাইরির পাতা

ওল্টাচ্ছিলো। এক জায়গায় থেমে বললো, পেইচি।

ছোট্ট একটা মেমো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দেবকুমারের হাতে দিল। বাগবাজারের বাটা থেকে সিধে গঙ্গার ঘাটে চলে যাবেন। পরপর ব্যারাকবাড়ি। আগে বোধহয় কাগজ কল ছিল জায়গাটায়। সে সব বাড়িই হবে—এখন লোক থাকে—কাশীপুর ব্রিজ পেরিয়ে—

দেবকুমার ট্রামলাইনে এসে কাগজখানা দেখলো। ১।১ই।২, রামকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ লেন এক্সটেনশন। এই কলকাতায় যে তার বউ, ছেলে—মেয়ে জামাই, বন্ধু বান্ধব থাকে—একবারের জন্যেও তা মনে পড়লো না।

শহরতলীতে শীত আগে আসে। তাড়াতাড়ি হিম পড়ে যায়। নদী থাকলে তো কথাই নেই। খুব সহজে সূর্য ডুবে যায় তাতে। তারপর তো অন্ধকার ঠাসা শীত। চাপ চাপ শীত। একটু গ্যাপ দিয়ে চাঁদ উঠে পড়ে আকাশে। কৃষ্ণপক্ষে সে বালাই নেই।

কাশীপুর ব্রিজ পেরোতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল দেবকুমারের। ছাপাখানা, গ্যারেজ, কাগজ কাটাই কল, সিমেণ্টের গোডাউন পেরিয়ে ঠিকানার জায়গায় যখন ঢুকলো—তখন আর সেখানে কলকাতা নেই। গঙ্গা। গাদার গায়ে বটতলা। সারি সারি গোডাউন। মাঠ। পরেপর কয়েকটা ব্যারাকবাড়ি। রেলের বাতিল সিকিল লাইন ঘাসে বুজে আছে।

একটা বাড়ির সদরে অশোক কুণ্ডুর নাম বলতেই অনেকগুলো স্কুলপড়ুয়া পড়া থামিয়ে কমপিটিশনে নেমে পড়লো। কে তাকে নিয়ে অশোক কুণ্ডুর কাছে যাবে—তাই নিয়ে প্রায় মারামারি। কোন ঘরেই ইলেকট্রিক নেই। হেরিকেন। বাড়ি নয়—আসলে গোডাউন। আগে মাল থাকতো। এখন মানুষ থাকে।

একটি বাচ্চা ছেলে দেবকুমারকে অনেক ঘুরিয়ে একখানা হা-হা খোলা অন্ধকার দরজায় দাঁড় করিয়ে স্পীডে ভেতরে চলে গেল।

বাচ্চা ছেলেটির অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে পড়া—আবার সে

বাড়ির ভেতর থেকে তাকে দেখতে অনেকের বেরিয়ে আসায় দেবকুমার বুঝলো—এখানে সবাই গুড্ নিউজের জন্যে ওয়েট করে। খুব আশা—কোন একটা ভাল খবর আসবে। আসছে। খবরটা নিজের বাড়ি থেকে এদিকে রওনা হয়ে পড়েছে। আর বিশেষ দেরি নেই। এলো বলে

ভেতর থেকে লণ্ঠন হাতে যে বেরিয়ে এলো—তার মাথা সাদা—ভ্রু সাদা। খালি গা। বুকের লোমগুলো সাদা। গালে তিন চারদিনের বাসি সাদা দাড়ি ভুলভুল করছে। পরনে লুঙি করে পরা ধুতি। লণ্ঠনের শিখাটা গঙ্গার ঠাণ্ডা ফিনফিনে বাতাসে নিভে যেতে চাচ্ছিল। চিমনির গা বেয়ে নিভতে চাচ্ছিল। সেদিকে হাত রাখলো লোকটি। শিখাটা সিধে হয়ে গেল। দেবকুমার দেখলো, সে হাতখানার লোমগুলোতেও পাক ধরেছে। অথচ খালি গা-খানা বেশি বয়সের নয়! একটু ঝোকা মত।

আপনি অশোকবাবু? অশোক কুণ্ডু?

হুঁ কেন বলুন তো?

আমি ওই আপনার সাহিত্যকোষের ব্যাপারে এসেছিলাম—

কোত্থেকে? ভেতরে আসুন।

ভেতরে গিয়ে একটা লম্বা উঁচু সিলিংয়ের ঘরে পুরনো কেদারায় বসলো দেবকুমার। গুদামঘরই হবে। এখন লোক থাকে। গঙ্গার দিকে জানলার বদলে বড় বড় ফাঁকা। তাতে কোন শিক নেই।

আমি কোথাও থেকে আসি নি আসলে—

অনেকগুলো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গোলমাল করছিল।

এই চুপ কর না তোরা—ধমকে উঠে লোকটি পাশের বারান্দায় কাকে ডাকলো। ওদের নিয়ে যাও না গো—একটু কথা বলবো।

একজন ভাঙাচোরা মহিলা এসে বাচ্চাগুলোকে আলুর বস্তা করে ভাঙা মেঝের ওপর দিয়ে এক রকম ছেঁচড়ে বাইরের বারান্দায় নিয়ে গেল।

হ্যাঁ, বলুন। কি বলছিলেন। আমি শুনতে পাই নি আগের বার। সারাদিন সাহিত্যকোষ, বিশ্বকোষ, ডিকসনারি লেখা নিয়ে পড়ে থাকি তো। কি বলছিলেন যেন—

কোথাও থেকে আসি নি আমি আসলে।

তার মানে ?

আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একা। ঘুরে বেড়াই। বই দেখি। দৃশ্য দেখি।

কি দৃশ্য ?

এই গাছগালা। ট্রেনলাইন। নদী। মানুষজন বলতে পারেন—

ও।

তা আপনার সাহিত্যকোষে একটা ভুল দেখলাম—

আমার সাহিত্যকোষ নয়। প্রকাশকের। কি ভুল ?

ওই হোল। আপনার এডিট করা। লিখেছেন—সুকুমার দে সরকার মারা গেছেন—

ভুলটা কোথায় ?

উনি সুকুমার দে সরকার নন।

তবে কে ? আমি তো সব যোগাযোগ রাখতে পারি না। খবরের কাগজের কাটিং করে রাখি তো সারা বছর। অল ইণ্ডিয়ার সব কাগজ আমায় পাঠিয়ে দেয় পাবলিশার—

হয়তো ছাপার ভুল হয়ে থাকবে। মানে ভুল ছাপে তো অনেক সময় কাগজে।

কে মারা গেছেন তাহলে ?

সয়ারাম দেউসকর। দুটো নামের প্রোনানসিয়েশন তো একই রকমের।

হতে পারে। তা সুকুমার দে সরকার কি আপনার আত্মীয় ?

কোন রক্তের সম্পর্ক নেই।

জ্ঞাতি সম্পর্কের ?

তা বলতে পারেন। ওঁর লেখা আমি প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকে পড়ে আসছি। ছোটদের জন্যে লিখতেন। বড়দের লেখা। তবে আজকাল তো আর লেখা দেখি না।

তাহলে হয়তো সত্যিই মরে গেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে শীগ্‌গিরি ?

না। কোনদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি আমার। প্রায় চল্লিশ একচল্লিশ বছর আগে দেব সাহিত্য কুটীরের পুজো বার্ষিকীতে প্রথম পড়ি ওঁর লেখা—

আপনার বয়স কত ?

দেবকুমার বললো, ফর্টিসেভেন ক্রস করবো।

অশোক কুণ্ডু হো হো করে হেসে উঠলো। আপনারও দেখছি আমার রোগে ধরেছে। আমার ছত্রিশ। লোকে বাইরে থেকে বলে তেষট্টি।

ছত্রিশ ?

হ্যাঁ। একদিনও বেশি নয়। খুব অল্প বয়সে জেদ করে বি করেছিলাম। সংসার ছোট করতে জানতুম না। দেখুন তো কেম নগর বসিয়ে বসে আছি এই ব্যারাকবাড়িতে।

দেবকুমার চারদিকের হাঁড়িকুড়ি লেপ-তোশক দেখে চুপ করে থাকলো।

একুশে বিয়ে করেছি। তারপর এই পনেরোটা বছর মাথা গুঁজে সাহিত্যকোষ, বিশ্বকোষের পোকা বাছছি দিনরাত। সংসারটা চালাতে হবে তো। কেমন কিনা! বলুন ?

এবারও বলার কিছু না পেয়ে চুপ করে থাকলো দেবকুমার শুধু মনে মনে বললো, আমার সংসার তো কোনদিনই বড় ছিল না তাহলে ? দেবকুমার বললো, আপনি সয়ারাম দেউসকরের স সুকুমার দে সরকারকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

হবে হয়তো—বলেই অশোক কুণ্ডু চুপ করে গেল। দেবকুমা

লণ্ঠনের আলোয় চৌকির ওপর বসা অশোক কুণ্ডুকে দেখছিল। ব্যারাকবাড়ির সব জায়গায় আলো পৌঁছায় নি। ছত্রিশেই একটি ভাঙাচোরা শরীরে তেষট্টি এসে বাসা বেঁধেছে। সংসারের চাপ—টাকা আয়ের ধান্দা, বাতাসে পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া, রেশনের ভেজাল বোঝাই ডাল—মানুষকে ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। যারা নিয়ম করে ভালো খায়—বেড়ায়—উদ্বিগ্ন হয় না—তাদের কি চামড়া কোঁচকায় না? এবার তো বর্ষার সময় বর্ষা এসেছে। আগাম হিম পড়ে যাওয়ার কোন চান্স নেই।

অশোক কুণ্ডু বললো, তবু আপনি একবার খোঁজ নিন তো। যদি সত্যিই সুকুমার দে সরকার বেঁচে থাকেন তো—সেকেণ্ড এডিশনে বিয়োগপঞ্জী শুধরে দিতে হবে। এই বয়সে চিত্রগুপ্তের কাজ কার ভালো লাগে বলুন!

কোথায় খুঁজবো?

কেন? যেখানে যেখানে তিনি লিখতেন। আপনি তো জানেন—কোথায় কোথায় তাঁর লেখা পড়েছেন।

কথা আর বেশি এগোচ্ছিল না। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—অন্ধকার নদীর বুকে একটা গাধাবোট টেনে টেনে স্টীমার যাচ্ছে। স্টীমারে বেশি আলো। গাধাবোটে অল্প। হরিণসুদ্ধ সুকুমার দে সরকারের আদলে মেডিকাল কলেজের হাতায় কলমের আমগাছ তলায় যে-লোকটিকে সে শেষ দেখেছিল—সে তো ডক্টর কাবাসির ডিরেকশনে চরস সেজে দিচ্ছিল। তারপর সব ভোঁ ভাঁ। একবার শুধু ডক্টর কাবাসি শাল জঙ্গলে টেবিল পেতে হেসে হেসে তাকে ডেকেছিল। ব্যস্। আর কোন চিহ্ন নেই। পুণের পুরনো রেসিডেন্সিতে পাথুরে রাস্তায় খালি মহল্লা। নদীর আভাস। কিন্তু জল দেখা যায় না। নাইমুড়ি গাঁয়ের ভোর রাতের আকাশে ঘিয়ে সাদা রং। তারপর? তারপর? সয়ারাম দেউসকরের কম্পাউণ্ডে সাতেও নেই—পাঁচেও নেই—এইভাবে হরিণটা ঘাস খুঁটে ফিরছিল।

তারপর ? তারপর ? শেষে কি এইভাবেই সুকুমার দে সরকারের সন্ধান এখানে এই গঙ্গার তীরে ব্যারাকবাড়ির সন্ধেরাতে শেষ হয়ে যাবে ? এখানেই বন্ধ দরজা ? আর কোন শুলুক সন্ধান নেই !

দেখি। খুঁজে দেখি। বলে দেবকুমার সেদিনকার মত উঠলো। অশোকবাবু, কিছু জানতে পারলে—আমি কিন্তু আবার আসবো।

সেদিন রাতে দেবকুমার বসু একদম কানা গরু হয়ে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশি রাতে পাড়ার মোড়ে শুধু পানের দোকানটা জেগে। বসুজ ইটিং লজের বারান্দায় আলো জ্বলছে। আর জ্বলছে—এক নম্বর বোর্ডারের ঘরে আলো। এখন নিশ্চয় সেখানে দু'নম্বর বোর্ডার শুয়ে আছে। বেশি রাতে খবরের কাগজ পড়তে বসে ঘুমিয়েও পড়তে পারে শেফালী। তিন নম্বর বোর্ডার হয়তো এক নম্বরের টেবিলে বসে নিঃশব্দে দাবার চাল দিচ্ছে।

পাছে কাউকে চেনা দিতে হয়—পাড়ায় তো সবাই তাকে চিনতো—তাই দেবকুমার পাতাল রেলের ক্রেনের ছায়ার নীচে চলে গেল। রাতের শিফ্‌টের লরীগুলো একে একে এসে দাঁড়াচ্ছে। মাটি নিয়ে যাবে এবারে।

পরদিন অফিস টাইমে ঝামাপুকুর লেনে গিয়ে দেব সাহিত্য কুটীরের অফিসে হাজির হোল দেবকুমার। পুরনো আমলের বাড়ি। কিন্তু পরিষ্কার। দোতলা অফিস বাড়ির একতলায় লম্বা সোফায় এক অন্ধ ভদ্রলোক বসে। লোক জন আসছে। যাচ্ছে। অন্ধ ভদ্রলোক একসময় বললেন, কে ভাই ?

আমি একটা জিনিস জানতে এসেছি।

কোত্থেকে আসছেন ?

কোথাও থেকে নয়। আমি আপনাদের পুজো বার্ষিকী ছোটবেলায় পড়েছি। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

কি ব্যাপার বলুন তো ?

আমি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবো।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ডাকলেন—কেদার। ও কেদার। এই ভদ্রলোককে বড় কাকার কাছে নিয়ে যাও।

সম্পাদক কে আপনাদের ?

আমাদের বড় কাকা—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। কি দরকার বললে—হয়তো আমিও বলতে পারতাম—

আপনি ?

পাশে বসা একজন লোক অন্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটর সারাইয়ের বিল নিয়ে কথা বলছিলেন। আর অন্ধ ভদ্রলোক প্রায়ই বলছিলেন—শীতলদা, থার্ড গিয়ারটা একটু দেখে দেবেন।

সেই শীতলদা লোকটি অন্ধ ভদ্রলোককে চোখ দিয়ে দেখিয়ে বললেন—ইনিই শ্রীমধুসূদন মজুমদার। সহকারী সম্পাদক। দৃষ্টিহীন নাম দিয়ে লিখে থাকেন। এঁকেও বলতে পারেন আপনার কথা।

অন্ধ ভদ্রলোক বললেন, বলুন না। আমাকেও বলতে পারেন। বড় কাকা এখনো হয়তো নীচে নামেন নি। আপনার নাম ?

আমি আপনাদের একজন পাঠক মাত্র। আমার নাম দেবকুমার বসু। একটু বিপদে পড়েই এসেছি আপনার কাছে।

বলুন ভাই।

আপনাদের পুজো বার্ষিকীর ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতায়—

আগে খুব ভালো কাগজ পাওয়া যেতো। এখনো আমরা সেরা ম্যাপলিথো কাগজে ছাপি। ছোটদের ভালবাসার জিনিস তো।

আপনারা বনজঙ্গলের কহিনী ছাপতেন। হরিণ শিশু। নেকড়ে মা। একজন লেখক ছিলেন—সুকুমার দে সরকার—

হ্যাঁ। হ্যাঁ। বড় ভাল লিখতেন।

তাঁর লেখা অনেককাল দেখি না।

তিনিও অনেককাল লেখা পাঠান না।

তিনি কি বেঁচে আছেন? বলতে পারেন?

তা তো বলতে পারবো না ভাই।

তিনি কি মারা গেছেন?

তাও তো জানি নে।

তবে তিনি কোথায়? আমার বড্ড দরকার তাঁকে—

কোথায় থাকতে পারেন—তা আমি জানি না। আমার এই ষাট হতে চললো। আমিও ছোটবেলায় ওঁর লেখা পড়েছি। কোথায় সব মিলিয়ে গেলেন। সত্তর বছরের ওপর আমাদের এই পুজো বার্ষিকী বেরুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও এডিট করেছেন একবার। শরৎচন্দ্রও লিখেছেন। সবাই লিখেছেন। কত পাঠক এলেন। কত লেখক এলেন। গোড়ায় গোড়ায় যাঁরা বালক বয়সে এই ঘিয়ে সাদা রংয়ের পাতায় সুন্দর ছবি সমেত লেখাগুলো পড়েছেন—তাঁরাও তো বুড়ো হয়ে একদিন মরে হেজে গেলেন—এই তো নিয়ম ভাই—!

আপনি ঘিয়ে সাদা রং দেখতে পেলেন কি করে?

অন্ধ বলে তো! আমিও দেখতে পাই। চোখ বুজলেই দেখতে পাই। আমিও তো আপনাদের পৃথিবীর মানুষজন, রং, গাছপালা—জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর দেখেছি। অন্ধ হয়ে তো জন্মাই নি ভাই। সেই স্মৃতি অন্ধ হওয়ার পর আমার একার জগতে ধীরে ধীরে আরও ধারালো হয়েছে। বড় রাস্তায় ট্রামের ঘন্টি শুনলে বুঝতে পারি—ক'টা বাজলো। বেলা তিনটের শীতের বিকেলে বাতাসে সে-ঘন্টা একরকম বাজে। আবার ফাল্গুন মাসের দখিনা বাতাসে সন্ধেবেলা সে ঘন্টার আওয়াজ আরেক রকমের। বসুন না ভাই। চা খাবেন?

বসছি। চা খাবো না। তাহলে কি সুকুমার দে সরকারের কোন খবর পাবো না?

কারুর ঠিকানাই তো পাকা নয় দেবকুমার বাবু। আমার ছোটদের লেখাও তো কোন বালক একদিন পড়ে মনে রাখতে রাখতে এখন মধ্য বয়সে পৌঁছেছে—সংসার ধর্ম করছে—জীবনটা ফুরিয়ে যাবার সময় হয়তো একবার আমাকে মনে পড়বে তাঁর—যদি আমি লেখার মত লেখা লিখে থাকি।

বলুন তো আমি দেখতে কেমন?

হাসলেন মধুসূদনবাবু। ধৈর্য ধরুন। আরেকটু মিশি আপনার সঙ্গে। আরেকটু জানি।

বলুন না—

শুনবেন? তবে বলি। আপনি এখন পঞ্চাশের দিকে। শ্যাম বর্ণ। কোন কারণে খুব চিন্তিত। সাজিয়ে ভাবতে পারছেন না কিছু। একটু ঝুঁকে হাঁটেন। পায়ে জুতো পরেন নি। তাহলে শব্দ পেতাম। গলার স্বরে ঘুরে বেড়ানোর গন্ধ আছে—। হয়েছে?

আমাকে আজকাল অনেকে চুয়াত্তর বলে। অথচ আমি সাতচল্লিশ। আপনি না দেখেই বলে দিলেন।

আমি তো দেখতে পাই। বাতাসে আপনার শরীর সাতচল্লিশের মত জায়গা নেয়। চুয়াত্তর তো নয়।

সেটাই তো কেউ বোঝে না। চেহারায় আমি নাকি চুয়াত্তর।

আমরা তো আসলে অন্ধদের দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কলকাতায় কলের জল—কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভাতের হোটেল—অনেকদিন পরে খুব ভালো লাগলো দেবকুমারের। ফের সন্ধেরাতে সে আবার অশোক কুণ্ডুর ব্যারাকবাড়িতে গিয়ে হাজির হোল। বাচ্চারা যারা হুড়মুড় করে গোলমাল করছিল—তারাই বললো, ছাদে যান—ছাদে পাবেন।

গঙ্গার গায়ে এ রকম পরপর অনেকগুলো ব্যারাকবাড়ি। অন্তত: দেড়শো বছর আগের তৈরি। সামনের মাঠে বুড়ো

অশথ্‌তলা। ঘাসে ঢাকা সিঙ্গিল লাইন। কাজ ফুরোবার পর আর তুলে নিয়ে যায় নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেবকুমারের মনে হচ্ছিল—তাহলে কি সাহিত্যকোষের ওই পাতাটা শোধরানোর কোন দরকার নেই? হয়তো সুকুমার দে সরকার তাঁর হরিণের মতই আত্মঘাতী হয়েছিলেন—তাঁরই কোন প্রিয় জঙ্গলে। তিনি কি বিয়ে করেছিলেন? করে থাকলে—তাঁরা কোথায়? বিয়ে থা হয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। সুকুমার দে সরকারের তো দাদু হওয়ার কথা অনেকদিনই। স্ত্রী কি জীবিত? দেশ কোথায় ছিল ভদ্রলোকের? যৌবনে কি মফঃস্বল থেকে ক্যাল্‌কাটা ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়তে এসেছিলেন? কলকাতায় মেসে থাকতেন? পরে বাড়ি করেছিলেন শহরতলীতে?

এসব প্রশ্নের কে জবাব দেবে? অথচ তাঁর ছাপা গল্পের পাতায় যে ঘিয়ে সাদা রং ফুটে উঠতো—তা এখনো আমি দেখতে পাই—এক একদিন সকালে। সে সব সকালের বাতাসের ছাল তুলে ফেলার মত নখ নেই আমার হাতে। আমি জানি—সে ছাল একবার তুলতে পারলেই আমি সময়ের গুঁড়ো ধুলোয় তৈরি পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। একবার পড়েছিলাম—হিমালয়ের ওপিঠে সারা তিব্বত ঝেঁটিয়ে বাতাস পাহাড়ের গায়ে ধুলোর আরেক পাহাড় জমা করছে। আমি সময়ের সেই পাহাড়টার পায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলবো—আমার সাতচল্লিশ ফেরত দাও।—উনত্রিশ। সাতাশ। উনিশ। সাত—। আমার মা বাবার বিয়ের সময়কার সন তারিখ ফেরত দাও। আমি আবার ওঁদের ঘিরে জীবন শুরু করতে চাই। নাইনটিন হানড্রেড অ্যাণ্ড সিকস্‌টিন। সাতুই বৈশাখ—। আমার মায়ের তখন নয়। বাবার একুশ।

ছাদে উঠে দেবকুমার চমকে গেল। এ ব্যারাকবাড়িটা কত বড়? খেলার মাঠের সমান ছাদ। গঙ্গার জল বরাবর একখানা

ছাই রংয়ের টেম্পোরারি চাঁদ। ঠাণ্ডার শুরুতে এ আলোকে জ্যোৎস্না না বলে শীতকাতুরে আলো বলাই ভালো। ছাদের শেষ বোঝা যাচ্ছিল না। সেদিকটায় জ্যোৎস্না জল হয়ে গিয়ে সব ঝাপসা-ঝাপসা।

ও চিত্রগুপ্ত মশাই। কোথায়?

এই তো খাটিয়া পেতে শুয়ে আছি বিকেল থেকে—

খাটিয়া দেখতে পেল না দেবকুমার। আন্দাজে এগোতে এগোতে বললো, শীত করছে না?

তাইতো চাদর মুড়ি দিয়ে নিলাম। কোন খোঁজ পেলেন?

নাঃ। সুকুমার দে সরকারের কোন পাত্তাই নেই।

তাহলে বুঝুন। বিয়োগপঞ্জী বস্তুটা কি। আমার তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পোকা বাছতে হয় সারাদিন। তাই আজ একটু শুয়ে থাকছি।

আপনি কোথায়? কোন্ দিকটায় অশোকবাবু?

এই তো। গঙ্গার দিকের কার্নিশে—। সাবধানে আসুন। পড়ে যাবেন না যেন—আদ্যিকালের গোডাউন তো!

কত বড় ছাদরে বাবা! নীচের থেকে তো বোঝা যায় না। নিজেকে বলতে বলতেই দেবকুমার এগোচ্ছিল। এগোতে গিয়ে আরেকটু হলেই সে ন্যাড়া ছাদ থেকে উল্টে নিচে পড়ে যাচ্ছিল। শিউরে উঠে দেবকুমার ছাদে বসে পড়লো। দূরে গঙ্গার ভেতর শীতকালের সাদা চড়া দেখতে পেল। সেই সঙ্গে দেখতে পেল—খানিক দূরে ছাদের কিনারা ঘেঁষে একটা চারপাই। তার ওপরটা সাদা চাদরে ঢাকা। জলের দিকে চাদরের শেষে অশোক কুণ্ডুর মাথার সাদা বেরিয়ে—

আহারে—! কথাটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে। দেবকুমারের মায়া হওয়ারই কথা। যদিও অশোক কুণ্ডু তার চেয়ে এগারো বছরের ছোট—তবু কত তাড়াতাড়ি ভেতরে ভেতরে ঘুণ

ধরে গিয়ে এই হাল। অবশ্য মধুসূদনবাবুর ভাষায়—ঘুণ তো ধরারই জিনিস। ধরবেই। ধরলেও—গলার স্বরে থাকবে ঘুরে বেড়ানোর গন্ধ—বনগন্ধের চাপা শব্দ।

জ্যোৎস্না জল হয়ে
গলে যায়
জীবনের শিকড়েরও নীচে
যেখানে জীবন সাতপ্রস্থ
মহেঞ্জোদারো
পরেপ্পর গোধুলি, গোহাল, মহাশূন্য প্রেতলোক
দুই ঘুমে চেতনা পারাপার করে
জ্যোৎস্না যখন জল হয়ে গলে যায়

দেবকুমার বসু উঠে দাঁড়ালো। তবু তার শিরশিরে ভাব যায় না। খাটিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। উঠে বসুন।

বেশ তো শুয়ে আছি। আপনি বসুন না।

বসবার জায়গা রেখেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে অশোক কুণ্ডু তার চাদর মোড়া পা দু'খানা এক কাতে সরিয়ে দেবকুমারের বসার জায়গা করে দিল।

দড়ির চারপাইতে চিত্রগুপ্তের শরীরটা মাঝখানে ঝুলে পড়ে ছাদ ছুঁই ছুঁই। এখন জলগোলা জ্যোৎস্না দেবকুমারের চোখে সয়ে গেছে। বিয়োগপঞ্জী আপনাকে হয়তো আর শোধরাতে হবে না! বলতে বলতে সে বসতে গিয়েও বসলো না।

কোন জবাব না পেয়ে দেবকুমার আবার বললো, হয়তো দে সরকার মশাই আফ্রিকায় চলে গিয়ে একা একা কোন জাতির সঙ্গে মিশে গিয়ে থেকে গেছেন। কঙ্গোর জলে নেমে কুমীর শিকারে ব্যস্ত। বন-জঙ্গল, নদী-পাহাড়—এই সবই তো ভালোবেসেছেন সারা জীবন—

এবারও কোনা রা কাড়লো না অশোক কুণ্ডু।

নেকড়ে মা। আত্মঘাতী হরিণ। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ হাতি—। থচ্ করে থেমে গেল দেবকুমার। কাকে কথা শোনাচ্ছি আমি! আপনি কি এভাবে শুয়েই থাকবেন অশোকবাবু? আমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে টায়ার্ড। আমি কিন্তু এবার বসবো একটু।

এবারও কোন জবাব নেই। দেবকুমার বসতে গিয়েও বসলো না। সে আচমকাই সাদা চাদরটা এক হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সব হাড় একই সঙ্গে বালি হয়ে গেল। সে থপাস করে ছাদে বসে পড়লো। পাছে গড়িয়ে পড়ে—তাই দু'হাতে কাত করে চার পাইয়ের বাজু ধরলো।

দেবকুমারের এক হাতের ভেতর সে শুয়ে—তার পরনেও রং চটা ঢোলা প্যান্ট আর বুশ শার্ট। খালি পা। চোখ গোল। মুখে কোন কথা নেই কিন্তু। পুরু কাজলের ধারা চোখের নীচে কালো গর্ত। সেই কালচে ছায়ার বর্ডারে দুটো টল্ মার্বেল টলটল করে ভাসছে।

দেবকুমার বসু এই প্রথম সামনাসামনি পরিষ্কার দেখতে পেলো—তার মাথা একদম সাদা।

—শেষ—